৩

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

তৃতীয় খন্ড

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৯
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০২
চতুর্থ প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : একশত পনের টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. III) Written by Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition April 1994 Forth Edition November 2005 Price Taka 115.00 only.

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ। 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (তৃতীয় খন্ড)' প্রকাশিত হচ্ছে। ইচ্ছা ছিলো আরো আগে প্রকাশ করার; কিন্তু তা হয়নি। নানা কারণে বিলম্ব ঘটে গেছে। এ খন্ডে বিশজন আনসারী সাহাবীর জীবনকথা এসেছে। আগের দু'টি খন্ডের মত এখানেও অল্প কথায় এই মহান সাহাবীগণের পরিচয় ও কর্মকান্ড তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম থেকেই পাঠকদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার ছিল, অল্প কথায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) পরিচয় তুলে ধরার। আমরা তা রক্ষার চেষ্টা করেছি। তবে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার একটিও আমাদের নিজের নয়। সবই নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে।

'জীবনকথা (১ম খন্ড ও ২য় খন্ড)' পাঠকদের হাতে পৌঁছার পর অনেকেই তাকীদ দিয়েছেন, আরো একটু বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কারো পরামর্শই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করবেন অন্যরা। সাহাবায়ে কিরামের কর্মকান্ড নিয়ে লেখার অনেক কিছুই আছে।

যাঁরা আমার এ লেখার ধারা অব্যাহত রাখার পেছনে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমাদ, যিনি সর্বক্ষণ আমাকে লেখার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন, তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দু'আ করি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন।

পরিশেষে, বিনীতভাবে স্বীকার করছি, এ বই-এ যদি কোন ভুল ও অসংগতি থেকে থাকে অথবা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কোথাও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা সবই আমার নিজের ত্রুটি। সেগুলি আমার দৃষ্টিতে আনার জন্য সহৃদয় পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ পাক আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে দীনের ন্যূনতম খিদমাত হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
১৩ই রবী'উল আওয়াল, ১৪১৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
সহকারী অধ্যাপক,
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা - ১০০০।

মদীনার আনসারদের পরিচয়

আরবী 'আল-আনসার' শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'নাসের' অর্থ ঃ সাহায্যকারী। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা হতে মদীনায় হিজরাতের পর সেখানকার যে সকল মুসলমান তাঁকে খোশ আমদেদ জানান ও সাহায্য করেন, তাঁদেরকে বলা হয় 'আনসার'। মূলতঃ তাঁরা ছিলেন মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের জনগণ।

প্রাচীনকালের আরবের অধিবাসীদেরকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ (১) আল-'আরাব আল-বায়িদা, (২) আল-'আরাব আল-'আরিবা, (৩) আল-'আরাব আল-মুসতা'রাবা। হযরত নূহের (আ) প্লাবনের পর যেসব গোত্র আরবে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং শেষে বিলীন হয়ে যায়, তাঁদের বলা হয় 'বায়িদা'। 'আদ, সামুদ, 'আমালিকা, ত্বাসাম, জাদীস প্রভৃতি জাতি এর অন্তর্ভুক্ত। আর বায়িদার সমসাময়িক অন্যসব গোত্র, যারা তাদের পরে আরবের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের বলা হয় 'আরিবা। কাহত্বান, সাবা, হিমইয়ার, মুঈন প্রভৃতি তাদেরই শাখাসমূহ। আর মুসতা'রাবা বলা হয় ঐ সব গোত্রকে যারা ছিল নবী হযরত ইসমা'ঈলের (আ) বংশধর এবং মূলতঃ তারা ছিল আরবের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী।

মদীনার আনসারদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, তারা আল-আরাব আল-'আরেবার বংশধর। এরই ভিত্তিতে আরবের নসববিদগণ তাদের নসবনামা কাহ্ত্বান ইবন 'আবের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন, যিনি আল-আরাব 'আরিবার উত্তরাধিকারী। তবে কাহত্বান থেকে নসববিদগণ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল বলেন, কাহ্ত্বান নিজেই এক স্বতন্ত্র খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে অন্যদল তাঁকে পৃথক কোন শাখা খান্দান মনে করেন না। তাঁরা কাহ্ত্বানকে নাবিত ইবন ইসমা'ঈলের সন্তান বলে মনে করেন। কালবী ও কতিপয় ইয়ামনবাসী এ মত পোষণ করেছেন। তাঁরা হযরত ইসমা'ঈলকে (আ) সমগ্র আরবের পিতৃ-পুরুষ বলে মনে করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭) তবে মাস'উদী বলেন, ইয়ামনবাসীরা যে কাহত্বানকে নাবিতের সন্তান মনে করে, একথা ঠিক নয়। বরং তারা কাহত্বানকে 'আবিরের সন্তান বলে থাকে। (কিতাবুত তানবীহ ওয়াল-আশরাফ-৮১)

যাই হোক, কাহ্ত্বান একটি স্বতন্ত্র খান্দান এবং একটি স্বতন্ত্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ইয়ামনে তাদের বংশধরগণ বহুকাল ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

আরব ঐতিহাসিকরা আনসারদেরকে কাহত্বানের বংশধর বলে মনে করেন। এ কারণে তারা আনসারদের ইতিহাস কাহত্বানের সময় থেকে শুরু করেন। এই বংশে 'আবদি শামস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'সাবা'। তাঁকেই ইয়ামনের 'সাবা' রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। হিমইয়ার ও কাহ্লান নামে তাঁর দুই ছেলে ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই ছেলে, রাজবংশের সদস্যবৃন্দ ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ডেকে অসীয়াত করে যান যে, 'আমার বড় ছেলে হিমইয়ারকে রাজ্যের ডান ভাগ এবং ছোট ছেলে কাহ্লানকে বাম ভাগ দেবে।' যেহেতু ডান হাতের জন্য তরবারি, চাবুক, কলম এবং বাম হাতের জন্য লাগাম, ঢাল ইত্যাদির প্রয়োজন। এজন্য সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হিমইয়ার রাজা হবেন এবং রাজ্যের

প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন কাহ্লান। এভাবে হিমাইয়ার রাজা হলেন। তারপর বংশ পরম্পরায় তারা সিংহাসনের অধিকারী হলেন। এবং কাহ্লানের বংশধরগণ রাজ্যের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে চললেন।

রাজা আল-হারেস আর-রায়িশ-এর সময় 'আমের ইবন হারিসা, যার উপাধি ছিল 'মাউস সামা' এবং তাঁর পরে তাঁর ছেলে 'আমর আল-মুযাইকিয়া এই একই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এই আমরের স্ত্রী তুরাইফা বিন্তু জাবর ছিল একজন 'কাহেনা' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। এক রাতে সে স্বপ্ন দেখে যে, একটি ঘন, কালো মেঘ গোটা ইয়ামনকে ঘিরে ফেলেছে। বিদ্যুতের ঝলকানি এবং বজ্রপাতের দুর্বিসহ গর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। যেখানেই বজ্রপাত হচ্ছে, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। সে ভীত-শংকিত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে আমরের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বলে, এখন আর কোন উপায় নেই। আমর জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের করণীয় কি? সে বললো ঃ খুব তাড়াতাড়ি ইয়ামন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। খুব শিগগির 'আরাম বাঁধ ভেঙ্গে গোটা ইয়ামন তলিয়ে যাবে।

'আমর ছিলেন প্রচুর ধন-দৌলত, জীব-জন্তু ইত্যাদির অধিকারী। ইচ্ছা করলেই হঠাৎ কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাছাড়া মানুষকে কী বলে যাবেন? এ জন্য এক বুদ্ধি আঁটলেন। বড় ছেলে সা'লাবাকে বললেন, আমি তোমাকে মানুষের সামনে একটা কাজের নির্দেশ দেব, আর তুমি তা পালন না করার ভান করবে। আমি ধমক দিলে তুমি আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবে। সা'লাবা বললো, এমন কাজ আমার দ্বারা কেমন করে সম্ভব? 'আমর বললেন, 'কল্যাণ এতেই রয়েছে।' পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আমর নেতৃস্থানীয় লোকদের খাবারের দা'ওয়াত দিলেন। সবাই উপস্থিত হলে তিনি সা'লাবাকে একটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং সে তা পালনে অস্বীকৃতি জানালো। 'আমর তাকে মারার জন্য নিযা হাতে উঠিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে সা'লাবা পিতার গালে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। 'আমর বলে উঠলেন, 'এমন অপমান!' সা'লাবার ভাই তাকে মারার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। 'আমর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। এ ধৃষ্টতার জন্য আমি তাকে এক কপর্দক ও দেবনা। এভাবে 'আমর তাঁর বিষয়-সম্পদ উচ্চমূল্যে বিক্রী করে নিজের পরিবার-পরিজনসহ ইয়ামন থেকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর 'আরাম বাঁধ ভেঙ্গে গোটা ইয়ামন তলিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

'আমর 'মারিব' থেকে বের হয়ে প্রথমে আক্কায় আশ্রয় নেন এবং তাঁর তিন ছেলে— হারেস, মালিক ও হারেসাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলেন। তারা ফিরে আসার পূর্বেই 'আমর মারা যান এবং তার বড় ছেলে 'সা'লাবাতুল 'আনকা' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীকালে তারা এ আক্কা থেকেও হিজরাত করে এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং হিজাযের মক্কায় খুযা'য়া, শামে গাস্সান এবং ইয়াসরিবে (মদীনা) আউস ও খাযরাজ বসতি স্থাপন করে। এভাবে 'সাবায়ে উলা' বা প্রথম সাবা রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর তখন থেকেই আরবী প্রবাদ 'তাফাররাকূ আইদী সাবা'—সাবাদের ক্ষমতার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে— প্রচলিত হয়।

কেউ কেউ এটাকে একটি বানোয়াট কাহিনী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার অনেকে আনসারদেরকে নাবিতের বংশধর বলেছেন। তারা মনে করেন, নাবিতের সময় থেকে আনসারদের ইতিহাসের সূচনা। তাহলে আনসাররা 'আল-আরাব আল-

মুস্তা'রাবার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আরবীতে নাবিত, হিব্রুতে নায়াবুত। তাওরাতে তাঁকে হযরত ইসমা'ঈলের (আ) সন্তানদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে হযরত ইসমা'ঈলের (আ) জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে। আরব ঐতিহাসিকরা খুব সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তাবারী বলেছেন ঃ আল্লাহ নাবিত ও কাইদার-এর দ্বারা আরবদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। (তাবারী-১/৩৫২) ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে লিখেছেন ঃ হযরত ইসমা'ঈলের (আ) পরে কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব তাঁর ছেলে নাবিতের হাতে পৌঁছে।' (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৩) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় নাবিত মক্কার অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমা'ঈল নির্মিত কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

মক্কা ছিল শুষ্ক পাহাড়ী ভূমি। এ কারণে নাবিতের মৃত্যুর পর তাঁর নিজের ও তাঁর ভাইদের সন্তানরা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। নাবিতের সন্তানরা আরবের উত্তর-পশ্চিম অংশে আবাসন গড়ে তোলে। তবে কাইদার-এর সন্তানরা তখনও মক্কায় থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুদাদ বিন হামী মক্কার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিলে তারা মক্কা ছেড়ে কাজেমা, গুমার জীকুন্দাহ, শা'ছামীম প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাবিতের সন্তানরা হিজাযের উত্তর এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে তারা হযরত 'ঈসার জন্মের চার শো বছর পূর্বে 'আনবাত' নামে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই নাবাতী সাম্রাজ্য খুবই প্রতাপশালী হয় এবং উত্তর আরব থেকে সাবা সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করে। খ্রীঃ পূঃ ৬২ সনে হারেস সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। মোটকথা, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নাবাতীরা অত্যন্ত প্রতাপের সাথে রাজত্ব করেন।

এই আনবাতের বংশধরদের অন্য একটি শাখা আছে। তারা কোন এক অজ্ঞাত যুগে ইয়ামনে বসতি স্থাপন করে। তারা আয্‌দ অথবা আসাদ গোত্র। তারা নাবিত ইবন মালিকের বংশধর। সম্ভবতঃ ইসমা'ঈলীদের ইয়ামনে বসতি স্থাপনের সময় বা তার পরে এই লোকেরা সেখানে যায়। তারা মা'রিব-এ বসবাস করতো। কালক্রমে তাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অভাব ও অন্যসব অসুবিধার কারণে তারা মা'রিব ছাড়তে বাধ্য হয়। যখন তারা মারিব ত্যাগ করে তখন তাদের নেতা ছিলেন 'আমর ইবন 'আমের। তিনি ইতিহাসে 'মুযাইকিয়া' নামে খ্যাত। মূলতঃ তিনিই গোটা আনসার সম্প্রদায় ও গাস্‌সানীদের আদিপুরুষ। আনসারদের ইতিহাস তাঁর সময় থেকেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

'আমর প্রথমতঃ মালিক ইবন ইয়ামন ও আয্‌দ গোত্রকে সংগে করে মা'রিব থেকে বের হন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু যুগ ধরে তাঁর বংশধরগণ বসবাস করতে থাকে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এই 'আমরের অধস্তন পুরুষরা ইয়াসরিব ও তার আশে-পাশে বসতি স্থাপন করে। তারাই মদীনার বিখ্যাত আউস ও খাযরাজ গোত্রের পূর্বপুরুষ।

আনসারদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যত কথাই প্রচলিত থাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মদীনার আনসারদের সবগুলি গোত্র আউস ও খাযরাজ নামের দু'ব্যক্তি থেকে উৎসারিত। তাদের পিতার নাম হারেসা এবং মাতার নাম কাইলা বিনতু 'আমর ইবন জাফনা। 'আদী

নামে তাঁদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁর বংশধরগণও মদীনায় বিদ্যমান ছিল। খাযরাজ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে আউস সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি একজন খতীব (বক্তা) ও শা'য়িব (কবি) ছিলেন। তাঁর নামে বর্ণিত কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা সংরক্ষিত আছে। এই আউস, খাযরাজ ও 'আদীর বংশধরগণ ইয়াসরিবে বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত হয়। যথা ঃ

'আদী ঃ তাঁর নামে পৃথক কোন শাখা গোত্র নেই। অনেকের ধারণা তাঁর সন্তানরা আউস ও খাযরাজের সাথে মিলে এক হয়ে গেছে। কারণ, আরবে ভাতিজারা চাচার খ্যাতির কারণে তাঁর সন্তান রূপে প্রসিদ্ধি পায়। (উসুদুল গাবা-৫/২০৪)

আউস ঃ মালিক নামে তাঁর ছিল এক ছেলে। আর এই মালিকের ছিল পাঁচ ছেলে, যারা প্রত্যেকেই পৃথক শাখা গোত্রের উর্ধতন পুরুষ। যথা ঃ 'আমর ইবন মালিক, 'আওফ ইবন মালিক, মুররা ইবন মালিক, ইমরাউল কায়েস ইবন মালিক ও জাশাম ইবন মালিক।

খাযরাজ ঃ খাযরাজের ছিল পাঁচ ছেলে ঃ 'আমর আওফ, জাশাম, কা'ব ও হারেস। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের সকল শাখাই ছিল 'আমর ইবন খাযরাজের বংশধর।

আনসারদের পূর্ব-পুরুষের মদীনায় আগমনের পূর্বেই সেখানে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করেছিল। অনেকের মতে তারা হযরত সুলাইমানের (আ) সময়ে, আবার অনেকের মতে বখ্‌তে নাসরের বায়তুল মাকদাস ধ্বংসের পরে তারা আরবে আসে এবং ইয়াসরিব ও তার আশে-পাশের এলাকায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে আউস ও খাযরাজের পূবপুরুষরা এসে দুর্গ ও বাড়ীঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করে। তারা ইহুদীদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করে; কিন্তু কালক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে ইহুদীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং পরে তা শত্রুতায় পরিণত হয়।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা প্রথমে ইয়াসরিবের একই এলাকায় বসবাস করতো। পরে ইহুদীদের শক্তি কিছুটা খর্ব হলে তারা সেখানকার গোটা নিচু ও উঁচু এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পৃথক বসতি অঞ্চল গড়ে তোলে।

আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি দীর্ঘকাল পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং তারা একের পর এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের আবির্ভাব না হলে তারা হয়তো পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যেত। 'খুলাসাতুল ওয়াফা' গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ 'অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশী ও দীর্ঘ যুদ্ধের কথা আর শোনা যায় না।' সামীর' যুদ্ধ থেকে যার শুরু 'বুয়াস' যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। 'বুয়াস' যুদ্ধটি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে। এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে কত যুদ্ধ যে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ইতিহাসে শুধু বড় যুদ্ধগুলির কথা বর্ণিত হয়েছে। (আল কামিল ফিত তারীখ-১/৫০৩)

আনসারদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস

আনসারগণ যদি নাবিত ইবন ইসমা'ঈলের বংশধর হন তাহলে আদিতে তাদের ধর্মবিশ্বাসও তাই ছিল, যা ইসমা'ঈল (আ) ও তাঁর সন্তানদের ছিল। পরবর্তীকালে 'আমর ইবন লুহাই যখন আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন করে তখন অন্য ইসমা'ঈলীদের মত তারাও

মূর্তিপূজা শুরু করে। আনসারদের পূর্বপুরুষের ইয়ামান অবস্থানকালের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইয়াসরিবে বসবাসের পর থেকে তাদের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানা যায়। খাযরাজ বংশের আদিপুরুষ থেকে চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ হলেন নাজ্জার। তিনিই বনু নাজ্জারের আদি পুরুষ। ইতিহাসে তার আসল নাম 'তাইমুল লাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তারাবী-১/১০৮৫) কিন্তু পরে পরিবর্তন করে 'তাইমুল্লাহ' রাখা হয়। ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে এ নামটি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ আনসারদের ইসলাম গ্রহণের পর এ পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের এমন নজীর আরো আছে। জাহিলী যুগের 'বনু সাম্মা' ইসলামী যুগে 'বনু সুমাই'য়া নাম ধারণ করে। এ নাম রাখেন খোদ রাসূল (সা)। (উসুদুল গাবা-৫/১৭৯) গোত্রের মত বহু ব্যক্তিরও নামের পরিবর্তন ঘটেছে।

যাই হোক, 'তাইমুল লাত' দ্বারা বুঝা যায়, আনসারদের মধ্যে 'লাত' দেবীর পূজা হতো। আনসারদের কোন কোন গোত্র 'আউসুল্লাহ' বলে পরিচয় দিত। হতে পারে পূর্বে তা 'আউসুল লাত' ছিল। আরব ঐতিহাসিকরা 'মানাত'কে আনসারদের দেবী বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'মানাত' ছিল নাবাতীদের দেবী। কুরআনের সূরা 'নাজম'-এ এর কথা এসেছে। 'মু'জামুল বুলদান'-এ বলা হয়েছে, ইসমা'ঈলের বংশধরদের সবচেয়ে পুরাতন দেবী হচ্ছে 'মানাত'। (৮/১৬৭) তারপর 'লাত'-এর পূজা শুরু হয়। (৭/৩১০) আউস, খাযরাজ ও গাস্সানের লোকেরাও মানাত-এর পূজা করতো। (তাবাকাত-১/১০৬) তাছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্র, যেমন ঃ হুজাইল, খুযা'য়া, আয্দ শানওয়া, বনী কা'বও এর পূজারী ছিল।

একথা ঠিক নয় যে, ইয়াসরিববাসী শুধু লাত ও মানাত-এর পূজা করতেন, অথবা আরবের আর কোন গোত্র এ দু'দেবীর পূজা করতো না। বরং লাত ও মানাত ছাড়া অন্যান্য ছোট-বড় আরো অনেক দেব-দেবীর পূজা ইয়াসরিববাসী যেমন করতেন, তেমনি আরবের অন্যান্য গোত্রও লাত-মানাত-এর পূজা করতো।

ঐতিহাসিক তাবারী রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার হযরত আলীকে (রা) মদীনার কুবায় একজন মুসলিম মহিলার গৃহে কয়েক রাত অবস্থান করতে হয়। এ সময় তিনি প্রতিদিন রাতে দরযা খোলার শব্দ শুনতে পেতেন। মহিলাটি দরযা খুলে বাহির থেকে কিছু জিনিস ঘরে উঠিয়ে রাখতেন। তিনি ছিলেন বিধবা। একদিন আলী (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিদিন রাতে এভাবে দরযা খোলা হয় কেন? তিনি বললেন, আমি এক অনাথ মহিলা। এ কারণে সাহ্ল ইবন হুনাইফ রাতের বেলা তার গোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে গোপনে তার কাঠগুলি আমার জ্বালানীর জন্য দিয়ে যায়। (তাবারী-৩/১২৪৪) এতে বুঝা যায় ইয়াসরিববাসীদের গৃহে কাঠের তৈরী বহু মূর্তি ছিল।

আমর ইবন জামূহ ছিলেন বনী সুলামার একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল (রা) মুসলমান হওয়ার পর 'আমরের মানাত' নামক কাঠের বিগ্রহটি রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে আসতেন। আমর আবার তা কুড়িয়ে আনতেন। এমনিভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে নিজস্ব বিগ্রহ ছিল। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক গোত্রের মূর্তি উপাসনার জন্য মন্দির ছিল। ইয়াকূত আল-হামাবী বলেছেন ঃ আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মত মানাত দেবীর এত বেশী সম্মান আর কোন গোত্র করতো না। (মু'জামুল বুলদান-৮/১৬৮)

আউস ও খাযরাজ গোত্রে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা মূর্তিপূজা করতেন না। তাঁরা ছিলেন এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। তাঁদের অনেকে মদীনা ও খাইবারের ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অনেকে আবার 'হানীফী' ধর্মেরও অনুসারী ছিলেন। আনসারদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইবন হিশাম বলেছেন ঃ 'আউস ও খাযরাজরা ছিলেন মুশরিক। তাঁরা মূর্তিপূজা করতেন। তাঁরা জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, নশর, কিতাব, হালাল ও হারাম কিছুই জানতেন না (সীরাত-১/৩০৪)' সামগ্রিক অবস্থা ছিলো এটাই।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা

জাহিলী যুগে মক্কার সাথে আনসারদের যোগাযোগ ছিল। হজ্জ, 'উমরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁরা মক্কায় আসতেন। নিজেদের গৃহযুদ্ধ এবং ইহুদীদের শত্রুতার কারণে তাঁরা মক্কার সমর্থন ও সাহায্য লাভের আশায় সেখানে আসতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মক্কাবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মক্কা ও মদীনার লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও মৈত্রী চুক্তিও ছিল।

বর্ণিত আছে, মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুওয়ায়িদ ইবন সামিত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ইসলামের দা'ওয়াত লাভ করেন এবং তাঁর মুখ থেকে পবিত্র কুরআন শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন মদীনার 'আমর ইবন 'আওফ গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সেই জাহিলী যুগেই তিনি আরববাসীর নিকট থেকে 'কামিল' উপাধি লাভ করেন। মক্কায় গেলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইসলামের দাওয়াত শুনে তিনি বলেন ঃ 'আপনার নিকট যা আছে, আমারও নিকট প্রায় একই জিনিস আছে।' রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার কী আছে? তিনি বললেন ঃ 'সাহীফা-ই-লুকমান'। রাসূল (সা) কিছু শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি কিছু শোনালেন। রাসূল (সা) সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন ঃ আমার কাছে এর চেয়ে ভালো জিনিস আছে। আর তা হচ্ছে 'কুরআন'। তিনি কুরআন শুনে মুগ্ধ হলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, ইবন হিশামের মতে, 'তিনি ইসলাম থেকে দূরে থাকলেন না।' তিনি মদীনায় ফিরে গেলে খাযরাজীদের হাতে নিহত হন। 'আমর ইবন 'আওফ গোত্রের ধারণা, তিনি মুসলমান অবস্থায় মারা গেছেন। এটা বু'য়াস যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬)

এরপর 'আবদুল আশহাল গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সংগে করে আবুল মাইসার আনাস ইবন রাফে 'আসেন মক্কায়। উদ্দেশ্য, কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করা। এই দলে ছিলেন ইয়াস ইবন মু'য়াজ। মক্কায় তাঁদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা) তাঁদের সাথে দেখা করে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। ইয়াস ছিলেন তরুণ। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে কুরআন শুনে তিনি সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা যে কাজের জন্য এসেছো এটা তার চেয়ে ভালো। মদীনায় ফিরে তিনি মারা যান। রাসূলুল্লাহর (সা) এই স্বল্প সুহবতে তিনি ইসলামকে এতটুকু বুঝেছিলেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে শুধু তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন এবং মানুষকে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা শুনিয়েছিলেন। তাঁর গোত্রের লোকদের ধারণা, তিনি মুসলমান ছিলেন। (মুসনাদ-৫/৪২৭)

মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রথম মুসলমান কে, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে যাঁদের নাম বিভিন্ন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন ঃ রাফে 'ইবন মালেক

যারকী, মু'য়াজ ইবন 'আফরা', আস'য়াদ ইবন যুরারাহ্, জাকওয়ান ইবন 'আদী, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) প্রমুখ। (দ্রঃ তাবাকাত-১/১৪৬; যারকানী-১/৩৬১)

প্রকৃতপক্ষে মদীনার আনসারদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সূচনা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত থেকে। 'আকাবা বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে 'আকাবা বলতে বুঝায় 'মিনার জমরায়ে 'আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। এ স্থানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বাই'য়াত নেয়া হয়। প্রথম দফায় নেয়া হয় নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়, মতান্তরে আটজন লোক ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত নিয়ে মদীনায় ফিরে যান। এটা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী কারীমের (সা) চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে বারো জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এঁদের পাঁচজন ছিলেন আগের এবং সাতজন নতুন। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। এটা 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াত। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদের কুরআনের তা'লীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে পাঠানো হোক। তিনি হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমারকে (রা) পাঠালেন। তিনি মদীনার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনায় ইসলামের দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার ঘটে।

অতঃপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর, মতান্তরে তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুই জন মহিলা হজ্জ মওসুমে আবার 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন এবং বাই'য়াত করেন। এ হলো 'আকাবার তৃতীয় বা সর্বশেষ বাই'য়াত। সাধারণতঃ বাই'য়াতে 'আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বাই'যাতটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কাজ, কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী হিজরাত করে মদীনায় গেলে তাঁর হিফাজত ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁদের মধ্য থেকে বারো জন নাকীব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তাঁরা সবাই ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পথ ও পরিবেশ তৈরী করেন।

এই তৃতীয় বা সর্বশেষ আকাবায় যে ৭২/৭৫ জন লোক অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ১১ জন আউস গোত্রের এবং দু'জন মহিলাসহ মোট ৬৪ জন খাযরাজ গোত্রের (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৯-২৫৫)

আনসারগণ ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতায় কোনরূপ ত্রুটি করেননি। নিজেদের নজীরবিহীন কুরবানী ও সাহায্য দ্বারা ইসলামের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁদের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। বদর যুদ্ধে দু'শো তিরিশ জন আনসার শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বাকী আনসার আউস গোত্রের। এ যুদ্ধে ব্যবহৃত সর্বমোট ৭০টি উটের মধ্যে হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা আল-খাযরাজী একাই ২০টি উট দান করেছিলেন। এ বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী চৌদ্দ জনের আটজনই ছিলেন আনসার। উহুদের যুদ্ধে বহু সংখ্যক আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সত্তর জন (৭০) শহীদের মধ্যে ছেষট্টিজনই (৬৬) ছিলেন আনসার। কারো কারো শরীরে ৭০টি আঘাত লেগেছিল। বি'রে মা'উনার শহীদদের মধ্যেও উল্লেযোগ্য সংখ্যক ছিলেন আনসার। (ইসলামী বিশ্বকোষ-১ম খন্ড, আনসার)

ইসলামের জন্য আনসারদের ত্যাগ তিতিক্ষার বিবরণ অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা তাঁদের জান-মালসহ সবকিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। মদীনা আগত মুহাজিরদের জন্য তাঁরা নিজেদের অর্থ সম্পদ ও বাড়ী-ঘর ভাগ করে দেন। তাঁরা যে সততা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মানব ইতিহাসে তা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। এ কারণে তাদের প্রতি রাসূলের (সা) গভীর মুহাব্বত ছিল। তিনি তাদের অবদান, ত্যাগ ও কুরবানী যথার্থ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি কথা ও কাজের দ্বারা তাঁদের এ অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আনসারদের প্রতি ভালোবাসাকে তিনি ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই আনসারদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করতে পারেনা। আনসারদের প্রতি বিদ্বেষকে তিনি মুনাফিকের স্বভাব-প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনসার ও তাঁদের সন্তান-সন্তুতির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণের জন্য দু'আ করেছেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি থেকে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের একাদিক স্থানে আনসার শব্দটি এসেছে। তার মধ্যে সূরা তাওবার ১০০ ও ১১৭ নং আয়াতের একাংশ মদীনার আনসার মুসলমানদের প্রতি সরাসরি প্রযুক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

১. 'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরাতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।' (আত-তাওবা-১০০)

২. 'আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সংগে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি, নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।' (আত-তাওবা-১১৭)

এছাড়া কুরআনের আরো বহু আয়াতে, কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে আনসারদের সাহসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-হাশর-এর ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করেনা এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।'

আস'য়াদ ইবন যুরারা (রা)

আবূ উমামা আস'য়াদ, যিনি আস'য়াদ আল-খায়র নামেও পরিচিত, মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। তাঁর পিতা যুরারা ইবন 'আদাস। (আল-ইসাবা-১/৩৪) উসুদুল গাবা-১/৭১) তাঁর জন্মের সন-তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র আরব উপদ্বীপ কুফর ও গুমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তবে এর মধ্যেও কিছু লোক বিশুদ্ধ স্বভাব বা ফিতরাতের দাবী অনুসারে তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা ছিলেন। আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁদেরই একজন। (তাবাকাত-১/১৪৬)

ইসলাম-পূর্ব যুগেও ইয়াসরিবের (মদীনা) লোকেরা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে কুরাইশদের সমর্থন লাভ এবং তা ফায়সালার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাতায়াত করতো। তাছাড়া হজ্জ ও 'উমরা আদায়ের জন্যও তারা সেখানে যেত। অতঃপর মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলো। এরমধ্যে হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াতী জীবনের বেশ ক'টি বছর অতিবাহিতও করেছেন। মক্কার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দানের সাথে সাথে বিভিন্ন মেলা ও হাটে-বাজারে উপস্থিত হয়ে ব্যাপকভাবে তিনি মানুষকে সত্যের দা'ওয়াত দিচ্ছেন। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মক্কায় আগত বহিরাগত লোকদের নিকটও গোপনে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে চলেছেন। ইবনুল আসীর ওয়াকিদীর সূত্রে বলেন ঃ এমনি এক সময়ে আস'য়াদ ইবন যুরারা ও জাকওয়ান ইবন 'আবদিল কায়স নিজেদের একটি ঝগড়া নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মক্কার কুরাইশ নেতা 'উতবা ইবন রাবী'য়ার নিকট যান। এই 'উতবার নিকট তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে পান। গোপনে তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে কিছু তিলা'ওয়াত করে শোনান। এই সাক্ষাতেই তাঁরা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'উতবার কাছে আর না গিয়ে সোজা মদীনায় ফিরে যান। এভাবে তাঁরা দু'জনই হলেন মদীনায় আগমনকারী প্রথম মুসলমান। এটা নবুওয়াতের দশম বছরে 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতের পূর্বের ঘটনা। (উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪, হায়াতুস সাহাবা-১/৮৬)

অবশ্য ইবন ইসহাকের বরাতে ইবনুল আসীর বলেছেন, আস'য়াদ ইবন যুরারা সেই লোকগুলির একজন যাঁরা নবুওয়াতের দশম বছরে অনুষ্ঠিত 'আকাবার ১ম বাইয়াতে শরিক হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি নবুওয়াতের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে অনুষ্ঠিত ২য় ও ৩য় বাইয়াতেও উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ 'আকাবী ব্যক্তি। (উসুদুল গাবা-১/৭১)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মদীনার প্রথম মুসলমান কে- এ বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতবিরোধ আছে। ইবন হিশাম বলেছেন, সুওয়াইদ ইবন সামিত হজ্জ অথবা 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইয়াসরিববাসীরা তাঁকে 'কামিল' উপাধি দান করে। বীরত্ব, সাহসিকতা, কাব্য প্রতিভা, বংশ মর্যাদা, সম্মান-

প্রতিপত্তি, মোটকথা সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে সে যুগের আরবরা 'কামিল' উপাধি দান করতো। মদীনাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) দাও'য়াত লাভ ও কুরআন শোনার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম তাঁরই হয়। ইবন হিশাম বলেন, এ দাওয়াতের পর তিনি ইসলাম থেকে দূরে ছিলেন না। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪২৬–২৭) কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই তিনি নিহত হন। যাই হোক সুওয়াইদ সর্ব প্রথম মুসলমান হলেও মদীনায় ফিরে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সুযোগ পাননি। সম্ভবতঃ আস'য়াদ ও জাকওয়ানই প্রথম দুই ব্যক্তি যাঁরা সর্বপ্রথম মদীনায় ইসলামের তাবলীগের কাজ শরু করেন।

মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি আবুল হায়সামের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে নিজের নতুন বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন। আবুল হায়সাম সাথে সাথে বলে ওঠেন, "তোমার সাথে আমিও তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনলাম।" (তাবাকাত–১/১৪৬) অনেকে এই আবুল হায়সামকে মদীনার প্রথম মুসলমান বলে মনে করেছেন।

নবুওয়াতের দশম বছরে প্রতিবছরের মত ইয়াসরিববাসীরা হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসে। তাদের মধ্য থেকে ছয় ব্যক্তি হজ্জ শেষে গোপনে মিনার আকা'বা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এ ছয়জনের মধ্যে আস'য়াদও ছিলেন। পরের বছর হজ্জের মওসুমে ইয়াসরিববাসীরা আবার মক্কায় আসে। তাদের মধ্য থেকে বারোজন লোক গোপনে, আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়ে বাই'য়াত করেন। এই বারো জনের মধ্যে আসয়াদও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪২৯, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭) এই 'আকাবার পর মদীনায় যখন ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের সম্ভাবনা অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একজন শিক্ষক দাবী করেন, যিনি তাদেরকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দেবেন। তাঁদের দাবী অনুসারে রাসূল (সা) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে (রা) ইয়াসরিবে দা'য়ী বা আহবায়ক হিসাবে পাঠালেন। মুসয়াবের মদীনায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আসয়াদ ইবন যুরারা নামাযের ইমাম ছিলেন। তার পর মুস'য়াব ইমাম হন। তবে অনেকের মতে সালেম মাওলা আবী হুজাইফার মদীনা পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আস'য়াদই সেখানে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মুস'য়াব শুধুমাত্র তাদের কুরআনের তা'লীম দিতেন। মদীনায় তাঁরা বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৩৯, ২৬৬) আস'য়াদ হযরত মুস'য়াবকে মদীনায় নিজ গৃহে অতিথির মর্যাদায় আশ্রয় দেন। (তাবাকাত–৩/৪৮৩)

হযরত মুস'য়াবের মদীনায় যাওয়ার পর আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁকে সংগে করে ব্যাপকভাবে দা'ওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন। তাঁরা মদীনার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ একদিন আস'য়াদ ইবন যুরারা মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সাথে করে বনী 'আবদিল আশহাল ও বনী যাফারের দিকে বের হলেন। তাঁরা বনী যাফারের একটি বাগিচায় প্রবেশ করে 'মা'রাক' নামক একটি কূপের ধারে প্রাচীরের ওপর বসলেন। তাঁদের চারপাশে লোকজন জড় হল। সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর ছিলেন বনী 'আবদিল আশহালের নেতা। তখনও তারা পৌত্তলিক ছিলেন। সা'দ ছিল্রেন আস'য়াদের খালাতো ভাই। আস'য়াদ ও মুস'য়াবের আগমনের কথা জানতে পেয়ে সা'দ উসাইদকে বললেন ঃ 'উসাইদ, তুমি এ দু'ব্যক্তির কাছে যাওতো। তারা আমাদের বাড়ীর উপর এসে আমাদের দুর্বল লোকগুলিকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদেরকে নিষেধ করে এস। যদি আমার খালাতো ভাই আস'য়াদ না থাকতো তাহলে তোমার প্রয়োজন হতো না। আমিই তাদের তাড়িয়ে দিতাম' উসাইদ

বল্লম হাতে নিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল। আস'য়াদ তাকেদেখে মুস'য়াবকে বললেন, 'এ ব্যক্তি তার গোত্রের একজন নেতা, আপনার কাছে এসেছেন।' হযরত মুস'য়াব তার সাথে কথা বললেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই বৈঠকেই উসাইদ মুসলমান হয়ে গেলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৮৭/১৯০)

আস'য়াদ ও মুস'য়াবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মদীনায় ইসলামের এত ব্যাপক প্রসার হল, যে, মাত্র এক বছর পর নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের মওসুমে তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন নারী-পুরুষের একটি দল আবার মিনার 'আকাবায় গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়। এই তৃতীয় তথা সর্বশেষ 'আকাবায় আস'য়াদও তাঁর দ্বীনী শিক্ষক মুস'য়াবের সাথে উপস্থিত ছিলেন। এই 'আকাবায় কে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাইয়াত বা শপথ করেন সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। একটি মতে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি আস'য়াদ। (আল-ইসাবা-১/৩৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪, উসুদুল গাবা-১/৭১)

আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর থেকে বর্ণিত। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন 'নাকীব' নির্বাচন কর, যাঁরা হবে ঈসার হাওয়ারীদের (সাথী) মত আপন আপন গোত্রের কাফীল বা দায়িত্বশীল।' আস'য়াদ সায় দিয়ে বললেন ঃ 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেনঃ তুমি হবে তোমার গোত্রের 'নাকীব'। তারপর তিনি অন্য 'নাকীব'-দের নাম ঘোষণা করেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮২) এভাবে তিনি হলেন রাসূল (সা) মনোনীত বনী নাজ্জারের 'নাকীব'। তবে ইবন মুন্দাহ ও আবূ নু'ঈমের মতে তিনি ছিলেন বনী সায়িদার 'নাকীব'। ইবনুল আসীর বলেন, এটা তাঁদের ধারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নিজ গোত্র বনী নাজ্জারের 'নাকীব'। তাই তিনি যখন মারা যান তখন বনী নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন করে-'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আস'য়াদ মারা গেছেন, তিনি ছিলেন আমাদের নাকীব। এখন আপনি অন্য একজন নতুন 'নাকীব' নির্বাচন করে দিন। জবাবে রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা আমার মাতুল গোত্র। আমিই তোমাদের 'নাকীব'। এটা ছিল বনী নাজ্জারের জন্য বিরাট মর্যাদা। (উসুদুল গাবা-১/৭১-৭২) রাসূল (সা) তাঁকে শুধু নাকীবই মনোনীত করেননি, বরং 'নাকীব আল-নুকাবা বা প্রধান দায়িত্বশীল বলেও ঘোষণা দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪) ইবনুল আসীর বলেন, একমাত্র জাবির ইবন আবদিল্লাহ ছাড়া আস'য়াদ ছিলেন এই আকাবীদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। (উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪)

আকাবার তৃতীয় বাই'য়াতের পর এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে যান। বয়স অল্প হলে কি হবে। তাঁর ঈমানী জযবা বা আবেগ ছিল অতি তীব্র। তিনি মদীনায় জামা'য়াতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন এবং চল্লিশজন মুসল্লী নিয়ে সর্বপ্রথম মদীনায় জুম'আর নামাযও আদায় করা শুরু করেন। আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক বলেন, আমার আব্বা কা'ব শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গেলে আমি তাঁকে নিয়ে বেড়াতাম। আমি তাঁকে নিয়ে জুম'আর নামাযের জন্য বের হলে যখনই আযান শুনতে পেতেন, তিনি আবু উমামা আস'য়াদ ইবন যুরারার জন্য ইসতিগফার ও দু'আ করতেন। একদিন আমি বললাম ঃ 'আব্বা, আপনি আযান শুনলে এভাবে সব সময় তাঁর জন্য দু'আ করেন কেন?' বললেন ঃ 'বেটা! রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদেরকে বনী বায়দা'র 'হাযমুন নাবীত' নামক পাহাড়ের কাছে 'নাকী আল-খাদিমাত' নামক স্থানে একত্র করে জুম'আর নামায আদায় করতেন। আমাদের সংখ্যা হত ৪০ জন।' (উসুদুল গাবা-১/৭১,

আল-ইসাবা-১/৩৪, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৫, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৭) মদীনায় সর্বপ্রথম কে জুম'আর নামায কায়েম করেন সে ব্যাপারে মতভেদ আছে।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় পৌছার পর যদিও আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) বাড়ীতে ওঠেন, তবে তাঁর বাহন উটনীটি আস'য়াদের মেহমান হয়। (তাবাকাত-১/১৬০) রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় পৌছার প্রথম ক্ষণটিতে উটনীটি সর্ব প্রথম বসে পড়ে এবং পরে যে স্থানটি রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদ ও বাসস্থানের জন্য নির্বাচিত হয়, সেই ভূমির মালিক ছিল সাহল ও সুহাইল নামক দুই ইয়াতীম বালক। আর তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারা। (বুখারী, হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৩) রাসূল (সা) বালক দু'টির মুরব্বী আস'য়াদের নিকট ভূমির মূল্য জানতে চান। বালক দু'টি সাথে সাথে বলে ওঠে, 'আমরা আল্লাহর কাছেই এর মূল্য চাই।' যেহেতু বিনা মূল্যে রাসূল (সা) ভূমি গ্রহণে রাজী হলেন না তাই হযরত আবু বকর (রা) তার মূল্য পরিশোধ করেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁর বনী বায়দায় অবস্থিত একটি বাগিচা মসজিদের এই ভূমির বিনিময়ে ইয়াতীমদ্বয়কে দান করেন। (যারকানী-১/৪২২)

বালাজুরী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমনের পর আবু আইউবের বাড়ীতে অবস্থানকালে আস'য়াদ ইবন যুরারা এক রাত পর পর পালাক্রমে তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন। আস'য়াদের বাড়ী থেকে খাবার আসার পালার রাতে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ 'আস'য়াদের পিয়ালাটি কি এসেছে?' বলা হত, 'হাঁ।' তিনি বলতেনঃ 'তা হলে সেইটি নিয়ে এস।' বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তাতে আমরা বুঝে নিতাম তাঁর খাবারটি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৭) ওয়াকিদী হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) মদীনায় আবু আইউবের বাড়ীতে ওঠার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন : 'আবু আইউব, তোমার কি কোন খাট (পালঙ্ক) আছে?' উল্লেখ্য যে, মক্কায় কুরাইশরা খাটে ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। আবু আইউব বললেন : 'না।' একথা আসা'য়াদ ইবন যুরারার কানে গেল। তিনি একটি স্তম্ভ ও কারুকার্য করা পায়া বিশিষ্ট একটি খাট পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) তাঁর ওপর ঘুমাতেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন আমার ঘরে চলে আসেন এবং আমার মা আমাকে যে খাটটি দেন তাতেই তিনি ঘুমাতেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫২৫)

হযরত তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর আস'য়াদের বাড়ীতে ওঠেন। হযরত হামযাও তাঁর বাড়ীতে ওঠেন বলে বর্ণিত আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৭-৪৭৮)

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ তখন চলছে। এমন সময় প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁর পরকালের ডাক এসে যায়। তিনি 'জাবহা' নামক কণ্ঠনালীর এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজ হাতে তাঁর আক্রান্ত স্থানে সেক দেন, তাঁর মাথায় হাত দেন; কিন্তু কোন উপকার দেখা গেল না। তিনি মারা যান। ওয়াকিদীর মতে হিজরতের পর ৯ম মাসে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যথিত হন। তিনি বলেন, "এখন তো ইয়াহুদীরা বলে বেড়াবে 'যদি তিনি নবী হতেন তাহলে তাঁর সাথী মরতো না, অথচ আমি কি মৃত্যুর চিকিৎসা করতে পারি?" হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৭, উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩)

বলা হয়ে থাকে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর এটাই প্রথম মৃত্যু। আর এটাও ধারণা করা হয় যে, এবারই সর্বপ্রথম রাসূল (সা) জানাযার নামায আদায় করেন। আনসারদের ধারণা মতে বাকী'তে দাফনকৃত প্রথম মুসলমান আস'য়াদ আর মুহাজিরদের মতে 'উসমান ইবন মাজ'উন। (আল-ইসাবা-১/৩৪)

মৃত্যুকালে হযরত আস'য়াদ দু'টি কন্যা সন্তান রাসূলুল্লাহর (সা) জিম্মায় ছেড়ে যান। রাসূল (সা) আজীবন তাদের দেখাশুনা করেন। মোতির দানা মিশ্রিত সোনার বালা তিনি তাদের হাতে পরান। এক মেয়েকে তিনি সাহল ইবন হুনাইফের সাথে বিয়ে দেন এবং সেখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আবু উমামা বিন সাহল। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, আল-ইসাবা-১/৩৪)

আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান (রা)

আবুল হায়সাম উপনামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম এবং কোন্ গোত্রের সন্তান সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। একটি মতে 'আবদুল্লাহ' তাঁর আসল নাম। তবে অন্য একটি মতে 'মালিক' তাঁর নাম। আর এ মতের ওপরই মূসা ইবন 'উকবা, ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, আবূ মা'শার ও মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তেমনিভাবে তাঁর গোত্র ও পিতার নামের ব্যাপারেও মতভেদ আছে। এক মতে পিতা বালী ইবন আমর ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'য়া। এই হিসাবে তাঁকে আল-বালাবী বলা হয়। এটাই ইবন সা'দের মত। এ মতের বিরোধিতা করেছেন ইবন ইসহাক ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আম্মারা আল-আনসারী। ইবন ইসহাক বলেছেন, আবুল হায়সাম, যিনি বদরে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর নাম মালিক এবং তাঁর ভাইয়ের নাম আতীক। তাঁরা উভয়ে তায়্যিহানের ছেলে। আর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারী বলেন, আবুল হায়সাম আউস গোত্রের সন্তান। তাঁর মা লায়লা বিনতু আতীক। এটাই অধিকাংশের মত। (তাবাকাত-৩৪৪৭, আল-ইসাবা ৪/২১২., সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৩) তাঁর জন্মের সঠিক সময় জানা যায় না।

আবুল হায়সাম তাঁর বন্ধু আস'য়াদ ইবন যুরারার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। একটি বর্ণনা মতে আস'য়াদ ইবন যুরারা ও জাকওয়ান ইবন 'আবদি কায়েস মক্কায় 'উতবা ইবন রাবী'য়ার নিকট যান। সেখানে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াতের কথা শুনতে পেয়ে গোপনে তাঁর সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। আস'য়াদ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আবুল হায়সামের সাথে দেখা করেন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দা'ওয়াতের কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। ইবন সা'দ বলেন, ইয়াসরিবে পূর্ব থেকে- সেই জাহিলী যুগে আস'য়াদ ও আবুল হায়সাম ছিলেন তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা। আবুল হায়সাম বন্ধু যুরারার মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দা'ওয়াতের কথা শুনে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ না করে সাথে সাথে বলে ওঠেন ঃ 'আনা আশহাদু মা'য়াকা আন্নাহু রাসূলুল্লাহ- আমিও তোমার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল।' এভাবে তিনি তাঁর বন্ধু যুরারার হাতে মুসলমান হন।

পরের হজ্জ মওসুমে যেবার আটজন মতান্তরে ছয়জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে দেখা করে বাই'য়াত বা শপথ করেন তাঁদের মধ্যে আবুল হায়সামও ছিলেন। ইতিহাসে এ বাই'য়াতকে আকাবার প্রথম বাই'য়াতও বলা হয়। তবে একটি বর্ণনা মতে, উক্ত বাই'য়াত বা শপথে আবুল হায়সাম ছিলেন না। (তাবাকাত-১/২১৮-২১৯) উক্ত মতে, আস'য়াদ প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ফিরে এসে আবুল হায়সামকে ইসলামের দাও'য়াত দেন। এ দাওয়াতেই আবুল হায়সাম ইসলাম গ্রহণ করেন। এর এক বছর পর বারো জনের সাথে এবং তারও পরের বছর তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের সাথে তিনি 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত হন। এভাবে তিনি

'আকাবার সব ক'টি বাই'য়াতে শরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। (তাবাকাত-১/২২, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৩)

একটি বর্ণনা মতে, শেষ 'আকাবায় আবুল হায়সাম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের জন্য সর্ব প্রথম নিজের হাতটি বাড়িয়ে দেন। মুসা ইবন 'উকবা ইমাম যুহরী থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৭, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪)

তৃতীয় আকাবার শপথের সময় মদীনাবাসীরা যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো তখন মক্কা ও মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে যে কয়েকজন লোক ভাষণ দেন, আবুল হায়সাম তদের অন্যতম। তাবারানী 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করার সময় বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাথে অন্য লোকদের চুক্তি আছে। এমনও কি হতে পারে, আমরা সেই চুক্তি বাতিল করলাম, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, আর এ দিকে আপনি স্বগোত্রে ফিরে এলেন? তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) একটু হাসি দিয়ে বললেন ঃ তোমাদের রক্তের দাবীর অর্থ হবে আমারই রক্তের দাবী, তোমাদের রক্তপাত মানে আমারই রক্তপাত। অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আবুল হায়সাম সাথীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা। এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী। আজ তিনি মক্কার হারামে আত্মীয়দের মধ্যে নিরাপদেই আছেন। জেনে রাখ, যদি তোমরা এখান থেকে বের করে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও তাহলে সমগ্র আরববাসী একই ধনুক থেকে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ সকলের সাধারণ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি বিলিয়ে দিতে রাজী থাক তাহলেই তাঁকে তোমাদের ভূমিতে আমন্ত্রণ জানাও। কারণ, তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। তোমরা যদি পরে অনুশোচনার ভয় কর তাহলে ভেবে দেখ।" আবুল হায়সামের এ বক্তব্যের পর তাঁর সাথীরা বললো ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু আমাদের দিয়েছেন, আমরা তা কবুল করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নিকট যা কিছু দাবী করেছেন আমরা তা আপনাকে দান করলাম। আবুল হায়সাম, আপনি একটু সরে দাঁড়ান, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করি।' আবুল হায়সাম বললেন ঃ আমিই প্রথম বাই'য়াত করি। তাঁর বাই'য়াতের পর অন্যরা একের পর এক বাই'য়াত করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৭, ২৪৮, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪২) এ বাই'য়াতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) বারোজন নাকীব বা দায়িত্বশীলের নাম ঘোষণা করেন। আউস গোত্র থেকে আবুল হায়সাম, উসাইদ ইবন হুদাইর ও সা'দ ইবন খায়সামা- এই তিনজন নাকীব মনোনীত হন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করে প্রখ্যাত মুহাজির হযরত উসমান ইবন মাজ'উনের সাথে আবুল হায়সামের মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১, আল-ইসাবা-৪/২১২)

বদর, উহুদ, খন্দকসহ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। উহুদে তাঁর ভাই আতীক ইবন তায়্যিহান ইকরিমা উবন আবী জাহলের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। (আনসাব-১/৩২৯) ইবন সা'দ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা মূতায়

শহীদ হওয়ার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবুল হায়সামকে খেজুরের পরিমাপকারী হিসাবে খাইবারে পাঠান। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকরও তাঁকে এ পদে বহাল রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। (তাবাকাত–৩/৪৪৮)

খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। একটি বর্ণনা মতে হিজরী ৩৭ সনে সিফ্ফীন যুদ্ধের পূর্বে তাঁর মৃত্যুর কথা জানা যায়। ইমাম আসমা'ঈ একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবুল হায়সামের গোত্রের লোকদের নিকট তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। হিজরী ২১ সনেও তাঁর মৃত্যুর কথা যেমন অনেকে বলেছেন তেমনি কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, তিনি সিফ্ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। অনেকে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, তিনি সিফ্ফীনে 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। (আনসাব–১/২৪০, সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৩৩) ঐতিহাসিক ওয়াকিদী স্পষ্ট করে বলেছেন, সিফ্ফীনে তাঁর যোগদানের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর বিপরীতে হিজরী ২০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা ইমাম যুহরী, সালেহ ইবন কায়সান এবং হাকেমের মত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসীন থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর বিপরীতে একটি সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (সীয়ারে আনসার–২)

হাদীসের গ্রন্থসমূহে আবুল হায়সাম থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস দেখা যায় তবে সেগুলির বিশুদ্ধতা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। ইবন হাজার 'আসকালানী বলেছেন ঃ আবুল হায়সাম থেকে বর্ণিত যত হাদীস দেখা যায় তার সবই সন্দেহযুক্ত। এমন কোন একটি বর্ণনা শৃঙ্খল পাওয়া যায় না যার দ্বারা সেগুলির কোন একটির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এর কারণ হল, বহু আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। (আল–ইসাবা–৪/২১৩)

আল–হায়সাম ইবন নাসর আল–আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহানের 'জাসিম' নামক একটি কূয়ো ছিল। এই কূয়োর পানি ছিল সুমিষ্ট। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এই কূয়ো থেকে পানি আনতাম। একবার গরমের দিনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু বকরকে (রা) সংগে করে আবুল হায়সামের বাড়ীতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ ঠান্ডা পানি আছে কি? আবুল হায়সাম এক বালতি বরফের মত ঠান্ডা পানি নিয়ে আসেন। ছাগলের দুধের সাথে সেই ঠান্ডা পানি মিশিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) পান করান। তারপর আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি ঠান্ডা ছাউনী ('আরীশ) আছে। এই দুপুরে আপনি সেখানে একটু বিশ্রাম নিন। আবুল হায়সাম ছাউনীর ওপর পানি ছিটিয়ে দেন। রাসূল (সা) আবু বকরকে সংগে করে সেখানে প্রবেশ করেন। আবুল হায়সাম বিভিন্ন ধরনের খেজুর এবং ডিশ ভর্তি 'সারীদ' (এক প্রকার উপাদেয় পানীয়) তাঁদের সামনে হাজির করেন। বর্ণনাকারী হায়সাম ইবন নাসর বলেন, রাসূল (সা), আবু বকর এবং আমরা সবাই তা আহার ও পান করলাম। তারপর নামাযের সময় হলে তিনি আবুল হায়সামের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে জামা'য়াতে নামায আদায় করেন। জামা'য়াতে আবুল হায়সামের স্ত্রী ছিলেন আমার পেছনে। নামায শেষে তিনি আবার ছাউনীতে ফিরে যান এবং সেখানে জুহরের ফরজের পরের দু'রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। (আনসাবুল আশরাফ– ১/৫৩৫)

একদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) অভ্যাসের বিপরীত,যখন তিনি ঘর থেকে বের হন

না এমন এক সময়ে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকরও আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, এমন অসময়ে বের হলে যে? বললেন, আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে 'উমারও উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকেও ঠিক একই প্রশ্ন করলেন। 'উমার জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ক্ষুধাই আমাকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমিও ক্ষুধার্ত। তিনজন একসাথে আবুল হায়সামের বাড়ীতে গেলেন। তাঁর ছিল খেজুরের বাগান এবং বকরীর পাল। কিন্তু কোন চাকর-বাকর ছিল না। সব কাজ নিজে করতেন। আর তখন তিনি বাড়ীতেও ছিলেন না। আওয়ায দিলে তাঁর স্ত্রী বললেন, পানি আনতে গেছেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি মশক ভর্তি পানি নিয়ে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে মশক মাটিতে রেখে দেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতে থাকেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! তারপর সবাইকে বাগানে নিয়ে যান। সেখানে বসার জন্য কোন জিনিস বিছিয়ে দেন। সবাইকে বসিয়ে রেখে খেজুরের একটি কাঁধি কেটে নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যদি পাকা খেজুর নিয়ে আসতে। বললেন ঃ এতে কাঁচা-পাকা সব রকমের আছে, আপনার খুশীমত গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) সেই খেজুর থেকে কিছু খেলেন। তারপর পানি পান করলেন। সেই পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। রাসূল (সা) পানাহারের পর বললেন, দেখ, আল্লাহর কত নি'য়ামত। ছায়া, উৎকৃষ্ট খেজুর, ঠান্ডা পানি- আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন এর সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আবুল হায়সাম সম্মানিত মেহমানদের বাগানে বসিয়ে রেখে বাড়ীতে আসেন এবং খাবারের আয়োজন করেন। তিনি ছোট একটি ছাগল জবেহ করেন এবং তা ভুনা করে মেহমানদের সামনে পেশ করেন। আহার পর্ব শেষ করে রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি কোন চাকর নেই। বললেন ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার হাতে কোন যুদ্ধবন্দী এলে তুমি আমার কাছে এস। সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দু'জন যুদ্ধবন্দী আসে। তিনি আবুল হায়সামকে তাদের যে কোন একজনকে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন। রাসূল (সা) তাদের একজনকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেন ঃ এর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তিনি দাসটিসহ বাড়ীতে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশের কথা স্ত্রীর নিকটবলেন।

স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-পালন করতে চাও, তাহলে তাকে আযাদ করে দাও। তিনি স্ত্রীর পরামর্শ মত দাসটি আযাদ করে দেন। তাঁদের এ কাজের কথা রাসূল(সা) জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং তাদের দু'জনেরই প্রশংসা করেন। (তিরমিজী-৩৯১) তাছাড়া কানসূল 'উম্মাল গ্রন্থেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ আল-মুনজিরী বলেন, এই ঘটনাটি আবুল হায়সাম ও আবু আইউব আল-আনসারী উভয়ের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩১০)

আবুল হায়সামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা 'আকাবায় কিসের ওপর বাই'য়াত করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলরা মূসার (আ) হাতে যে বিষয়ের বাই'য়াত করেছিল আমরাও রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ঠিক সেই বাই'য়াত করেছিলাম। (আনসাবুল আশরাফ ১/২৪০)

উসাইদ ইবন হুদাইর (রা)

প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী উসাইদ মদীনার ঐতিহ্যবাহী আউস গোত্রের বনী 'আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৪০) সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর একাধিক কুনিয়াত বা ডাকনাম দেখতে পাওয়া যায়। যেমনঃ পুত্র ইয়াহইয়ার নাম অনুসারে আবু ইয়াহইয়া, আবু ঈসা– এ নামে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ডেকেছেন বলে বর্ণিত আছে। (উসুদুল গাবা–১/৯২) তাছাড়া আবু 'আতীক, আবু হুদাইর, আবু 'আমর ইত্যাদি নামের কথাও জানা যায়। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার–১/২২৮), উসুদুল গাবা–১/৯২, আনসাবুল আশরাফ–১/২৪০, আল–আলাম–১/৩৩০)

তাঁর পিতার নাম হুদাইর ইবন সিমাক এবং মাতার নাম উম্মু উসাইদ বিনতু উসকুন। হুদাইর ছিলেন আউস গোত্রের একজন রয়িস বা নেতা। ইসলামপূর্ব যুগে মদীনার চির বৈরী আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলির নেতৃত্ব দেন হুদাইর। তিনি ছিলেন আউস গোত্রের প্রধান ঘোড় সাওয়ার। তাঁর নিজস্ব একটি মজবুত দুর্গও ছিল। (উসুদুল গাবা–১/৯২) আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি ছিল 'বু'য়াসের' যুদ্ধ। এ যুদ্ধেরও সিপাহসালার ছিলেন হুদাইর, আর প্রতিপক্ষ খাযরাজ গোত্রের সেনাপতি ছিলেন 'আমর ইবন নু'মান রুজাইলা। উভয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করেন। এক পর্যায়ে আউস গোত্র পরাজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় হুদাইর নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। খাযরাজ সেনাপতি 'আমর নিহত হন এবং আউস গোত্র বিজয়ী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (সীয়ারেআনসার–১/২২৮)

উপরোক্ত 'বুয়াস' যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বছর পর মক্কায় 'আকাবার বাই'য়াত অনুষ্ঠিত হয় এবং মদীনাবাসী নওমুসলিমদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুসয়াব ইবন 'উমাইরকে তাবলীগে ইসলামের উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠান। উসাইদ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মদীনায় হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের হাতে এবং হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালের পূর্বে। কারো কারো মতে তিনি শেষ আকাবার পরে অর্থাৎ যে বার ৭৩/৭৫ জন মদীনাবাসী মক্কার আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন, তারও পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে একথা সঠিক নয়। কারণ, তিনি যে এই শেষ আকাবায় শরীক হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বনী আবদুল আশহালের 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন তা সীরাত গ্রন্থসমূহে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা–১/৯২, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম–১/১৮১, আল–আ'লাম–১/৩১০ আল–ইসাবা–১/৪৯)

হযরত উসাইদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থসমূহে চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর মদীনায় হযরত আস'য়াদ ইবন যুরারার গৃহে অতিথি হন এবং বনী জাফার গোত্রে বসে মানুষকে কুরআনের তা'লীম দিতে থাকেন। বনী জাফারের

বসতি ছিল 'আবদুল আশহাল গোত্রের কাছাকাছি। একদিন মুস'য়াব (রা) একটি বাগানে বসে মুসলমানদের কুরআনের তা'লীম দিচ্ছেন, একথা সা'দ ইবনে মু'য়াজ এবং উসাইদ ইবন হুদাইর জেনে ফেলেন। সা'দ উসাইদকে বললেন, তুমি সেখানে যাও এবং তাকে বল, সে যেন ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের এ মহল্লার চৌহদ্দিতে না আসে। যদি আস'য়াদ ইবন যুরারা এর মধ্যে না থাকত, আমি নিজেই যেতাম। উল্লেখ্য যে, আস'য়াদ ছিলেন সা'দের খালাতো বা মামাতো ভাই। সা'দের কথামত উসাইদ নিজ হাতে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য বাগিচার দিকে চললেন। আস'য়াদ তাঁকে আসতে দেখে মুস'য়াবকে বললেন, 'দেখুন একটি লোক আপনার কাছে আসছে। সে তার গোত্রের সরদার, আপনি তাঁকে মুসলমান বানিয়েদিন।'

উসাইদ অত্যন্ত গরম মেজাজে বললেন, 'এভাবে তোমরা আমাদের দুর্বল লোকগুলিকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছ কেন? যদি ভালো চাও, এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।' রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব হাসিমুখে অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বললেন, 'আপনি বসুন, আমার কথা একটু শুনুন। পছন্দ হলে কবুল করবেন, আর না হলে আমি বন্ধ করে চলে যাব।' উসাইদ বললেন, এ তো বড় বুদ্ধিমত্তা ও ইনসাফের কথা।'

হযরত মুস'য়াবের এমন বিনীত আচরণে উসাইদের রাগ পড়ে গেল। তিনি বসে পড়লেন। মুস'য়াব তাঁর সামনে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। মুস'য়াব কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন, আর এ দিকে উসাইদের চেহারাও একটু একটু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'এই দ্বীনে দাখিল হওয়া যায় কিভাবে? মুস'য়াব বললেন, প্রথমে গোসল ও পাক–সাফ কাপড় পরে কালিমা উচ্চারণ করতে হবে। তারপর সালাত আদায় করতে হবে।' মুস'য়াবের কথা শেষ না হতে উসাইদ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পর আবার যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর মাথার চুল ভিজা এবং পরনে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন কাপড়। তারপর মুস'য়াবের হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন, 'আশহাদু আন লা–ইলাহা ইল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু– আমি সাক্ষ দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর তিনি মজলিস থেকে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'আমি যাচ্ছি এবং অন্য নেতাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাদেরকেও মুসলমান বানিয়ে ছাড়বেন।' (হায়াতুস সাহাবা–১/১৮৮–১৮৯, সীয়ারেআনসার–১/২২৯)

উসাইদ উঠে সোজা সা'দ ইবন মুয়াজের দিকে চলে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে সা'দের কাছে বসা লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, সে আসছে, কিন্তু যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো তাতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যাওয়ার সময় ছিল দারুণ উত্তেজিত আর এখন দেখা যাচ্ছে শান্ত–শিষ্ট ও হাসিখুশি।

এ ক্ষেত্রে উসাইদ তাঁর বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, মুস'য়াবের মুখ থেকে তিনি যা শুনেছেন, সা'দও তা শুনুক। কিন্তু তিনি যদি সরাসরি ঘোষণা দেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমিও আমার অনুসরণ কর, তাহলে সে হয়তো উসাইদের

ওপর ঝাপিয়ে পড়তো। তিনি তা না করে সা'দকেও মুস'য়াবের সামনে হাজির করতে চাইলেন।

মুস'য়াব ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারার অতিথি। তাই সা'দকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উসাইদ বললেন, 'আমি শুনেছি, বনী হারেসার লোকেরা আস'য়াদ ইবন যুরারাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তো একথা ভালো করেই জানে সে তোমার মামাতো ভাই।'

সা'দ রাগে ফুঁসে উঠলেন। সাথে সাথে তিনি তীর হাতে নিয়ে মুস'য়াব ও আস'য়াদের কাছে পৌছলেন। সেখানে কোন শোরগোল বা ঝগড়া-বিবাদের চিহ্ন দেখতে পেলেন না; বরং তার বিপরীত এক শান্ত পরিবেশে মুস'য়াব মানুষকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছেন আর লোকেরা মনোযোগ সহকারে তা শুনছে। সা'দ তার বন্ধু উসাইদের ধোঁকা বুঝতে পারলেন। তিনিও মুসয়াবের কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৬-৪৩৭, রিজালুন হাওলার রাসূল-৪৬০-৪৬১)

হযরত উসাইদের ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত যায়িদ ইবন হারিসার (রা) সাথে উসাইদের 'মুওয়াখাত' বা দ্বীনি ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা-১/৯২· আল ইসাবা-১/৪৯)

উহুদ থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-১/৩৩০) বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ওয়াকিদী, ইবন ইসহাক ও ইবনুল কালবীর মতে তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেননি। তবে কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (উসুদুল গাবা-১/৯২, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪০,তাবাকাত-৩/৬০৫) ইবন সা'দ বলেন, উসাইদের মত আরও কয়েকজন নাকীব সাহাবীসহ কিছু বিশিষ্ট সাহাবী বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। বালাজুরী বলেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) বদরের দিকে যাত্রা করলেন; কিন্তু তাঁর কিছু সাহাবী পিছনে থেকে গেলেন। তাঁরা ধারণা করতে পারেননি যে, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে। এই পিছনে থেকে যাওয়া সাহাবীদের একজন হলেন উসাইদ। রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধ শেষ করে যখন মদীনায় ফিরলেন, উসাইদ দ্রুত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ বিজয় দান করায় তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। নিজে যোগদান করতে না পারার জন্য দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করলেন। কৈফিয়াত হিসাবে বললেন ঃ আমি ধারণা করেছিলাম, ওটা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা। তাঁদের সাথে আপনি যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। আমি যদি বুঝতাম, তারা শত্রু এবং তাদের সাথে আপনার সংঘর্ষ হবে তাহলে কক্ষণো পিছনে পড়ে থাকতাম না। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর কথা বিশ্বাস করেন। ইবন সা'দ ও একই কথা বর্ণনা করেছেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮, তাবাকাত-৩/৬০৫)

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় সা'দ ইবন মু'য়াজ', উসাইদ ইবন হুদাইর ও সা'দ ইবন উবাদার নেতৃত্বে একদল লোক রাসূলুল্লাহর (সা) পাহারায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁরা সারারাত রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় পাহারা দিতেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৪)। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এক পর্যায়ে যখন প্রায় সকল সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়েন, তখনও তিনি মুষ্টিমেয় কিছু সাহাবীর সাথে অটল

থাকেন। এই যুদ্ধে তাঁর দেহের সাতটি স্থান দারুণভাবে আহত হয়। (আল ইসাবা–১/৪৯), আল–আ'লাম–১/৩৩০) উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য তাঁদের আত্মীয়–পরিজন কান্নাকাটি করতে থাকে। তা দেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন, আজ হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই। সা'দ ও উসাইদ একথা শুনে নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাঁদের নারীদের হামযার স্মরণে বিলাপের নির্দেশ দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৯৯) উহুদের দিনে বনী আউসের পতাকা ছিল উসাইদের হাতে। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ ভুলবশতঃ নিজেদের সৈনিকদের কাফির সৈনিক মনে করে আঘাত করে বসেন। উসাইদ ভুলক্রমে আবু বারদাহ ইবন নায়ারের হাতে আহত হন। তেমনিভাবে আবু যা'না না চিনতে পেরে আবু বারদাহকে তরবারির দুটি আঘাত করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের সম্পর্কে বলেন, সে তোমাদের কেউ এভাবে নিহত হলেও শহীদ হবে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩১৮, ৩২২)

তিনি খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দশ দিন পর্যন্ত মুসলমানরা মদীনায় ঘেরাও অবস্থায় ছিল। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনী মুসলিম নেতৃবৃন্দের খোঁজে রাতে ঘুরা–ফিরা করতো। উসাইদ তখন দুই শো লোক নিয়ে খন্দক রক্ষা করেন। খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাতফান গোত্রের লোকেরা খুব লুটতরাজ শুরু করে দিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের নেতা আমের ইবন তুফাইল ও যায়িদকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তারা মদীনায় উপস্থিত হয়ে সম্মিলিতভাবে বলল, যদি মদীনায় উৎপাদিত ফলের একটি অংশ তাঁদের দেওয়া হয় তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উসাইদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাতের নিযা দিয়ে দুইজনের মাথায় টোকা দিয়ে বলে উঠলেন ঃ খেঁকশিয়াল, দূর হ এখান থেকে। একথায় আমের দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। সে জিজ্ঞেস করে– তুমি কে?

–উসাইদ ইবন হুদাইর।

–কাতাইবের পুত্র? (উল্লেখ্য যে, কাতাইব উসাইদের পিতা হুদাইরের উপাধি)

–হ্যাঁ

–তোমার পিতা তোমার চেয়ে ভালো।

সংগে সংগে উসাইদ গর্জে উঠে বললেন, 'কক্ষণও না। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে এবং আমার পিতার চেয়ে ঢের ভালো। কারণ তিনি কাফির ছিলেন।' (সীয়ারে আনসার–১/২৩০)

সম্ভবতঃ উপরোক্ত ঘটনাটিই ইবন আব্বাস থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আমির ইবন তুফাইল ও আরবাদ ইবন কায়েস নামক দুই ব্যক্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলো। আমির রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে বলল, 'মুহাম্মাদ, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমাকে কী দেবেন?' রাসূল (সা) বললেন ঃ সকল মুসলমানের জন্য যা হবে তোমার জন্যও তাই হবে। তাদের মত তোমার ওপরও একই দায়িত্ব বর্তাবে। আমির বলল, 'আমি মুসলমান হলে আপনার পরে কি আমাকে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন? রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি বা তোমার গোত্রের কেউ তা পাবে না। তবে তুমি অশ্বারোহী বাহিনীর একজন নেতা হতে পারবে।' এভাবে তাদের সাথে আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর তারা উঠে গেলো। তারপর তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র আটলো। রাসূলুল্লাহর (সা)

নিকট তাদের সে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। তারা পালিয়ে গেল। মু'য়াজ ও উসাইদ তাদের ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে উসাইদ তাদের লক্ষ্য করে বলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমনরা তোদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' পথিমধ্যে দুইজনেরই অপঘাতে মৃত্যু হয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৪৮–৪৯)

হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠায়। সে ছোট্ট একটি খঞ্জর কোমরে লুকিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা জিজ্ঞেস করতে করতে বনী আবদিল আশহালের মসজিদে উপস্থিত হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তার চেহারা দেখেই বলে ওঠেন, 'এ ব্যক্তি ধোঁকা দিতে এসেছে।' সে হত্যার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে এগুতেই উসাইদ তার লুঙ্গি ধরে টান দেন। সাথে সাথে তার কোমর থেকে খঞ্জরটি ছিটকে পড়ে। সে বুঝতে পারে এখন আর রেহাই নেই। সে যাতে পালানোর চেষ্টা করতে না পারে, সেই জন্য উসাইদ তার গলার কাছে জামা খুব শক্ত করে ধরে রাখেন। (সীয়ারে আনসার–১/২৩০)

হিজরী ষষ্ঠ সনে বনী মুসতালিকের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষে সেখানে একটি কূপে উট–ঘোড়ার পানি পান করানোর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মুহাজির ও আনসারের মধ্যে সামান্য ঝগড়া হয়। এই সামান্য ঝগড়া মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই আরও উসকে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সে আনসারদের লক্ষ্য করে বলে ফেলে ঃ 'তোমরা তাদেরকে নিজ দেশে থাকার অনুমতি দিয়েছ, তোমাদের ধন–সম্পদ তাদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি তা না করতে তাহলে তারা অন্য কোথাও চলে যেত। যদি মদীনায় ফিরতে পারি তাহলে আমরা অভিজাতরা (মদীনাবাসীরা) এই নীচদের তাড়িয়ে ছাড়বো।' তার এসব কথা হযরত যায়িদ ইবন আরকাম শুনে ফেলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। হযরত রাসূলে কারীম খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন।

এই ঘটনার পর হযরত উসাইদ আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করতে। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ

–তোমাদের বন্ধু যা বলেছে, তা কি তুমি শুনেছ?

–ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন্ বন্ধু?

–আবদুল্লাহ ইবন উবাই।

–কী বলেছে?

–সে বলেছে, মদীনায় ফিরতে পারলে তারা অভিজাতরা নীচদেরকে বের করে দেবে।

উসাইদ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ আপনিই তাকে তাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহর কসম সে–ই নীচ, আর আপনি অতি সম্মানিত ও বিজয়ী। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/১২৯২)

উসাইদ আরও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আপনি তার প্রতি একটু সদয় হোন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সাথে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আর তার স্বগোত্রীয় লোকেরা তার জন্য মুকুট তৈরী করছিল, তাকে মদীনার বাদশাহ বানিয়ে তার মাথায় পরাবে বলে। সে স্বচক্ষে দেখতে পারবে তার সে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪৬৩)

একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাইর উপরোক্ত মন্তব্যের কথা অবগত হয়ে উসাইদ বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে লোকটি মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাকে

হত্যার অনুমতি আমাকে দিন। রাসূল (সা) বললেন, আমি নির্দেশ দিলে তুমি তাকে হত্যা করবে? উসাইদ বললেনঃ হ্যাঁ, আপনার অনুমতি পেলে তরবারি দিয়ে তার গর্দানটি উড়িয়ে দেব। রাসূল (সা) তাকে বসিয়ে শান্ত করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৭৪)

এই বনী মুসতালিক যুদ্ধের সফরে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। সফর থেকে মদীনায় ফেরার পথে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে। সীরাত গ্রন্থ সমূহে যা 'ইফ্‌ক' বা বানোয়াট কাহিনী বলে পরিচিত। কিছু সরলপ্রাণ মুসলমানও মুনাফিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে আল্লাহ পাক কুরআনের আয়াত নাযিল করে আসল রহস্য ফাঁস করে দেন। বিষয়টি যখন তুঙ্গে তখন একদিন উসাইদ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আউস গোত্রের লোকেরা আপনাকে কষ্ট দিলে আমরা তা বন্ধ করে দেব। আর আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা যদি কষ্ট দেয়, আমাদের নির্দেশ দিন। আল্লাহর কসম, তারা হত্যার উপযুক্ত।' 'খাযরাজ নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা সংগে সংগে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন, 'খাযরাজ গোত্রের লোক বলে তুমি এমন কথা বলতে পারছো, তোমার নিজের গোত্রের লোক হলে এমন কথা বলতে পারতে না।' 'উসাইদও সংগে সংগে গর্জে উঠে বলেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলেছ।' তুমি এক মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করছো।' (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৩০০)

খাইবার যুদ্ধে সালামা ইবন আকও'য়ার চাচা 'আমির এক ইয়াহুদীর ওপর আক্রমণ চালান; কিন্তু তাঁর তরবারির আঘাত ফসকে গিয়ে নিজেই আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উসাইদসহ অনেকে ধারণা করলেন, যেহেতু তিনি নিজের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, যা এক ধরনের আত্মহত্যা– এ কারণে তাঁর সকল নেক 'আমল ব্যর্থ হয়ে গেছে। সালামা বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে দিলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যারা এমন কথা বলেছে তাদের কথা ঠিক নয়। সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। (মুসলিম–২/৯৬)

মক্কা বিজয় অভিযানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুহাজির ও আনসারদের সাথে ছিলেন। তাঁর দলটি ছিল সকলের পিছনে। তিনি ছিলেন আবু বকর (রা) ও উসাইদের মাঝখানে। হুনাইন ও তাবুক অভিযানের সময় আউস গোত্রের ঝান্ডাটি ছিল উসাইদের হাতে।

সাকীফা-ই-বনী সা'য়িদার দিনটি– যেদিন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর আনসারদের একটি দল, যার পুরোভাগে ছিলেন হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা– দাবী করলেন, খিলাফতের অগ্রাধিকার আনসারদের। একথা মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো। তর্ক–বিতর্ক শুরু হল। উসাইদ ছিলেন আনসার গোত্র আউসের অন্যতম নেতা। সেই জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (উসুদুল গাবা–১/৯২) তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মুহাজিরদের একজন। তাঁর খলীফাও মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) আনসার বা সাহায্যকারী।" সা'দ ইবন মু'য়াজকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন ঃ "আজও আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফার আনসার হিসাবে থাকা।" (রিজালুন হাওলার রাসূল– ৪৬২)। এক পর্যায়ে তিনি নিজ গোত্র আউসের লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'খাযরাজ গোত্র সা'দ ইবন

'উবাদাকে খলীফা বানিয়ে নেতৃত্ব কুক্ষিগত করতে চায়। আজ যদি তারা সফল হয় তাহলে চিরদিনের জন্য তারা তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলবে এবং খিলাফতে তোমাদের কোন অংশ তারা আর কোন দিন দেবে না। আমার মতে আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা উচিত।' এরপর তিনি সকলকে আবু বকরের হাতে বাই'য়াত করার নির্দেশ দেন। এভাবে আউস গোত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে হযরত সা'দ ইবন উবাদার সমর্থকদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। (সীয়ারে আনসার।-২৩১)

হযরত আবু বকরের (রা) মরণ সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করে যাবেন- এ বিষয়ে মুহাজির-আনসার নির্বিশেষে যে সকল বিশিষ্ট সাহাবীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উসাইদও (রা) ছিলেন। আবু বকর (রা) যখন উমার (রা) সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন, তিনি বললেন ঃ 'আপনার পরে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে আমি তাঁকে ভালোই দেখতে পাই। .....তাঁর ভেতরটা বাইরের থেকে উত্তম। এই দায়িত্ব লাভের জন্য তাঁর চেয়ে অধিকতর সক্ষম ব্যক্তি আর কেউ নেই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৬) হিজরী ১৬ সনে তিনি খলীফা 'উমারের (রা) সাথে মদীনা থেকে বায়তুল মাকদাসে যান। (উসুদুল গাবা-১/৯২)

হিজরী ২০ সনের শা'বান মাসে, মতান্তরে হিজরী ২১ সনে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। খলীফা হযরত উমার (রা) কাঁধে করে তাঁর লাশ বহন করেন, জানাযার নামায পড়ান এবং বাকী গোরস্থানে দাফন করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪০), তাবাকাত-৩/৫০৬, শাজারাতুজ জাহাব ফী আখবারি মান জাহাব-১/৩১)

মৃত্যুর পূর্বে তিনি খলীফা 'উমারকে অসীয়াত করে যান, তিনি যেন তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজ হাতে নিয়ে তাঁর সকল দায়-দেনা পরিশোধ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত 'উমার (রা) পাওনাদারদের ডেকে তাদেরকে এই শর্তে রাজী করান যে, তারা বছরে এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করবেন। এভাবে চার বছরে বাগানের ফল বিক্রী করে সকল দেনা পরিশোধ করা হয়। এভাবে তাঁর সকল সম্পত্তি রক্ষা পায়। 'উমার (রা) বলতেন, 'আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমি অভাবী দেখতে চাই না।' (তাবাকাত-৩/৬০৬, উসুদুল গাবা-১/৯৩)

হযরত উসাইদের স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। (সীয়ারে আনসার-১/২৩১) হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'একবার আমরা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে মদীনায় ফিরলাম। আমাদেরকে জুল হুলায়ফায় অভ্যর্থনা জনানো হল। আনসারদের পরিবারবর্গের লোকেরা আপন আপন পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হল। এখানে উসাইদকে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর খবর দেওয়া হল। তিনি মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী, আর আপনি কিনা একজন মহিলার জন্য এভাবে কাঁদছেন? আয়িশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি মাথা থেকে কাপড় ফেলে দিলেন। এবং বললেন ঃ আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। 'সা'দ ইবন মু'য়াজের পর আর কারও জন্য আমাদের কাঁদা উচিত নয়।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯৫, মুসনাদে আহমদ-২/৩৫২)

সম্ভবতঃ ইয়াহইয়া নামে উসাইদের একটি মাত্র ছেলে ছিল। সহীহ বুখারীর 'বাবু

নুযুলিস সাকীনা ওয়াল মালায়িকা ইনদা কিরায়াতিল কুরআন" (কুরআন পাঠের সময় প্রশান্তি ও ফিরিশতার অবতরণ) অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা এসেছে।

কুরআন ও হাদীসের প্রচার-প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান আছে। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত 'আয়িশা, আবু সা'ঈদ আল খুদরী, আনাস বিন মালিক, আবু লাইল আনসারী, ও কা'ব ইবন মালিকের মত অতি সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নিকট থেকে শ্রুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর সর্বমোট ১৮ (আঠারো) টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আল-আলাম-১/৩৩০, আল-ইসাবা-১/৪৯)

হযরত উসাইদের পিতা ছিলেন তাঁর গোত্রের অতি সম্মানিত ব্যক্তি। ইবন সা'দ বলেন ঃ "তাঁর পিতার পর ইসলাম ও জাহিলী উভয় যুগে তিনিও অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। গোত্রের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। সেই জাহিলী যুগে যখন আরবে লেখার প্রচলন খুব কম ছিল- তিনি আরবীতে লিখতেন। এই গুণগুলির সমন্বয় ঘটেছিল উসাইদের মধ্যে।" তাছাড়া তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ ও দৌড়বিদ। আর সে যুগে আরবে এই তিনটি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করা হত। (তাবাকাত-৩/৬০৪, আল আলাম-১/৩৩০, উসুদুল গাবা- ১/৯২)

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় এত উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁর চোখের সকল পর্দা দূর হয়ে যায়। আর তিলাওয়াতও করতে পারতেন সুমধুর কণ্ঠে। (উসুদুল গাবা-১/৯২) একদিন রাতে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। নিকটেই বাঁধা একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি লাফাতে থাকে। তিলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়াটিও থেমে যায়। আবার তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া নিকটেই শুয়ে ছিল। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এই কথা চিন্তা করে যে, এমনটি চলতে থাকলে ছেলেটি ঘোড়ার পায়ে পিষে যাবে। তৃতীয়বারের মাথায় তিনি বাইরে এসে দেখেন, আকাশে একটি ছায়ার মত আচ্ছাদন এবং মধ্যে যেন বাতির আলো জ্বলছে। তিলাওয়াত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আলোটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সকালে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, ফিরিশতারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তাহলে লোকেরা তাদেরকে দিনের আলোতে দেখতে পেত। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪৩, উসুদুল গাবা-১/৯৩, বুখারী শরীফ-২/৭৫০)

তিনি দিব্য চোখে 'সাকীনা' বা প্রশান্তির বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যার চলার সময় আগে আগে একটি 'নূর' বা জ্যোতি চলতো। বুখারী বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধকার রাতে আববাদ ইবন বিশর ও উসাইদ ইবন হুদাইর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বের হলেন। তাঁদের হাতের লাঠি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে তাদের চলার পথ আলোকিত করে তুলেছিল। তাঁরা যখন দু'জন দুই দিকে চলে গেলেন, জ্যোতিও তাঁদের সাথে ভাগ হয়ে গেল। (শাজারাতুজ জাহাব-১/৩১, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১১)

হযরত উসাইদ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে একটি দুস্থ আনসার পরিবারের কথা তুলে ধরলাম। তারা অত্যন্ত অভাবী এবং পরিবারের অধিকাংশ সদস্য মহিলা। আমার কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি এমন এক সময় এসেছ যখন আমার হাতে যা

কিছু ছিল সবই মানুষকে দেওয়া হয়ে গেছে। তুমি যখন শুনবে আমার হাতে আবার কিছু এসেছে এই পরিবারটির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।' কিছুদিনের মধ্যে খাইবার থেকে কিছু জিনিস আসলো। তিনি আনসারদেরকে বেশী করে দিলেন। বিশেষ করে সেই পরিবারটিকে দিলেন প্রচুর পরিমাণে। আমি বললাম, 'হে আল্লার নবী, আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।' রাসূল (সা) বললেন, 'ওহে আনসারগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তোমাদের সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তোমরা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যধারণকারী। আমার মৃত্যুর পর লোকেরা তোমাদের উপেক্ষা করে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেবে। আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা 'সবর' (ধৈর্য) অবলম্বন করবে। আমাদের সেই মিলন স্থল হবে 'হাউজ'।'

উসাইদ বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করলেন, আবু বকরের পর 'উমার (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। একবার তিনি মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু গনীমতের মাল বন্টন করলেন। আমার জন্য তিনি একটি জামা পাঠালেন। কিন্তু তা ছোট হয়ে গেল। আমি মসজিদে বসে আছি, এমন সময় এক কুরাইশ যুবককে দেখলাম ঠিক আমার জামার মত একটি লম্বা জামা সে পরে আছে। সেটা এত লম্বা যে, মাটি দিয়ে টেনে যাচ্ছে। তখন আমি আমার সংগের লোকটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) উপরোক্ত বাণী শুনিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যই বলেছেন। লোকটি দৌড়ে 'উমারের কাছে গেল এবং আমি যা বলেছি তাই তাঁকে গিয়ে বলল। 'উমার ছুটে আসলেন। আমি তখন নামাযে। 'উমার বললেন, উসাইদ নামায শেষ কর। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কী বলেছেন?

আমি যা দেখেছি এবং যা বলেছি, তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। সেই জামাটি আমি অমুকের জন্য পাঠিয়েছিলাম। আর সে তো একজন আনসারী, আকাবায় শপথ গ্রহণকারী এবং বদর ও উহুদের মুজাহিদ। তাঁর কাছ থেকেই এই কুরাইশ যুবক জামাটি খরীদ করেছে। আপনি কি মনে করেন আনসারদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই বাণী আমার যুগেই সত্যে পরিণত হবে? উসাইদ বললেন, আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার বিশ্বাস আপনার যুগে তা হতে পারবে না।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৪০২-৪০৩, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৩/৩৬-৩৯)

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, উসাইদ একজন উত্তম মানুষ। তিনি বলতেন, যদি আমি এই তিনটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় সর্বদা থাকতে পারতাম তাহলে নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী হতাম। এব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ থাকতো না। সেই অবস্থা তিনটি হলঃ (১) আমি নিজে যখন কুরআন পাঠ করি অথবা অন্যকে পাঠ করতে শুনি। (২) যখন রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষণ শুনি (৩) যখন কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করি। আমি যখন জানাযায় যোগদান করি, আমার নাফ্সকে প্রশ্ন করি ঃ আমি তাকে দিয়ে কী করিয়েছি এবং তার শেষ পরিণতি কী হবে? (আল-ইসাবা-১/৪৯, হায়াতুস সাহাবা-৩/৪১-৪২)

হাকেম আবু লায়লার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উসাইদ ছিলেন একজন নেককার, হাসি-খুশী মেজাজের ও রসিক প্রকৃতির মানুষ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে নানা রকম কথা বলে লোকদের হাসাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটু কৌতুক করে তাঁর কোমরে একটু আঘাত করেন। সাথে সাথে উসাইদ বলে উঠেন ঃ আপনি আমাকে ব্যথা

দিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও। উসাইদ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গায়ে জামা ছিল না; কিন্তু আপনার গায়ে তো জামা। রাসূল (সা) জামা খুলে ফেললেন, আর সাথে সাথে উসাইদ রাসূলুল্লাহকে (সা) জড়িয়ে ধরে তাঁর পাজরে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলেন। পরে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমি এই ইচ্ছা করেছিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩০-৩১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, মু'য়াজ ইবন জাবাল, উসাইদ ইবন হুদাইর ও মু'য়াজ ইবন 'আমর- এরা কতই না উত্তম মানুষ। (আল-ইসাবা-১/৯২) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) বলেছেন, নি'মার রাজুলু উসাইদ-উসাইদ কত ভালো মানুষ। (তাবাকাত-৩/৬০৩) হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ আনসারদের তিন ব্যক্তিকে কেউ মর্যাদার দিক দিয়ে নাগাল পায়নি। তাঁরা সবাই বনী আবদিল আশহালের লোক। তাঁরা হলেনঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, উসাইদ ইবন হুদাইর ও আব্বাদ ইবন বিশর। (আল-ইসাবা-১/৪৯) এই সব কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। তাঁর ওপর অন্য কাউকে তিনি প্রাধান্য দিতেন না। (উসুদুল গাবা-১/৯২)

'উবাদা ইবনুস সামিত (রা)

আবুল ওয়ালীদ 'উবাদা মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী সালীম শাখার সন্তান। হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আ'লাম-৪/৩০) পিতা সামিত ইবন কায়স এবং মাতা কুররাতুল আইন। মা ছিলেন 'উবাদা ইবন নাদলা ইবন মালিক ইবন আজলানের কন্যা। তিনি নিজের পিতার নামে ছেলের নাম রাখেন 'উবাদা' (উসুদুল গাবা-৩/১০৬) 'উবাদার ভাই আউস ইবন সামিতের স্ত্রী খুওয়াইলা বিনতু সা'লাবা। তিনি সেই মহিলা যাঁর শানে সূ'রা মুজাদিলার জিহারের আয়াত নাযিল হয়। (আনসাবুসলআশরাফ-১/২৫১)।

মদীনার পশ্চিম দিকে কুবা সংলগ্ন প্রস্তরময় অঞ্চলে ছিল বনী সালীমের বসতি। 'উতুম কাওয়াকিল' নামে সেখানে তাদের কয়েকটি কিল্লা ছিল। এরই ভিত্তিতে বলা চলে 'উবাদার বাড়ীটি মদীনার কেন্দ্রস্থলের বাইরে ছিল।

'উবাদা সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, এমন সময় মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন যাঁরা ইসলামের প্রথম আহবান কানে আসতেই সাড়া দেন। 'আকাবার প্রথম শপথে যেবার ছয়জন মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'য়াত করেন, তিনি তাঁদের একজন। অবশ্য ঐতিহাসিকদের অনেকে এই বাই'য়াতকে আকাবা নামে অভিহিত করেননি। তাঁদের মতে আকাবা মাত্র দু'টি। যাই হোক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আকাবায়ও শরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। অনেকের মতে তিনি দ্বিতীয় আকাবায় বারোজনের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় তথা শেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সা) মনোনীত বারো নাকীবের (দায়িত্বশীল) অন্যতম নাকীব। তিনি হন বনী কাওয়াকিল এর নাকীব। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬, বুলুগুল আমানী- শরহ মুসনাদে আহমাদ-২২/২৭৫, ফাতহুল বারী-৭/১৭২, তাবাকাত-৩/৫৪৬) উল্লেখ্য যে, বনী 'আমর ইবন আওফ ইবন খাযরাজ সেই প্রাচীন কাল থেকে 'কাওয়াকিল' নামে পরিচিত। 'কাওকালা' শব্দটির অর্থ এক বিশেষ ধরনের চলন।' এ নামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হল, যখন কোন ব্যক্তি তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতো তখন তারা লোকটির হাতে একটি তীর দিয়ে বলতো, যাও, এখন ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও। (ইবন হিশাম ১/৪৩১)

'উবাদার জীবনটি ছিল প্রাণরসে ভরপুর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে ফিরে এসেই সর্বপ্রথম মা-কে ইসলামে দীক্ষিত করেন। মদীনায় কা'ব ইবন আজরা নামে তাঁর ছিল এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তখনও সে অমুসলিম এবং তার বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। 'উবাদার সব সময়ের চিন্তা হল কিভাবে এ বাড়ীটি শিরক থেকে মুক্ত করা যায়। একদিন সুযোগমত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় কা'ব মুসলমান হয়ে যান।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় পৌঁছে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। আবু মারসাদ আল গানাবী হলেন তাঁর দ্বীনি ভাই। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬, আল ইসাবা-২/২৬৮, আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০) আবু মারসাদ ছিলেন

ইসলামের সূচনা লগ্নের একজন মুসলমান এবং হযরত হামযার (রা) হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ।

বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে 'উবাদা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬) বদর যুদ্ধের পর গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তখন সূরা আনফালের প্রথম থেকে কতগুলি আয়াত নাযিল হয় এবং এ ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবন হিশাম বলেন, সূরা আনফালের উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে 'উবাদাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন, আয়াতগুলি আমাদের বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন আমরা আনফাল এর ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করি এবং তা নিয়ে যখন আমাদের আখলাকের অবনতি ঘটে তখন আল্লাহ আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। তিনি আমাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৬)

এই বদর যুদ্ধের সময়ই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ইঙ্গিতে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কায়নুকা রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের সাথে উবাদার গোত্র বনী আউফের বহু আগে থেকেই মৈত্রী চুক্তি ছিল। তেমনিভাবে চুক্তি ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূলেরও। তাদের বিদ্রোহের কারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তখন উবাদা ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এবং তাদের সাথে চুক্তি বাতিলের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বললেনঃ আমি তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ও দায়মুক্তির ঘোষণা করছি। আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদেরকে আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূল তার পূর্ব অবস্থায় অটল থাকে। বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বহিষ্কারের এই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব উবাদার ওপর অর্পণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা মায়িদার ৫১নং আয়াত থেকে ৫৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়। আয়াতগুলিতে স্পষ্টতঃ উবাদার প্রশংসা ও মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইযের নিন্দা করা হয়েছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯) ষষ্ঠ হিজরীর বাইয়াতুর রিদওয়ানে তিনি শরিক ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৯) ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনী মুসতালিক বা মুরাইসী এর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁরই দলের একটি লোক ভুলক্রমে শত্রু ভেবে অন্য একজন মুসলিম মুজাহিদকে হত্যা করে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯০)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে শামে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয় তার বেশ ক'টিতে 'উবাদা অংশগ্রহণ করেন। হযরত ফারুকে আজমের খিলাফতকালে 'আমর ইবন 'আস মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম না হয়ে মদীনায় খলীফার নিকট অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পাঠান। খলীফা উমার (রা) চার হাজার মতান্তরে দশহাজার সৈন্যের একটি অতিরিক্ত বাহিনী পাঠান। 'উবাদা ছিলেন সেই বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্যের কমান্ডিং অফিসার। (আল-ইসাবা-২/২৬৮) খলীফা 'আমর ইবনুল 'আসকে একটি চিঠিতে আরও লেখেন এই অফিসারদের প্রত্যেকেই একহাজার সৈন্যের সমান। এই অতিরিক্ত বাহিনী মিসর পৌঁছার পর 'আমর ইবনুল আস সকল সৈন্য একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ করে তিনি উবাদাকে ডেকে বলেন, আপনার নিযাটি আমার হাতে দিন। তিনি নিযাটি নিয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে নিযার মাথায় বাঁধেন। তারপর সেটি উবাদার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন, এই হচ্ছে সেনাপতির আলাম বা পতাকা। আজ আপনিই সেনাপতি। আল্লাহর ইচ্ছায়

প্রথম আক্রমণেই শহরের পতন ঘটে।

হযরত 'উবাদা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফতের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১· সাদাকা বিষয়ক অফিসার ২· ফিলিস্তীনের কাজী ৩· হিমসের আমীর।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে 'আমিলে সাদাকা' বা যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। উবাদাকেও কোন একটি অঞ্চলে নিয়োগ দান করেন। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উপদেশ দেন ঃ আল্লাহকে ভয় করবে। এমন যেন না হয়, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জন্তুও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬)

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে এক সময় তাঁকে ফিলিস্তীনের কাজী নিয়োগ করা হয়। সেই সময় উক্ত অঞ্চলটি ছিল হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইমারাতের অধীনে। এক সময় কোন একটি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর প্রতি কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। তিনিও প্রত্যুত্তরে মুয়াবিয়াকে বলেন, আগামীতে আপনি যেখানে থাকবেন আমি সেখানে থাকবো না। তিনি মদীনায় চলে আসেন, খলীফা উমার (রা) এভাবে তাঁর চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বলেন। সবকিছু শোনার পর 'উমার (রা) বললেন ঃ আপনার স্থানে আবার আপনি ফিরে যান। এ যমীন আপনার মত লোকদের জন্য ঠিক আছে। আপনিও আপনার মত লোকেরা যেখানে নেই আল্লাহ সেই স্থানের মঙ্গল করুন। অতঃপর তিনি আমীর মু'য়াবিয়াকে (রা) একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন ঃ আমি উবাদাকে তোমার কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন করে দিলাম। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬) ফিলিস্তীনের বিচার বিভাগের এই পদটি সর্বপ্রথম 'উবাদার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ উবাদা ফিলিস্তীনের প্রথম কাজী। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬)

হযরত আবু 'উবায়দাহ (রা) যখন শামের আমীর তখন তিনি 'উবাদা ইবনুস সামিতকে হিমসে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন। এই হিমসে অবস্থানকালে তিনি লাজিকিয়্যা জয় করেন। এই অভিযানে তিনি এক নতুন সামরিক টেকনিক প্রয়োগ করেন। তিনি এমন সব বড় বড় গর্ত খনন করেন যে, তার মধ্যে একজন অশ্বারোহী তার অশ্বসহ অতি সহজে লুকিয়ে থাকতে পারতো। (ফুতুহুল বুলদান–১৩৯)

হযরত 'উবাদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শামে (বৃহত্তর সিরিয়া) বসবাসরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিজরী ৩৪/৬৫৪ সনে রামলা মতান্তরে বায়তুল মাকদাসে ৭২ (বাহাত্তর) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইবন 'আসাকির 'উবাদার জীবনীতে মুয়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে ধারণা হয় তিনি হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালেও জীবিত ছিলেন। এ কারণে অনেকে মনে করেছেন তিনি হিজরী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইবনুল আসীর বলেন, পূর্বের মতটিই সঠিক। (তাবাকাত–৩/৫৪৬, আল ইসাবা–২/২৬৯, উসুদুল গাবা–৩/১০৭, আনসাবুল আশরাফ–১/২৫১)

তিনি মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে শেষ বারের মত একটু দেখার জন্য অনেকে আসা যাওয়া করছে। হযরত শাদ্দাদ ইবন আউসও এসেছেন কিছু লোক সংগে করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন আছেন? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো আছি।

মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্তে ছেলে এসে কিছু অসীয়াত করার অনুরোধ করলো। বললেন, আমাকে একটু উঠিয়ে বসাও। তারপর বললেন ঃ বেটা, তাকদীরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, অন্যথায় ঈমানে কোন কল্যাণ নেই। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩১৭, বুলুগুল আমানী ঃ শরহ মুসনাদে আহমাদ–২২/২৭৬)

এই সময়ে তাঁর ছাত্র 'সানাবিহী' আসলেন। প্রিয় শিক্ষকের এই অন্তিম অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করলে। উবাদা তাকে কাঁদতে নিষেধ করে বললেন ঃ সর্ব অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট। তুমি কাঁদছো কেন? যদি সাক্ষ্য দিতে বল, দিব। যদি কারও জন্য শুপারিশ করি, তোমার জন্য করবো। তারপর বললেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) যত হাদীস সংরক্ষিত ছিল সবই তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। তবে একটি হাদীস অবশিষ্ট ছিল তা এখন বর্ণনা করছি। হাদীসটি কারও কাছে এ পর্যন্ত বর্ণনা করিনি। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। (বুলুগুল আমানী–২২/২৭৬) হাদীসটি বর্ণনার পর পরই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন হযরত উসমানের খিলাফতকাল চলছে।

তাঁকে কোথায় দাফন করা হয় সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ লিখেছেন, তাঁকে রামলায় দাফন করা হয়। অন্য একটি বর্ণনা মতে বায়তুল মাকদাসের পবিত্র মাটিই হচ্ছে তাঁর শেষ শয্যা এবং সেখানে তাঁর কবরটি এখনও প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী তাঁর দাফন স্থল ফিলিস্তিন বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ সে সময় ফিলিস্তীন ছিল একটি প্রদেশ এবং উল্লেখিত স্থল দু'টি ছিল তার ভিন্ন দু'টি জেলা। আল–আ'লাম' গ্রন্থকার যিরিক্‌লী বলেন, তিনি শামের কিবরিসে মৃত্যুবরণ করেন। অদ্যাবধি সেখানে তাঁর কবর মানুষের যিয়ারতগাহ হিসাবে বিদ্যমান। খলীফা 'উমারের (রা) পক্ষ থেকে তিনি সেখানকার ওয়ালী ছিলেন। (আ'লাম–৪/৩০)

হযরত 'উবাদার মরণ সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তিনি চাকর–বাকর, পাড়া–প্রতিবেশী, আত্মীয়–স্বজন সকলকে হাজির করার নির্দেশ দেন। সবাই উপস্থিত হলে বলেন ঃ আজকের এ দিনটিই দুনিয়ায় আমার শেষ দিন, আর আগত রাতটি আমার আখিরাতের প্রথম রাত। আমার হাত বা জিহবা দিয়ে যদি তোমাদেরকে কোন রকম কষ্ট দিয়ে থাকি তোমরা এখনই তার 'কিসাস' বা প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমি নিজেকে তোমাদের সামনে পেশ করছি। তারা বললো, আপনি আমাদের পিতা, আমাদের শিক্ষক। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি কখনও কোন খাদেমকে খারাপ কথা বলেননি। তারপর তিনি তাদের অসীয়াত করেন ঃ আমি মারা গেলে কেউ কাঁদবে না। তোমরা ভালো করে অজু করে মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে। নামায শেষে উবাদা ও তোমাদের নিজেদের জন্য দু'য়া করবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ছবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর (সূরা বাকারাহ–৪৫, ১৫৩)। আমাকে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি কবর দেবে। (হায়াতুস সাহাবা– ৩/৪৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসারী ব্যক্তি সমগ্র কুরআন হিফ্‌জ (মুখস্থ) করেন 'উবাদা তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সম্মানিত সাহাবীদের একজন, ইলমুল কিরয়াতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় মদীনায় আসহাবে সুফ্‌ফার জন্য ইসলামের প্রথম যে মাদ্রাসাতুল কিরায়াহ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার দায়িত্বে। অতি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আসহাবে সুফ্‌ফার সাহাবীরা তাঁর কাছে

শিক্ষা লাভ করেন। এই মাদ্রাসায় কুরআনের তালীমের সাথে সাথে লেখাও শিখানো হত। বহু লোক এই মাদ্রাসা থেকে কিরায়াত ও লেখার তা'লীম নিয়ে বের হন। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৫)

এই মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত কোন কোন ছাত্রের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করতেন। এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে থাকতেন এবং রাতের খাবার তাঁরই সাথে খেতেন। লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় একটি উৎকৃষ্ট ধনুক তাঁকে দান করেন। তিনি একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে ধনুকটি নিতে নিষেধ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২৪, হায়াতুস সাহাবা-৩/২৩০) হযরত উমার তাঁকে এক সময় শামের মুসলমানদের বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পাঠান।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি বিশেষ টেকনিক প্রচলন করেন। তাঁর সমসাময়িক যে সকল সাহাবী হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁরা বলতেন ঃ আমি একথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি। অনেকে কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করতেন, যা পরবর্তীকালে হাদীস বর্ণনার একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। উবাদাও এমন কিছু শব্দ প্রচলন করেন। যেমন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সামনাসামনি বলেন। আমি একথা বলছিনে যে, অমুক অমুক আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

এমনিভাবে এক সমাবেশে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে একটি হাদীস বর্ণনা করলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা) হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেন। উবাদা তখন বলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে আমি একথা শুনেছি।'

তিনি সর্ব অবস্থায় সকল স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। ওয়াজমাহফিল, জ্ঞান চর্চার বৈঠক, এমনকি কখনও গীর্জায় গেলে সেখানেও রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র বাণী ঈসায়ীদের কানে পৌছিয়েদিতেন।

হযরত 'উবাদা থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১৮১ (একশো একাশি)। তাঁর মধ্যে ছয়টি মুত্তাফাক আলাইহি। (আল-আ'লাম ৪/৩০) অনেক বড় বড় সাহাবী এবং তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, আবু উমামা, ছালামা ইবন মাহবাক, মাহমূদ ইবন রাবী মিকদাম ইবন মা'দিকারব, রাফায়া ইবন রাফে, আউস ইবন আবদিল্লাহ আস-সাকাফী, শুরাহবীল ইবন হাসানা প্রমুখ এবং তাবে'ঈদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন উসায়লা সানালজী, হিত্তান ইবন আবদিল্লাহ রাক্কাশী, আবুল আশ'য়াস সাগানী, জুবাইর ইবন নাদীর, জুনাদাহ্ ইবন আবী উমাইয়্যা, আসওয়াদ ইবন সা'লাবা, আতা ইবন আবী ইয়াসার, আবু মুসলিম খাওলানী, আবু ইদরীস খাওলানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬) ফিকাহ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর এ পান্ডিত্যের সম্মান করতেন। খালিদ ইবন মা'দান বলেন ঃ শামে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে উবাদা ও শাদ্দাদ ইবন আউস অপেক্ষা অধিকতর বড় কোন ফকীহ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬২)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) একটি ভাষণে আমওয়াসের প্লেগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার উবাদার সাথে আলোচনা হয়েছে। তবে তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। তোমরা তাঁর থেকে ফায়দা হাসিল কর। কারণ, তিনি আমার চেয়েও বড় ফকীহ।

জুনাদাহ যান উবাদার সাথে সাক্ষাৎ করতে, তারপর তিনি বর্ণনা করেন, উবাদা আল্লাহর দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করেছেন। (আল-ইসাবা-২/২৬৮, সীয়ারে আনসার ২/৫৬)

শাসকের মুখোমুখী হক কথা বলা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অতি উৎসাহের সাথে এ দায়িত্ব পালন করতেন। শামে গিয়ে দেখেন, সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি এমন এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন যে, গোটা সমাবেশে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই সমাবেশে হযরত মুয়াবিয়াও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) উবাদাকে একথা বলেননি। তখন 'উবাদার ঈমানী জোশ তীব্র আকার ধারণ করেন। তিনি বলেন, মুয়াবিয়ার সাথে থাকার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) একথা আমাকে বলেছিলেন। (উসুদুল গাবা-৩/১০৭, (মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৯)

উপরোক্ত ঘটনাটি ছিল হযরত উমারের (রা) খিলাফত কালের। তবে খলীফা উসমানের (রা) যুগে আমীর মুয়াবিয়া (রা) খলীফার দরবারে লেখেন ঃ উবাদা গোটা শামের অবস্থা বিপর্যস্ত করে তুলেছে। হয় আপনি তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান, নয়তো আমিই শাম ছেড়ে চলে আসবো। জবাবে আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। খলীফার নির্দেশের পর উবাদা শাম থেকে সোজা মদীনায় চলে যান। তিনি যখন খলীফার নিকট পৌঁছেন তখন তিনি একজন মুহাজির ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলেন। খলীফার ঘরের বাইরে তখন বহু লোক সমবেত ছিল। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি এক কোণায় চুপ করে বসে পড়েন। খলীফা দৃষ্টি উঠাতেই তাঁকে দেখতে পান। তিনি প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার? সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার পরে শাসকরা ভালোকে মন্দে এবং মন্দকে ভালোতে পরিণত করবে। কিন্তু অন্যায় কাজে আনুগত্য সিদ্ধ নয়। তোমরা কখনও পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৯) তাঁর কথার মাঝখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কিছু বলার চেষ্টা করেন। উবাদা গর্জে উঠে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে আমরা যখন বাই'য়াত করি তোমরা তখন ছিলে না। (সুতরাং অযথা নাক গলাবে না) আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এই শর্তাবলীর ওপর বাই'য়াত করি যে, সর্ব অবস্থায় আমরা তাঁর কথা মানবো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আর্থিক সাহায্য দান করবো। মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেব এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবো। সত্যকথা বলতে কারও ভয় করবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে আসলে তাঁকে সাহায্য করবো। আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মত তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবো। আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করবো না। আমাদেরকে জান্নাতের আকারে এ সকল কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। পরিপূর্ণ রূপে এ সব অঙ্গীকার পালন করা আমাদের কর্তব্য। আর কেউ পালন না করলে সেজন্য সেই জিম্মাদার। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৩, মুসনাদে আহমাদ-৫/৩২৫, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

হযরত 'উবাদা আমর বিল মা'রূফের দায়িত্ব সর্বক্ষণ, এমনকি পথ চলতে চলতেও পালন করতেন। একবার কোথাও যাচ্ছেন। দেখলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাদ যারকী পাখী শিকার করছেন। তাঁর হাত থেকে পাখী ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দেন। তাঁকে বলেন এ স্থানটি হারামের অন্তর্ভুক্ত, এখানে শিকার নিষিদ্ধ। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি উবাদার ছিল তীব্র ভালোবাসা। প্রথম দফা সাক্ষাতের

পর আরও দু'বার মক্কায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বাইয়াত করে আসেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আসার পর এমন কোন ঘটনা বা যুদ্ধ পাওয়া যায়না যাতে যোগদানের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। এ কারণে তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। একবার তিনি রোগাক্রান্ত হলে রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে আসেন। আনসারদের কিছু লোকও সংগে ছিল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান শহীদ কে? সবাই চুপ করে রইল। উবাদা স্ত্রীকে বলেন, আমাকে একটু বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দাও। বসার পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশ্নের জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর হিজরাত করে, অতঃপর যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূল (সা) বললেন, না। এমনটি হলে তো শহীদদের সংখ্যা খুবই কম হবে। নিহত হওয়া, কলেরা বা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া এবং মেয়েদের সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুবরণ– এ সবই শাহাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩১৭) তিনি যতদিন অসুস্থ ছিলেন রাসূল (সাঃ সকাল–সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যেতেন। এ অবস্থায় তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়ে বলেন, এটা জিবরাঈল আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩২৩)

হযরত উবাদার স্ত্রী সম্পর্কে হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে একটি বর্ণনা দেখা যায়। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিলহানের মেয়ের কাছে গিয়ে কিছুতে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর হেসে উঠলেন। সে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় সাগর পাড়ি দেবে। সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন আমিও যেন তাদেরই একজন হতে পারি। রাসূল (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাকে তাদেরই একজন করে দাও। তারপর আবার তিনি হেসে উঠলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে একই জবাব দিলেন। এবারও সে পূর্বের মত দু'আর আবেদন করলো। এবার তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দিকের লোক হবে, তবে শেষ দিকের নও। আনাস বলেন, এই মহিলাকে উবাদা বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের স্ত্রী কারাজার সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেন। তারপর বাহনের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৫৯২)

উসমান ইবন সাওদা বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিতকে দেখলাম, ওয়াদী জাহান্নামের মসজিদের দেওয়ালে বুক ঠেকিয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, আবুল ওয়ালীদ, আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, এটা সেই স্থান, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) জাহান্নাম দেখতে পেয়েছেন বলে আমাদেরকে বলেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৬)

হযরত সুফইয়ান ইবন উয়াইনা অতি অল্প কথায় হযরত উবাদার (রা) পরিচয় ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

উবাদা আকাবী, উহুদী, বদরী, শাজারী, উপরন্তু তিনি নাকীব।" (বুলূগুল আমানীঃ শরহ মুসনাদে আহমাদ–২২/২৭৫) হ্যাঁ, প্রকৃতই তিনি ছিলেন, বাইয়াতুল আকাবার একজন সদস্য, বদর–উহুদের যোদ্ধা। বায়য়াতুশ শাজারা তথা বাইয়াতুর রিদওয়ান– যা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় অনুষ্ঠিত হয়– এরও অন্যতম সদস্য। উপরন্তু তিনি ছিলেন মদীনার দ্বাদশ নাকীবের একজন।

জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা)

নাম জাবির, কুনিয়াত বা ডাকনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ আবু 'আবদিল্লাহ, আবু 'আবদির রহমান, ও আবু মুহাম্মাদ। ইবনুল আসীর প্রথমটি অধিকতর সঠিক বলে মনে করেছেন। (উসুদুল গাবা ১/২৫৭, আল-ইসাবা-১/২১৩, তাহজীবুল আসমা ওয়া আল-লুগাত-১/১৪৪) পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর এবং মাতা নাসীবা বিনতু উকবা। তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ হারাম ইবন কা'ব-এর মাধ্যমে পিতা-মাতা উভয়ের বংশ একত্রে মিলিত হয়েছে। জাবিরের পিতৃবংশের উর্ধ্বতন পুরুষ সালামা-র বংশধরগণ মদীনার হাররা ও মসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে তাঁর নিজ গোত্র বনু হারামের বসতি ছিল কবরস্তান ও ছোট্ট একটি মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন আমর ছিলেন শেষ 'আকাবায় মনোনীত অন্যতম 'নাকীব'। (তাবাকাত-৩/৬২০, ৬৬১, উসুদুল গাবা-১/২৫৬)

জাবিরের দাদা 'আমর ছিলেন তাঁর খান্দানের রয়িস বা নেতা। 'আয়নুল আরযাক' নামক যে কুয়োটি মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে সংস্কার করেন, সেটা ছিল তাঁরই মালিকানায়। বনু সালামার কয়েকটি দুর্গ ছাড়াও জাবির ইবন 'আতীকের নিকটবর্তী আরও কয়েকটি দুর্গ তারই অধীনে ছিল। 'আমরের মৃত্যুর পর এ সকল সম্পদের মালিক হন তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ। এই 'আবদুল্লাহর পুত্র জাবির চৌত্রিশ (৩৪) 'আমুল ফীল (হাতীর বছর) মুতাবিক ৬১১ মতান্তরে ৬০৭ খৃষ্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-২/৯২, সীয়ারে আনসার-১/২৯৪)

সর্বশেষ 'আকাবার বাই'য়াতে পিতা 'আবদুল্লাহর সাথে জাবিরও অংশগ্রহণ করেন। হতে পারে, তিনি এই বাই'য়াতের সময় অথবা এর পূর্বেই মদীনায় মুসয়াব ইবন 'উমাইরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁর পিতাকে বনু সালামা-র নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন। জাবির বলেন, আমি ছিলাম এই 'আকাবার কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ইবন সা'দের বর্ণনামতে এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ অথবা ঊনিশ বছর। ইবনুল আসীর বলেন, জাবির তখন একজন বালকমাত্র। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮, ২৪৯,২৫২, তাবাকাত-৩/৫৬১, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়া আল-আ'লাম-১/১৮১)

জাবির বদর ও উহুদ যুদ্ধ ছাড়া আর সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগদান করেন। বদর ও উহুদে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। জাবির বলতেন, আমি বদরের দিন আমার পিতার জন্য অঞ্জলি ভরে পানি নিয়েছিলাম। মুহাম্মাদ ইবন সা'দ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন উমারকে এই বর্ণনাটি শুনালাম। তিনি বললেন, এটা ইরাকীদের একটি ভিত্তিহীন ধারণা

মাত্র। তিনি বদরে জাবিরের অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করলেন। তাছাড়া জাবির নিজেই বলতেন, আমি বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করিনি। আমার পিতা আমাকে বিরত রেখেছেন। এই দুইটি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে কক্ষণও আমি পেছনে থাকিনি। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৮৬, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, তাহজীবুল আসমা ওয়া আল-লুগাত-১/১৪৩, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৪৩)

জাবির উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেননি। তিনি কেন যোগদান করেননি তাঁর কারণ এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। ইবন হিশাম বললেন ঃ 'হামরা-উল-আসাদ' মদীনা থেকে ৮/৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। কুরাইশরা উহুদ থেকে সরে গিয়ে সেখানে সমবেত হয়। এটা ছিল হিজরী ৩ সালের আট অথবা নয় শাওয়ালের ঘটনা। রাসূল (সা) এ খবর পেয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ উহুদে যারা অংশগ্রহণ করেছিলে তারা ছাড়া আর সবাই শত্রুদের খোঁজে বের হয়ে পড়। লোকেরা, এমনকি উহুদের আহতরাও বের হয়ে পড়লো। সংখ্যায় তারা অনেক হয়ে গেল। জাবির রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে 'আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! গতকাল আমি জিহাদে যোগদান থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার পিতা আমাকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি আমাকে আমার সাতটি বোনের তদারকিতে রেখে যান। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'বেটা, কোন পুরুষ লোক তাদের কাছে থাকবে না, এমন অবস্থায় তাদের রেখে যাওয়া তোমার ও আমার উচিত হবে না। আর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নিজের ওপর তোমাকে অগ্রাধিকার দিতে পারিনে।' জাবির বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) আমাকে যুদ্ধে বের হওয়ার অনুমতি দান করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৮, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২০৭) বদর ও উহুদ ছাড়া তিনি কতগুলি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। কোন বর্ণনায় উনিশটি, কোন বর্ণনায় আঠারোটি, আবার কোন বর্ণনায় সতেরোটি যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন বলে জানা যায়। (আল-আ'লাম-২/৯২, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, আল-ইসাবা-১/৩১৩, তাহজীবুল আসমা-১/১৪৩)

জাবিরের পিতা 'আবদুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে যোগ দেন এবং শহীদ হন। জাবির বলেন, উহুদ যুদ্ধের আগের রাতে আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম দিকে শহীদ হবে, আমি নিজেকে তাঁদের কাতারেই দেখতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে একমাত্র তুমি ছাড়া অধিকতর প্রিয় আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছিনে। আমার কিছু দেনা আছে, তুমি তা পরিশোধ করে দেবে। আর তোমার বোনদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। জাবির বলেন, সকাল হলো, আমার পিতা হলেন প্রথম শহীদ। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৩) সুফইয়ান ইবন 'আবদি শাম্স আস-সুলামী নামক এক কাফির জাবিরের পিতা আবদুল্লাহকে হত্যা করে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩)

কাফিররা জাবিরের পিতা 'আবদুল্লাহকে হত্যা করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করে ফেলে। এই কারণে দেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ একটি কাপড়ে সংগ্রহ করা হয়। জাবির লাশ দেখতে চাইলে লোকেরা তাঁকে নিষেধ করে; কিন্তু রাসূল (সা) অনুমতি দান করেন। তাঁর ফুফু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাইয়ের এ দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, কে? লোকেরা বললো, 'আবদুল্লাহর বোন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কাঁদ বা

না কাঁদ, যতক্ষণ লাশ না উঠাবে ফিরিশতারা ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকবে। (মুসলিম–২/৩৪৬, বুখারী–২/৫৮৪, তাবাকাত–৩/৫৬১)

জাবিরের বোনেরা তাদের পিতার লাশ উহুদ থেকে নেওয়ার জন্য একটি উট পাঠায়। তারা ইচ্ছা করেছিল, বনু সালামার গোরস্তানে তাদের পিতাকে দাফন করবে। জাবির পিতার লাশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।– এ কথা রাসূল (সা) জানতে পেয়ে বললেন ঃ তাঁর অন্য সব শহীদ ভাইকে যেখানে দাফন করা হয়েছে তাকেও সেখানে দাফন করা হবে। এভাবে উহুদের অন্যান্য শহীদের সাথে তাঁকেও উহুদের প্রান্তরে দাফন করা হয়। (তাবাকাত–৩/৫৬২)

একটি বর্ণনায় এসেছে, জাবির বললেন ঃ আমার পিতা উহুদে শহীদ হওয়ার খবর পেয়ে আমি আসলাম। লাশটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি কাপড় সরিয়ে তাঁর মুখে চুমু দিতে লাগলাম। রাসূল (সা) দেখেছিলেন কিন্তু নিষেধ করেননি। (তাবাকাত–৩/৫৬১) তিনি আরও বলেন ঃ আমি কাঁদছিলাম। রাসূল (সা) আমাকে বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? আয়িশা তোমার মা ও আমি বাবা হই, তাতে কি তুমি খুশী নও? এ কথা বলে তিনি আমার মাথায় হাত ঘষে দেন। আজ মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেলেও যেখানে রাসূলের (সা) হাতের স্পর্শ লেগেছিল সেখানে কালো আছে। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৩/৩৮৬)

জাবির তাঁর পিতার লাশ দাফনের ব্যাপারে বললেন ঃ আমি অন্য একজন শহীদের সাথে এক কবরে তাঁকে দাফন করলাম। কিন্তু তাতে আমার মন তুষ্ট হলো না। ছয় মাস পর কবর খুড়ে লাশটি বের করলাম। দেখা গেল একমাত্র কান ছাড়া মাটি লাশ মোটেই স্পর্শ করেনি। লাশটি এমন অবিকৃত অবস্থায় আছে যেন আজই দাফন করা হয়েছে। (তাবাকাত–৩/৫৬২, তাহজীবুল আসমা–১/১৪৩, হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৯২)

জাবির বললেন ঃ এর চল্লিশ বছর পর মু'য়াবিয়া যখন উহুদে কূপ খনন করায় তখন সেখানে সমাহিত কতিপয় শহীদের সাথে আমার পিতার লাশটিও উঠে আসে এবং তা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৯৩) একটি বর্ণনায় এসেছে, উহুদে জাবিরের পিতা শহীদ হলে আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আবদুল্লাহ, তুমি কি চাও?' তিনি বললেন, আমি দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাই এবং আবার শহীদ হতে চাই। (তাহজীবুল আসমা–১/১৪৩)

জাবিরের পিতা ছিলেন একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ। তাঁর মৃত্যুর পর জাবির এই সব ঋণ নিয়ে বিপাকে পড়লেন। কিভাবে তা পরিশোধ করবেন, এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। সম্পদের মধ্যে মাত্র দুইটি বাগিচা। তার সব ফলও ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং পাওনাদার ইহুদীদের ডেকে কিছু মওকুফ করিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। রাসূল (সা) পাওনাদারদের ডেকে জাবিরের বক্তব্য পেশ করলেন। যেহেতু তারা ছিল ইহুদী, তাই তারা রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিলনা। তিনি তাদেরকে অর্ধেক করে দুই বছরে দুইটি কিস্তিতে গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। তারা তাতেও রাজী হলো না। তখন তিনি জাবিরকে বললেন, আমি অমুক দিন তোমার বাড়ীতে যাব। তিনি নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হলেন এবং অজু করে দুই রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর তাবুতে এসে স্থির হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবু বকর ও উমার উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) খেজুর স্তূপ করে ভাগ করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি একটি স্তূপের ওপর উঠে বসলেন। জাবির

ভাগ শুরু করলেন, আর রাসূল (সা) বসলেন দু'আ করতে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঋণ পরিশোধের পরেও অনেক অবশিষ্ট থেকে গেল। জাবির খুব খুশী হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন, ঋণ পরিশোধ হয়েছে এবং এত পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। রাসূল (সা) আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। আবু বকর ও উমার (রা) দুইজনই খুব খুশী হলেন। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী–২২/২০৮, ২০৯, তাবাকাত–৩/৫৬৪, হায়াতুস সাহাবা–৩/৬৩১)

হিজরী পঞ্চম সনে 'জাতুর রুকা' যুদ্ধে জাবির যোগ দেন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন। চলতে চলতে উটটি হঠাৎ থেমে যায়। জাবির তাকে উঠিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পেছন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ জাবির কী হয়েছে? বললেন, উট চলছে না। রাসূল (সা) নিকটে এসে উটের গায়ে চাবুকের একটি ঘা মারেন। সাথে সাথে উটটি দ্রুত চলতে থাকে এবং সবার আগে চলে যায়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, এই সফরে এক অন্ধকার রাতে জাবিরের উটটি হারিয়ে যায়। জাবির রাসূলাল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে উটের খোঁজে যাচ্ছেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? বললেন, উট হারিয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই যে, এই দিকে তোমার উট, যাও নিয়ে এস। জাবির দৌড়ালেন সেই দিকে; কিন্তু বহু খোঁজাখুজির পরও না পেয়ে ফিরে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) পেলাম না। রাসূল (সা) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার একই কথা বললেন এবং জাবিরও প্রত্যেক বারই ফিরে আসলেন। অবশেষে রাসূল (সা) জাবিরকে হাত ধরে উটের কাছে নিয়ে গেলেন এবং উটটি ধরে জাবিরকে বললেন, এই ধর তোমার উট। ইত্যবসরে কাফিলার লোকেরা অনেক দূর চলে গিয়েছিল। জাবির তাঁর উটের ওপর সাওয়ার হতেই উটটি এত দ্রুত গতিতে চললো যে, সবার আগে পৌঁছে গেল। রাসূল (সা) জাবিরের নিকট থেকে উটটি খরীদ করার প্রস্তাব করেন। জাবির মূল্য ছাড়াই বিক্রি করতে রাজী হন। রাসূল (সা) বললেন, না তা হবে না, মূল্য তোমাকে নিতে হবে এবং মদীনা পর্যন্ত এর ওপর সাওয়ার হয়ে যাবে। এ ভাবে পথে উট কেনা বেচা হয়ে গেল। মদীনা পৌঁছে জাবির উট নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দরযায় হাজির হলেন। রাসূল (সা) উটটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন আর বললেনঃ খুব সুন্দর। তারপর বিলালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, এক উকিয়া সোনা ওজন করে দাও এবং একটু বেশী দাও। অতঃপর রাসূল (সা) জাবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উটের দাম পেয়েছেন কিনা। জাবির বললেন, হাঁ, পেয়েছি। তখন রাসূল (সা) জাবিরের হাতে উটটি তুলে দিয়ে বললেনঃ এই উট ও মূল্য দুইটিই নিয়ে যাও, সবই তোমার। জাবির খুব খুশী মনে উটসহ বাড়ী ফেরেন এবং ফুফুকে বলেন, দেখুন রাসূল (সা) আমাকে এক উকিয়া সোনা এবং উটটিও দান করেছেন। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী–২২/২০৯,২১০)

উপরোক্ত উটের ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন রকম বর্ণিত হয়েছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে উট কেনা বেচার ঘটনাটি জাবির থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা) বললেন, "জাবির এই উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে?

–হাঁ,করবো।

–কত দামে?

–এক দিরহামে।

–এক দিরহামে একটি উট কেনা যায়?

–তাহলে দুই দিরহামে।

–না, আমি চল্লিশ দিরহামে তোমার উটটি কিনলাম এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাকে আমি ওর পিঠে চড়াবো। তারপর পূর্বে উল্লেখিতভাবে মদীনায় পৌছে উট কেনা–বেচার বাকী কাজ সম্পন্ন হয়। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৩/৩৮৭)।

মূল্যের অতিরিক্ত যে অর্থ জাবিরকে দেওয়া হয় তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) দান। এ কারণে জাবির সেই অর্থ ভিন্ন একটি থলিতে ভরে ঘরে হিফাজতে রেখে দেন। হাররা–র ঘটনার দিন শামবাসীরা তাঁর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে অন্যান্য জিনিসের সাথে সেই থলিটিও লুট করে নিয়ে যায়। (মুসনাদ–৩/৩০৮, সীরাতু ইবন হিশাম–২/২০৬, ২০৭)

উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার শাসন আমলে একবার মদীনায় ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ হয়। এই চরম সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের নায়ক ছিল মুসলিম ইবন 'উকবা আল–মুররী, মদীনাবাসীরা তাকে বলতো মুসরিফ ইবন 'উকবা। এর কারণ হলো, মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়াকে খলীফা বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর নিয়োগকৃত গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর স্থলে 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালাকে নিজেদের আমীর মনোনীত করে। অবশ্য এ কাজের সাথে সে সময়ে জীবিত কোন বিশিষ্ট সাহাবী একমত ছিলেন না।

হযরত জাবির তখন অন্ধ। তিনি মদীনার রাস্তাঘাটে বেড়াতেন, তাঁরই সামনে বাড়ী–ঘর লুট হতো ও সন্ত্রাসী কাজ চলতো। তিনি মৃতদেহের সাথে হোঁচট খেতেন, আর বলতেন যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) ভয় দেখাচ্ছে, তাদের জন্য ধ্বংস। মূলতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করতেন ঃ 'যে মদীনাকে ভয় দেখাবে প্রকৃতপক্ষে সে আমার দুই পার্শ্বদেশের মধ্যে যা আছে তাকেই ভয় দেখাবে।' সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যার জন্য ধরে নিয়ে যায়। তবে মারওয়ান নিজে তাঁকে নিরাপত্তা দান করে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২০৭, টীকা নং ৫)

জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দানকৃত উটটি আমার নিকট খলীফা 'উমারের খিলাফতকাল পর্যন্ত ছিল। তিনি সেটা আমার নিকট থেকে নিয়ে সাদাকার উটের সাথে দিয়ে তাকে ভালো খাবার ও সুস্বাদু পানি দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। (তারীখু ইবন আসাকির–৩/৩৮৭)

'জাতুর রুকা' যুদ্ধের পর হিজরী পঞ্চম সনেই খন্দকের যুদ্ধ হয়। জাবির বলেন, আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এক সময় একটা কঠিন পাথর আমাদের সামনে পড়লো যা কোন ভাবেই আমরা কাটতে পারছিলাম না। বিষয়টি রাসূলল্লাহ (সা)কে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, আমি নেমে দেখছি। রাসূল (সা) একটি বড় কুড়াল নিয়ে আঘাত করলে পাথরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। (হায়াতুস সাহাবা–১/৩২০, ২/১৯১)

রাসূল (সা) কুড়াল নিয়ে পাথর সরানোর জন্য যখন আসেন, জাবির তখন দেখেন ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। (বুখারী–২/৫৮৮, ৭৮৯) এ দৃশ্য দেখে তিনি

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে যান এবং স্ত্রীকে বলেন, আজ আমি এমন এক দৃশ্য দেখেছি, যাতে ধৈর্য ধারণ করা যায় না। ঘরে কিছু থাকলে রান্না কর। তিনি ছাগলের একটি বাচ্চা জবেহ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার বাড়ীতে একটু আসুন এবং যা কিছু আছে তাই একটু খেয়ে নিন। রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে তিনদিন যাবত কোন খাবার ছিল না। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন। শুধু কবুল নয় তিনি খন্দকে কর্মরত সকলের মাঝে সাধারণ ঘোষণাও দিয়ে দিলেন যে, জাবির তোমাদের সকলকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। জাবির তো শুধু রাসূল (সা) ও সেই সাথে অতিরিক্ত দুই তিন জনের খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এই ঘোষণা শুনে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন; কিন্তু আদব ও ভদ্রতার খাতিরে চুপ থাকলেন। রাসূল (সা) খন্দকবাসীদের সংগে করে জাবিরের বাড়ীতে পৌঁছালেন এবং সেই প্রস্তুত খাবার সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বেঁচে গেল। (বুখারী–২/৭৮৯) রাসূল (সা) জাবিরের স্ত্রীকে বললেন, বেঁচে যাওয়া খাবার তোমরা খাও এবং অন্য লোকদের কাছেও কিছু পাঠিয়ে দাও। কারণ, তারা অভুক্ত আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২১৮, ২১৯, হায়াতুস সাহাবা–২/১৯১, ১৯২, ১৯৩)

হিজরী ষষ্ঠ সনে বনু মুসতালিকের যুদ্ধ হয়। রাসূল (সা) যাত্রার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নামায পড়তে লাগলেন। এর পূর্বেই তিনি জাবিরকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছিলেন। জাবির ফিরে এলে রাসূল (সা) রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দান করেন। বনু মুসতালিকের পর আনমারের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও জাবির শরীক ছিলেন। (বুখারী, গুযওয়াতু আনমার)

এই বছরই হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাহ 'আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। জাবির বলেন, এই সফরে আমরা মোট চৌদ্দশত লোক ছিলাম। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৯) বাই'য়াতুর রিদওয়ানের প্রসিদ্ধ ঘটনা এই সফরেই ঘটে। হযরত জাবিরও বাই'য়াতের (শপথ) সৌভাগ্য অর্জন করেন। বাই'য়াতের সময় 'উমার রাসূলুল্লাহর (সা) হাত এবং জাবির 'উমারের হাত ধরে রেখেছিলেন। (মুসনাদ–৩/৩৬৯) জাবির বলেন, একমাত্র আল–জাদ্দু ইবন কায়স ছাড়া আর সকলেই বাই'য়াত করেছিল। আল্লাহর কসম, আমি যেন আজও দেখতে পাচ্ছি, সে তার উটের বগলের সাথে মিশে লুকিয়ে আছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩১৬)

জাবির যখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করছিলেন তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ তোমরা সারা দুনিয়ার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। (বুখারী, গুযওয়াতু হুদাইবিয়া) এই বাই'য়াত সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীরা পরবর্তীকালে বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাই'য়াত করেছিলাম। কিন্তু জাবির বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাই'য়াত করিনি। আমরা বাই'য়াত করেছি এই কথার ওপর যে, আমরা পালিয়ে যাব না। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩১৫)

সাহাবীরা হুদাইবিয়া থেকে চলা শুরু করেন। পথে 'সুকইয়া' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি হয়। সেখানে পানি ছিল না। হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালের (রা) মুখ দিয়ে ঘোষণা হলো– কেউ যদি পানি পান করাতো। ঘোষণা শুনে জাবির (রা) কয়েকজন আনসারকে সংগে করে পানির সন্ধানে বের হলেন। তেইশ মাইল দূরে 'কুরসায়া' নামক স্থানে পানির সন্ধান পান। সেখানে থেকে মশকে ভরে পানি আনেন। 'ঈশার নামাযের পর দেখেন, এক ব্যক্তি উটে

সাওয়ার হয়ে হাউজের দিকে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীম (সা)। জাবির (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) উটের লাগাম টেনে ধরে উট বসিয়ে দেন। রাসূল (সা) নেমে নামায আদায় করেন। জাবির নিজেও রাসূলের (সা) পাশে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হন। (মুসনাদ–৩/৩৮০)

হিজরী অষ্টম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে একটি বাহিনী পাঠান। এই বাহিনীর আমীর ছিলেন আবু 'উবাইদা। ইসলামের ইতিহাসে এই অভিযান ছিল একটি আশ্চর্যজনক পরীক্ষা। মুসলমানরা এ পরীক্ষায় পূর্ণরূপে কামিয়াব হয়। জাবিরও ছিলেন এই বাহিনীর একজন সদস্য। বাহিনীর লোকদের খাদ্য খাবার সব শেষ হয়ে গেল। তারা গাছের পাতা খাওয়া শুরু করলো। হঠাৎ একদিন তারা সাগর তীরে বিশাল এক মরা মাছ দেখতে পেল। লোকেরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করে মাছটি খাওয়া শুরু করলো।

মাছটি এত বড় ছিল যে, বাহিনীর আমীর মাছটির পাঁজরের একটি কাটা সোজা করে ধরেন এবং তার নীচ দিয়ে সবচেয়ে উঁচু উটটি পার হয়ে গেল। জাবির পাঁচজন লোকের সাথে মাছটির একটি চোখের গর্তের মধ্যে বসে পড়েন; কিন্তু তাতে তাঁদের কোন কষ্ট হলো না। তিন শো লোক পনেরো দিন পর্যন্ত মাছটি খেয়েছিল। মাছটির নাম ছিল 'আম্বর। (মুসনাদ আহমাদ–৩/৩০৮) হায়াতুস সাহাবা–২/২০৮, ২০৯, ৩/৩৬৯, ৬৪০)

সীরাত লেখকরা হুনাইন ও তাবুক অভিযানে জাবিরের যোগদানের কথা উল্লেখ করেছেন। হিজরী দশম সনে বিদায় হজ্জেও তিনি শরীক ছিলেন। (মুসনাদ–৩/৩৪৯, ২৯২) তবে তিনি খাইবার অভিযানে অনুপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) তাঁকে অংশগ্রহণকারী লোকদের সমান গনীমাতের অংশ দান করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৪৯) হিজরী ৩৭ সনে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে জাবির আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেন। (উসুদুল গাবা–১/২৫৭)

হিজরী ৪০ সনে আমীর মু'য়াবিয়ার গভর্নর (আমিল) বুসর ইবন আরতাত হিজায ও ইয়ামনে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন এবং মদীনায় এক ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যতক্ষণ জাবির আমার সামনে হাজির না হবে ততক্ষণ বনু সালামাকে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। জাবির জীবনের আশংকা করছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে পরামর্শ করেন। উম্মু সালামা তাঁকে বলেন, আমি আমার ছেলেদেরকেও বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করতে বলেছি, তুমিও বাই'য়াত করে নাও। জাবির বলেন, এটা তো হবে গোমরাহীর ওপর বাই'য়াত। উম্মু সালামা বলেন, না, এটা হবে মজবুরী বা বাধ্য অবস্থার বাই'য়াত। আমার মত এটাই। তাঁর পরামর্শ মত জাবির বুসরের সামনে হাজির হন এবং হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার খিলাফতের সপক্ষে বাই'য়াত করেন।

হিজরী ৭৪ সনে হাজ্জাজ ছিলেন মদীনার গভর্নর। তাঁর যুলুম অত্যাচার থেকে সাহাবীরাও নিরাপদ ছিলেন না। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীর ওপর এতটুকু করুণা করেন যে, তাঁদের ঘাড়ে, আর জাবিরের হাতে সীল মোহর মেরে দেন। (উসুদুল গাবা–২/৩৬৬) শেষ জীবনে জাবির বলতেন, আমি আকাবায় উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ ও তার কর্মকান্ডও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার চোখের মত কান দু'টিও যদি নষ্ট হয়ে যেত, কতই না ভালো হতো। তাহলে অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হতো না। হাজ্জাজ বলতেন, জাবিরের এই কথা যখন আমার কানে গেল তখন তাঁকে হত্যা না করার যে অনুশোচনা অনুরূপ অনুশোচনা অন্য কোন

ব্যাপারে আমার হয়নি। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাকে বলেন, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৯)

হযরত জাবির শেষ জীবনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। চোখেও দেখতেন না। তার ওপর সরকারের জুলুম অত্যাচার তাঁকে আরও কাহিল করে দেয়। তাঁর মৃত্যুসন ও মৃত্যুর সময় বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। মৃত্যুসন হিজরী ৭৮, ৭৭, ৭৪ অথবা ৭৩ বলা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৭৮ সনে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাবায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী। (শাজারাতুজ জাহাব ফীমান জাহাব-১/৮৪, তারীখু ইবন আসাকির-৩/৩৮৬, আল-ইসাবা-১/২৪৮)

ওয়াকিদী বলেন, জাবির ছিলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। কাতাদাহও এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম বাগাবী বলেন, এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণামাত্র। প্রকৃত পক্ষে সাহল ইবন সা'দই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী মদীনার সর্বশেষ সাহাবী। তিনি হিজরী ৯১ সনে মারা যান। (আল-ইসাবা-১/২১৩), শাজারাতুজ জাহাব-১/৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮)

তৃতীয় আকাবায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এ সময় পর্যন্ত একমাত্র জাবিরই জীবিত ছিলেন। আর সাহাবীদের যুগও তখন শেষ হতে চলেছিল, অল্প সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। এই কারণে তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অস্তিত্ব ছিল রহমত ও বরকত স্বরূপ।

হাজ্জাজের যুলুম অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিজেও সহ্য করেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে যান যে, হাজ্জাজ যেন তাঁর জানাযার নামায না পড়ায়। এ কারণে হযরত 'উসমানের ছেলে আবান ইবন 'উসমান জানাযার নামায পড়ান। ইমাম বুখারী ও তাবারী তাদের তারীখে উল্লেখ করেছেন যে, হাজ্জাজ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হাজ্জাজই জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। (আল-ইসাবা-১/২১৩, তারীখু ইবন আসাকির-৩/৩৯১)

হযরত জাবির পিতার শাহাদাতের পর এক সতীচ্ছদা (সায়্যিবা) মহিলাকে বিয়ে করেন। এ সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ ও বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জাবির এক সফর থেকে ফিরছিলেন। মদীনার কাছাকাছি পৌছলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি নতুন বিয়ে করেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু তাড়াতাড়ি পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারি। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বিয়ে করেছো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কুমারী না (সাইয়্যেবা) সতীচ্ছদা মহিলা? বললেন ঃ সতীচ্ছদা। রাসূল (সা) তখন বললেন ঃ তুমি একটি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তোমরা পরস্পর খেল তামাশা করতে পারতে। জাবির বললেন, আমার পিতা উহুদে শহীদ হন এবং আমার ওপর কতকগুলি ছোট মেয়ের দায়িত্ব দিয়ে যান। আমি তাদেরই মত কাউকে বিয়ে করতে চাইনি। আমার প্রয়োজন ছিল কোন বয়স্কা মহিলার যে তাদের চিরুনী করে দিতে পারে, বেনী বাঁধতে পারে এবং কাপড় সেলাই করে পরিয়ে দিতে পারে। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি ঠিক

কাজটি করেছ। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী–৬/১৪৬, ২২/২০৯, বুখারী–২/৫৮০, সীরাতু ইবন হিশাম–২/২০৭)। বনু সালামা গোত্রে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ইসলামে পাত্রী দেখে বিয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তিনি বিয়ের পয়গামের পর লুকিয়ে পাত্রী দেখে নেন। প্রথম স্ত্রীর নাম সুহাইলা বিনতু মাসউদ। তিনি বনু জুফার গোত্রের কন্যা ও সাহাবিয়্যা ছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উম্মুল হারিস। তিনি আউস গোত্রের সম্মানিত সাহাবী মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার কন্যা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে 'আবদুর রহমান, 'আকীল, মুহাম্মাদ, হামীদা, মায়মুনা ও উম্মু হাবীব এই কয়জনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত জাবিরের জ্ঞান অর্জনের সূচনা হয় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দারসগাহ বা শিক্ষা নিকেতনে। তাছাড়া মাদ্রাসা–ই–নববীর কৃতি ছাত্রদের হালকা–ই–দারস থেকেও ইলম হাসিল করেন। আবু বকর সিদ্দীক, 'উমার, আলী, আবু 'উবাইদা, তালহা, মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবু বারদাহ ইবন নাযার, আবু কাতাদাহ, আবু হুরাইরা, আবু সা'ঈদ আল–খুদরী, আবু হুমাইদ সা'ঈদী, 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস উম্মু, শুরাইক, উম্মু মালিক, উম্মু মুবাশশির, উম্মু কুলসুম বিনতু আবী বকর (রা)– এই মহান ব্যক্তিবর্গের সকলেই ছিলেন তাঁর সম্মানিত শিক্ষক। (তাহজীবু আসমা ওয়াল লুগাত–১/১৪২)

হাদীস শোনা ও সংগ্রহের প্রতি তাঁর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, একটি মাত্র হাদীস শোনার জন্য মাসের পর মাস ভ্রমণ করতেন। জাবির বলেন ঃ খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিল এমন এক ব্যক্তির বর্ণিত একটি হাদীস আমি পেলাম। অতঃপর আমি একটি উট খরীদ করে প্রস্তুত করলাম এবং তার ওপর সাওয়ার হয়ে এক মাস পর শামে (সিরিয়া) পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস। আমি তাঁর দারোয়ানকে বললাম ঃ বল, জাবির দরযায় দাঁড়িয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবদুল্লাহর ছেলে জাবির? বললাম ঃ হাঁ। তিনি কাপড় টানতে টানতে ছুটে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। বললাম ঃ কিসাস–এর ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন বলে আমি জেনেছি। হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শোনার আগেই আমি অথবা আপনি মারা যান কিনা, এই ভয়ে ছুটে এসেছি। তারপর আবদুল্লাহ ইবন উনাইস তাঁর কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৯৬)

এমনিভাবে একটি মাত্র হাদীস শোনার জন্য তিনি মিসর সফর করেন। মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রা) থেকে তাবারানী তাঁর 'আল–আসওয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি যখন মিসরে তখন একদিন দারোয়ান এসে বললো, একজন বেদুঈন উটের পিঠে দরযায় অপেক্ষমান, আপনার সাথে দেখা করতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে আপনি? বললেন ঃ জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ আল–আনসারী। আমি বললাম ঃ আমি নিচে আসবো না আপনি উপরে উঠে আসবেন। বললেন ঃ আপনার নেমে আসার দরকার নেই, আর আমিও উঠবো না। শুনেছি আপনি 'সাতরুল মুমিন' সম্পর্কিত একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করে থাকেন, আমি সেই হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শোনার জন্যই এসেছি। আমি হাদীসটি বর্ণনা করলাম। হাদীসটি শুনেই তিনি উটকে চাবুক মেরে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। (হায়াতুস

সাহাবা–৩/১৯৭, তারীখু ইবন 'আসাকির–৩/৩৮৬, সীয়ারে আনসার–১/৩০১)

ইল্‌ম হাসিলের পর্ব শেষ করে তিনি তাদরীসের (শিক্ষা দান) আসনে বসেন। মসজিদে নববীতে তাঁর একটি হালকা–ই–দারস ছিল। (আল–আ'লাম–২/৯২) মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি স্থানের ছাত্ররা তাঁর দারসে শরীক হতো। হাদীসের প্রচার ও প্রসার ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা–১৫৪০ (এক হাজার পাঁচ শো চল্লিশ)। তার মধ্যে ৬০টি (ষাট) মুত্তাফাক 'আলাইহি, ২৬টি (ছাব্বিশ) বুখারী ও ১২৬টি (একশো ছাব্বিশ) মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–১/১৪২, আল–আ'লাম–২/৯২) তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন ঃ একটি হাদীস বর্ণনাকালে 'সামি'তু' (আমি শুনেছি) শব্দটি বলতে গিয়ে থেমে যান। পরে নিজের পক্ষ থেকে হাদীসটি 'মাওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ, হাদীসটির সবগুলি শব্দ তিনি নিজ কানে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শোনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি। (মুসনাদ–৩/৩৩৩)

তাঁর ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাবে'ঈদের সব ক'টি স্তরের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীন তাঁর ছাত্র ছিলেন। বিশেষ খ্যাতিমান কয়েকজন তাবে'ঈর নামঃ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবু সালামা, সা'ঈদ ইবন মীনা, সা'ঈদ ইবন আবী বিলাল, আসিম ইবন উমার ইবন কাতাদাহ, আবু আয–যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, আশ–শা'বী, আবু সুফইয়ান তালহা ইবন নাফি, আল–হাসান আল–বাসরী, মুহাম্মাদ আল–বাকি, 'আতা', সালিম ইবন আবীল জু'দ, 'আমর ইবন দীনার, মুজাহিদ, মুহাম্মাদ আল–বাকির, আল–হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল–হানাফিয়্যা প্রমুখ। (তাজকির'তুল হুফ্‌ফাজ–১/৪৪, তাহজীবুল আসমা' ওয়ালগাত–১/১৪৪) তাবে'ঈরা ছাড়াও সাহাবীদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল–আ'লাম–২/৯২) আল্লামা জাহ্‌বী তাঁর 'তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ' গ্রন্থে প্রথম তবকার (শ্রেণী) মুহাদ্দিসীনের মধ্যে জাবিরের নামটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীস ছাড়া তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনা কম পাওয়া গেলেও যা আছে তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সব মানুষের জাহান্নামে অবতরণের ব্যাপারে লোকদের মতভেদ ছিল। কেউ মনে করতো, কোন মুসলমান জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অনেকের ধারণা ছিল, সব মানুষই একবার জাহান্নামে যাবে, তবে মুসলমানরা মুক্তি পাবে। এ ব্যাপারে জাবিরকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, নেককার ও বদকার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। তবে নেককারদের গায়ে আগুনের ছোঁয়া লাগবে না। তারপর মুত্তাকীরা (খোদাভীরু) মুক্তি পাবে এবং যালিমরা জাহান্নামেই থেকে যাবে। (মুসনাদ–৩/৩২৯)

তালাক ইবন হাবীব 'শাফা'য়াত' (শুফারিশ) অস্বীকার করতেন। এ ব্যাপারে তিনি 'খুলুদ ফিন্‌নার' (অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান) সম্পর্কিত যাবতীয় আয়াত তিলাওয়াত করে জাবিরের সাথে মুনাজিরা ও তর্ক–বাহাছ করেন। হযরত জাবির তাঁর সব কথা শোনার পর বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি নিজেকে কুরআন–হাদীসের জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করছো। তালাক ইবন হাবীব বললেন ঃ আসতাগফিরুল্লাহ! এমনটি কল্পনাও করতে পারিনে। তখন জাবির বলেন, শোন! এ সব আয়াতের উদ্দেশ্য মুশরিকগণ। যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার

পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে তাদের উল্লেখ এ সব আয়াতে নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। (মুসনাদ–৩/৩৩০, হায়াতুস সাহাবা–৩/৪৯)

জাবির বললেন ঃ সূরা আল মুয্যাম্মিলের প্রথম দুইটি আয়াত দ্বারা আমাদের ওপর 'কিয়ামুল লাইল' ফরয করা হয়। রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের পা ফুলে যেত। পরে আল্লাহ একই সূরার ২০ নং আয়াত নাযিল করে পূর্বোক্ত আদেশ রহিত করেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৪১) জাবিরের মতে কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের কয়েকটি আয়াত (আনসাবুল আশরাফ–১/১০৭)

ফিকাহ শাস্ত্রেও তাঁর প্রভূত দখল ছিল। যে সব মাসয়ালা সমূহে বিভিন্ন সময়ে তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন তা সংকলিত হলে ছোটখাট একটা গ্রন্থে পরিণত হবে। তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম মুফতী। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৫৫) ইসলামী আখলাক বা নৈতিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ইকামাতে হুদুদিল্লাহ (আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন), ঈমানী আবেগ, সত্য প্রকাশের সৎ সাহস, আমর বিল মা'রূফ (সৎ কাজের আদেশ), রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসা, ইত্তেবা–ই–সুন্নাত (সুন্নাতের অনুসরণ), অন্য মুসলমানের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি ইত্যাদি। হযরত জাবিরের মধ্যে এই সব গুণের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু বিকাশ ঘটেছিল।

ইকামাতে হুদুদিল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। এ ক্ষেত্রে জাবিরের নিকট আপন–পর কোন প্রভেদ ছিল না। হযরত মা'য়িয আল–আসলামী (রা) ছিলেন মদীনার বাসিন্দা ও রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম সাহাবী। তাঁকে 'রজম' (যিনার শাস্তি) করার সময় জাবির উপস্থিত থেকে নিজ হাতে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেন। (মুসনাদ–৩/৩৮১)

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারও প্রভাব–প্রতিপত্তি তাঁকে কক্ষণও বিরত রাখতে অথবা বিপথগামী করতে সক্ষম হয়নি। হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। তাছাড়া একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তিনি ইনতিকাল করলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেন ঃ আজ আরশ কেঁপে উঠেছে। এ হাদীসটি সাহাবী হযরত বারা' ইবন 'আযিবের (রা) জানা ছিল। কিন্তু তিনি 'আরশ' শব্দটির পরিবর্তে 'সারীর' (খাটিয়া) শব্দ বলতেন। যার অর্থ শববাহী খাটিয়া দুলে ওঠা। বারা' ইবন 'আযিবের (রা) এমন কথা জাবিরকে বলা হলে তিনি বললেন ঃ প্রকৃত হাদীস তো হচ্ছে তাই যা আমি বর্ণনা করেছি। আর বারা'–এর কথা হিংসা–বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত। কারণে, ইসলাম পূর্ব যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ ছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত জাবির (রা) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাস ত্বেও বারা ইবন 'আযিবকে সমর্থন না করে যা সত্য তাই প্রকাশ করে দেন।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মদীনার গভর্নর হয়ে আসার পর নামাযের সময়ে কিছু আগে–পিছে করেন। লোকেরা জাবিরের কাছে ছুটে আসে। তিনি ঘোষণা করেন, রাসূল (সা) জুহরের নামায দুপুরের পরে, 'আসর সূর্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত, সূর্যাস্তের সময় মাগরিব ও ফজরের নামায অন্ধকারে আদায় করতেন। আর 'ঈশার সময় লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। অন্যথায় দেরী করতেন। (মুসনাদ–৩/৩৬৯)

একবার 'আবদুল্লাহ ইবন জাবির তাঁর বাগানের ফল তিন বছরের জন্য বিক্রি করেন।

জাবির (রা) এ কথা জানতে পেয়ে কিছু লোক সংগে করে মসজিদে আসেন এবং সকলের সামনে ঘোষণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ধরনের বেচা–কেনা নিষেধ করেছেন। ফল যতক্ষণ খাওয়ার উপযোগী না হয় ততক্ষণ তা বেচা–কেনা জায়েয নয়। (সুতরাং ফল হওয়ার পূর্বেই তা কিভাবে জায়েয হতে পারে?) মুসনাদ–৩/৩৯৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তেবা 'বা অনুসরণের আবেগ–উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে, যে সকল বিষয়ে অনুসরণ আদৌ প্রয়োজনীয় নয় সে ক্ষেত্রেও অনুসরণ করতেন। একবার রাসূলুল্লাহকে (সা) মাত্র একখানা কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেন। এ কারণে তিনিও সেই ভাবে নামায আদায় করলেন। লোকেরা যখন বললো আপনি এভাবে নামায আদায় করলেন, অথচ আপনার নিকট অতিরিক্ত কাপড় আছে। তিনি বললেন, এটা এই জন্য করলাম যে, তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) এই অনুমতিকে দেখে বুঝতে পার।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে ফাত্‌হ–এ তিন দিন দু'আ করেছিলেন। তৃতীয় দিন নামাযের মধ্যে দু'আ কবুল হলে চেহারা মুবারকে এক প্রকার নূরের চমক খেলে যায়। হযরত জাবির এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই যখনই তিনি কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতেন, একটা নির্দষ্ট সময়ে সেখানে গিয়ে দু'আ করতেন। (মুসনাদ–৩/৩৩২)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা এবং তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রবল আগ্রহ। আর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তৃতীয় 'আকাবার বাই'য়াতে। তাছাড়া আরও বহু ঘটনায় দেখা যায় রাসূলকে (সা) খুশী করার কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না তিনি করছেন।

একবার কিছু উৎকৃষ্টমানের খেজুর রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করেন। তিনি দেখে বলেন, আমি মনে করেছিলাম গোশত। জাবির বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে কথাটি বলেন। তারপর তক্ষুণি বকরী জবেহ করে গোশত রান্না করে দেন।

একবার রাসূল (সা) জাবিরের বাড়ীতে আসলেন। জাবির একটি বকরী জবেহ করে দেন। জবেহের সময় বকরীটি কিছু ডাকাডাকি করছিল। তাই শুনে তিনি বললেন, বংশ ও দুধ শেষ করে দিচ্ছ কেন? জাবির বললেন ঃ এটা এখনও বাচ্চা, খেজুর খেয়ে এমন মোটা হয়েছে।

একবার তিনি ঢালে করে খেজুর নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় রাসূলকে (সা) সামনে দিয়ে যেতে দেখে খাওয়ার আহ্বান জানালেন। রাসূল (সা) আহবানে সাড়া দিলেন। আর একবার জাবির রাসূলকে (সা) বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গোশ্‌ত, খুরমা ও পানি উপস্থাপন করেন। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা হয়তো জান আমি গোশ্‌ত খুব পসন্দ করি। বিদায় বেলা অন্দর মহল থেকে জাবিরের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তক্ষুণি তিনি বললেন ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহিম– হে আল্লাহ, তাদের সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। (মুসনাদ–৩/২৯৭, ৩০৩, বুখারী–২/৫৮০)

একবার কোন এক বিশেষ ঘটনায় রাসূল (সা) তাঁর জন্য পঁচিশবার মাগফিরাত কামনা করেন। একবার জাবিরের অসুখ হলো। রাসূল (সা) দেখতে আসলেন। জাবির বেঁহুশ ছিলেন। রাসূল (সা) অযু করে পানির ছিটা দিলে তাঁর হুঁশ হলো। তখন পর্যন্ত জাবিরের কোন সন্তানাদি ছিল না। পিতাও মারা গিয়েছিলেন। শরী'য়াতের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে 'কালালাহ' বলে। যেহেতু জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাই রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি

মারা গেলে আমার মীরাস বা উত্তারাধিকার কিভাবে বন্টিত হবে? আমি কি $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ) বোনদের দেব? বললেন; বেশ, দাও। আবার আরজ করলেন ঃ $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) দিই? বললেন; হাঁ, তাও দিতে পার। একথা বলে রাসূল (সা) বাইরে বেরিয়ে আসেন। তারপর আবার ফিরে গিয়ে বললেন ঃ জাবির, তুমি এ অসুখে মরবে না। তোমার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতুল কালালাহ পাঠ করেন ঃ 'হে নবী, লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন ····।' (তারীখু ইবন আসাকির-৩/৩৯০, হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৯, মুসনাদ-৩/২৯৮, ৩৭২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কোথাও খাবারের দাও'য়াত পেলে জাবিরকে মাঝে মাঝে সংগে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েও আহার করাতেন। একদিন জাবির তাঁর বাড়ীর পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় সামনে দিয়ে রাসূলকে (সা) যেতে দেখলেন। দৌড়ে কাছে গেলেন এবং আদব রক্ষার্থে পেছনে চলতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ পাশে এস। তারপর জাবিরের হাত ধরে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান এবং পর্দা সরিয়ে ভেতরে বসতে দেন। ভেতর থেকে তিন টুকরো রুটি ও একটু সিরকা আসলো। রাসূল (সা) রুটি তিনটি সমান দুই ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন ঃ সিরকা খুব উপাদেয় তরকারি। জাবির বলেন ঃ আমি সেই দিন থেকে সিরকা খুব ভালোবাসি। (মুসনাদ-৩/৩৭৯, ৪০, হায়াতুস সাহাবা-২/১৮৩)

একবার রাসূল (সা) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। জাবির তাঁকে দেখতে যান (মুসনাদ-৩/৩০০) রাসূলুল্লাহর (সা) কখনও ঋণের প্রয়োজন হলে জাবিরের নিকট থেকে গ্রহণ করতেন। একবার ঋণ নিয়ে পরিশোধের সময় সন্তুষ্ট চিত্তে আসলের ওপর কিছু বেশী দান করেন। (মুসনাদ-৩/৩০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ পর্যায়ে একবার বাহরাইন থেকে মাল আসছিল। তিনি সেই মাল থেকে জাবিরকে কিছু দেওয়ার অঙ্গিকার করেন। ইত্যবসরে রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হয়ে ঘোষণা দেন যে, রাসূল (সা) যদি কাউকে কিছু দেওয়ার অঙ্গিকার করে থাকেন অথবা কারও নিকট ঋণী থাকেন, সে যেন আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করেন। হযরত জাবির রাসূলুল্লাহর (সা) অঙ্গিকারের কথা বললে আবু বকর (রা) তা পূরণ করেন।

মুসলিম উম্মার প্রতি হযরত জাবিরের ছিল গভীর মমতা ও ভালোবাসা। তিনি ছিলেন 'রুহামাউ বাইনাহুম'- (পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়ালু)-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। একবার তাঁর এক প্রতিবেশী কোথাও সফরে যায়। সফর থেকে ফিরে আসলে জাবির তার সাথে দেখা করতে যান। লোকটি মানুষের মধ্যে বিভেদ, দলাদলি, বিদ'য়াতের প্রচলন ইত্যাদি যা সে দেখেছিল, বর্ণনা করলো। যে সাহাবায়ে কিরাম রক্তের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা এমন কথা সহ্য করবেন কেমন করে। তাঁর চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন, মানুষ যেমন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তেমনি বের হয়েও যাবে। (মুসনাদ-৩/৩৪৩)

তাঁর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে। এত দূর থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে মসজিদে নববীতে আসতেন। একবার মসজিদে নববীর পাশে কিছু বাড়ী–ঘর খালি হয়। জাবির ও বনু সালামার অন্য এক ব্যক্তি এই সব শূন্য বাড়ী–ঘরে চলে আসার ইচ্ছা করলেন। তাহলে নামায আদায় করা সহজ হবে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যে সেখান থেকে আস, তাতে তোমাদের প্রতি কদমে সাওয়াব লেখা হয়। চিন্তা করে দেখ তো কত সাওয়াব হয়েছে? তাঁরা দু'জন মনে প্রাণে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা মেনে নেন। শেষ জীবনে বাড়ীর পাশে একটি মসজিদ তৈরী করেন।

জাবির বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবু 'উবাইদার নেতৃত্বে আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠান। একটি থলিতে কিছু খেজুর ছাড়া আমাদের সাথে আর কিছুই ছিল না। আবু 'উবাইদা আমাদেরকে প্রতিদিন মাত্র একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা সেটি বাচ্চাদের মত চুষতাম আর পানি পান করতাম। এভাবে একটি খেজুর দিয়ে রাত্রি পর্যন্ত চালাতাম (হায়াতুস সাহাবা–১/৩২১)

ইবন হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবুল মুসাববিহ আল–মুকরায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মালিক ইবন 'আবদিল্লাহ আল–খাস'য়ামীর নেতৃত্বে আমরা একবার রোমের মাটিতে চলছিলাম। একদিন মালিক জাবিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি তাঁর বাহন খচ্চরটিকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলছেন। মালিক বললেন ঃ আবু আবদিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে বাহন দিয়েছেন, তার পিঠে আরোহণ করুন। জাবির বললেন ঃ আমি তাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় যে দু'টি পা ধূলি–মলিন হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৭৬, ৪৭৭)

হযরত জাবির হজ্জ আদায় করেছেন কয়েকবার। হাদীসে তাঁর দু'টি হজ্জের আলোচনা দেখা যায়। একটি বিদায় হজ্জ ও অন্য আর একটি।

সরলতা মুসলমানদের উন্নতির মূল রহস্য। হযরত জাবির ছিলেন অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল তাঁর বাড়ীতে আসলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে রুটি ও সিরকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিন। সিরকার খুব মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। মানুষের কাছে তার আত্মীয় বন্ধুদের কেউ আসলে উপস্থিত খাবার যা কিছু থাকে সামনে দিতে হবে, কোন রকম ইতস্তত করা উচিত নয়। তেমনি ভাবে উপস্থিত লোকদের সামনে যা কিছু খাবার হাজির করা হয় সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করা উচিত। হেয় দৃষ্টিতে তা দেখা উচিত নয়। কারণ, ভনিতার মধ্যে উভয়ের ধ্বংসের উপকরণ বিদ্যমান। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৮১, মুসনাদ–৩/৩৭১) মানুষের সাথে মেলামেশায় তিনি ছিলেন আন্তরিক ও উদার।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতিটি অভ্যাস ও আচরণ তাঁর মন-মগযে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিল। হুদাইবিয়ায় 'বাই'য়াতে রিদওয়ান' একটি গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লোকেরা স্থানটিকে বরকত ও কল্যাণময় মনে করে সেখানে নামায আদায় করতে শুরু করে। এ অবস্থা দেখে হযরত উমার (রা) গাছটি কেটে ফেলেন। মুসায়্যাব ইবন দুখন বলেন, পরের বছরই

আমরা সেই গাছটি ও স্থানের কথা ভুলে যাই। (বুখারী–২/৫৯৯) কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত জাবিরের তা মনে ছিল। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। হুদাইবিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে একবার বললেন ঃ আজ যদি চোখ থাকতো, সেই স্থানটি আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম। (বুখারী–২/৫৯৮)

হযরত জাবির বলতেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিই হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত প্রকৃত ফাত্‌হ বা বিজয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৮) জাবির আরও বলতেন, রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর সর্বপ্রথম মদীনায় আসে এক জিনের মাধ্যমে। মদীনার এক মহিলার অনুগত একটি জিন ছিল। একদিন জিনটি একটি সাদা পাখীর রূপ ধরে মহিলার বাড়ীর দেওয়ালে এসে বসে। মহিলা তাকে বললো ঃ নীচে নেমে এসো আমরা কথা বলি, খবর আদান–প্রদান করি। জিন বললো ঃ মক্কায় এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি যিনা (ব্যভিচার) হারাম করেছেন এবং আমাদেরকে যমীনে থাকতে নিষেধ করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৭৩)

জাবির (রা) বলেন ঃ আমি একবার এক দিরহামের গোশত কিনলাম। 'উমার একথা শুনে আমার কাছে এসে বললেন ঃ জাবির, এটা কি? বললাম ঃ আমার পরিবারের লোকদের গোশ্‌ত খেতে খুব ইচ্ছা করেছে তাই এক দিরহামের গোশত কিনেছি। 'উমার কয়েকবার আমার কথাটি আওড়ালেন, 'আমার পরিবারের লোকদের গোশ্‌ত খেতে খুব ইচ্ছা করেছে।' তখন আমার ইচ্ছা হলো, যদি আমার দিরহামটি হারিয়ে যেত অথবা 'উমারের সাথে দেখা না হতো। অন্য একটি বর্ণনা মতে 'উমার বলেন, তোমাদের কোন ইচ্ছা হলেই এভাবে কিনে থাক? (হায়াতুস সাহাবা–২/৩০২,৩০৩)

এভাবে হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে হযরত জাবিরের (রা) জীবনের বিভিন্ন দিকের অনেক টুকরো টুকরো কথা পাওয়া যায়, যার মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষার অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে।

আবু আইউব আল-আনসারী (রা)

নাম খালিদ, ডাক নাম আবু আইউব। পিতা যায়িদ ইবন কুলাইব আল-নাজ্জারী আল-খাযরাজী। কেউ কেউ মালিক ইবন নাজ্জারের সাথে সম্পর্কের কারণে 'আল-মালিকী' এবং আনসারদের 'আযদী' হওয়ার কারণে তাঁকে 'আল-আযদী' বলেও উল্লেখ করে থাকেন। (দায়িরা-ই মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা, উর্দু ১/৭৪২), মাতা হিন্দা বিনতু সা'দ। (উসুদুল গাবা-২/৮০) তবে ইবন সা'দের মতে যাহরা বিনতু সা'দ। (তাবাকাত-৩/৪৮৪) 'যাহরা' আবু আইউবের পিতার মামাতো বোন। আবু আইউব চল্লিশ 'আমুল ফীল' (হস্তী বৎসর) অর্থাৎ হিজরাতের একত্রিশ বছর পূর্বে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি 'আবু আইউব' ডাক নামে পরিচিত। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা, (উর্দু)-১/৭৪২) নাজ্জার খান্দানটি ইয়াসরিবের অন্যতম অভিজাত খান্দান। আর সেই আভিজাত্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্র হওয়ার কারণে। আবু আইউব এই অভিজাত নাজ্জার গোত্রের রয়িস বা নেতা।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। ইসলামী দাওয়াতের জন্য মক্কার প্রতিকূল অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইয়াসরিবেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। নবুয়াতের দশম বছরে ছয় জন, একাদশ বছরে বারোজন এবং দ্বাদশ বছরে তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন ইয়াসরিববাসী (মদীনা বাসী) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একটি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। ইতিহাসে যা 'আকাবার ১ম, ২য় ও ৩য় শপথ' নামে পরিচিত। এই শেষ শপথে আবু আইউব উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হয়ে ইয়াসরিবে ফিরে যান। (উসুদুল গাবা-২/৮০, তাবাকাত ৩/৪৮৪) তিনি যে মহাসত্যের সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন তা অন্যদেরকে না জানানো পর্যন্ত স্থির হতে পারলেন না। নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের আপনজনদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। শিগগিরই স্ত্রীকে স্বধর্মে টেনে আনলেন।

আকাবার শপথগুলিতে মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করায় এবং মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি মুসয়াব ইবন 'উমাইরের (রা) প্রচেষ্টায় সেখানে ইসলামী দাওয়াত খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে অনেক নির্যাতিত মুসলমান মক্কা থেকে চুপে চুপে হিজরাত করে মদীনায় চলে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখনও কুরাইশদের বৈরী পরিবেশের মধ্যে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। অবশেষে নবুওয়াতের এয়োদশ বছরে আল্লাহর নির্দেশে তিনিও মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

মদীনাবাসীরা অধীর আগ্রহে মহানবীর আগমন অপেক্ষায় ছিল। আনসারদের একটি

দল– আবু আইউব তাদের একজন– নিয়মিত প্রতিদিন সকালে মদীনার ৪/৫ মাইল দূরে 'হাররা' নামক স্থানে চলে যেত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সম্ভাব্য আগমন পথের দিকে তাকিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। তারপর এক সময় তারা ফিরে যেত। এমনিভাবে একদিন তাঁরা ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় জনৈক ইয়াহুদী বহু দূর থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে পেয়ে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়। আনসাররা অস্ত্র–সজ্জিত হয়ে মহানবীকে স্বাগতম জনানোর জন্য দ্রুত ছুটে যায়। বনু নাজ্জার ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী।

মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা' পল্লীতে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কয়েক দিন অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি মদীনার মূল শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কুবা থেকে মদীনার দিকে তাঁর যাত্রার সেই দিনটি ছিল মদীনার ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরব ও কল্যাণময় দিন। বনী নাজ্জারসহ মদীনার সকল আনসার গোত্রের লোক মহানবীর চলার পথের দু'ধারে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে, আর গোত্র–পতিরা নিজ নিজ ঘরের দরযায় অপেক্ষমান। পর্দানশীন মেয়েরা ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে এবং হাবশী গোলামরা আনন্দ–ফূর্তিতে সামরিক কলা–কৌশল প্রদর্শনে মেতে উঠেছে। আর বনী নাজ্জারের ছোট ছেলে–মেয়েরা–'তালায়াল বাদরু আলাইনা'– স্বাগতম সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে। এমনি এক জাঁকালো ও পবিত্র অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে মহানবী মদীনায় প্রবেশ করলেন।

মহানবীর আতিথেয়তার সৌভাগ্য কার হয় তা দেখার জন্য মদীনার প্রতিটি লোক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। তিনি পথ অতিক্রম করছেন, আর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা– আহলান, সাহলান ওয়া মারহাবান– স্বাগতম শুভাগমন ইত্যাদি বলে এগিয়ে এসে নিজ নিজ বাড়ীতে মেহমান হওয়ার আহবান জানাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ পাক তো মহানবীর আতিথেয়তার জন্য আবু আইউবের বাড়ীটি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহন উটনীটির পথ রোধকারীদের বার বার বলছিলেন ঃ 'তোমরা তার পথটি ছেড়ে দাও, সে (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্দেশ প্রাপ্ত।' (উসুদুল গাবা–২/৮০) ইমাম মালিক বলেন, সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে ওহীর অবস্থা বিরাজমান ছিল। তিনি অবতরণ স্থল নির্ণয়ের ব্যাপারে ওহীর প্রতীক্ষায় ছিলেন [সীয়ারে আনসার (উর্দু)–১/১১০]

উটনী চলতে চলতে এক সময় বনী মালিক ইবন নাজ্জারের মধ্যে এক স্থানে (পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর দরযায়) বসে পড়ে। তারপর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার উঠে পড়ে এবং একটু এদিক সেদিক ঘুরে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে এসে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) নেমে পড়েন। নিকটেই ছিল আবূ আইউবের বাড়ী। (উসুদুল গাবা–২/৮১) আবু আইউব এগিয়ে এসে আরজ করেন নিকটেই আমার বাড়ী, অনুমতি পেলে বাহনের পিঠ থেকে জিনিস পত্র নামাতে পারি। নিজের বাড়ীতে মেহমানদারি করার অভিলাষীদের ভিড় কিন্তু তখনও কমেনি। সবারই একান্ত ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা) তারই মেহমান হউন। শেষমেষ লোকেরা নিজেদের মধ্যে কারয়া বা লটারী করে এবং তাতে আবূ আইউবের নামটি ওঠে। এভাবে আবূ আইউব মহানবীর

মেহমানদারির মহাগৌরব অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। (সীয়ারে আনসার-১/১১১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান তৈরী না হওয়া পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস আবূ আইউবের গৃহে অবস্থান করেন। অত্যন্ত প্রীতি ও বিনয়ের সাথে তিনি মেহমানদারির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ঘরটি ছিল দুইতলা। তবে ছাদটি ছিল সাদামাটা ধরনের। আবূ আইউব ওপরতলা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু রাসূল (সা) নিজের ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নীচতলাই পছন্দ করেন। এভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো। ঘটনাক্রমে একদিন ওপর তলায় পানির একটি কলস ভেঙ্গে পানি গড়িয়ে পড়লো। ছাদ ছিল অতি সাধারণ। পানি নীচে গড়িয়ে পড়বে এবং তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) কষ্ট হবে, এমন একটা ভীতি ও শঙ্কায় আবূ আইউব ও তাঁর স্ত্রী উম্মু আইউব অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁদের ছিল একটি মাত্র লেপ। পানি চুষে নেওয়ার জন্য তাঁরা সেটি পানির ওপর ফেলে দেন। সাথে সাথে তাঁরা নীচে নেমে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) ওপরে যাওয়ার অনুরোধ করে নিজেরা নীচে নেমে আসার ইচ্ছা'প্রকাশ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৮১)

এতটুকু কষ্ট অবশ্য তাঁদের জন্য তেমন কিছু ছিল না। তাঁরা অন্য একটি ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। 'আমরা ওপরে আর ওহীর বাহক, আমাদের নীচে' এমন একটা তীব্র অনুভূতি তাদেরকে অস্থির করে তুললো। একটি রাত তো তাঁরা ঘুমাতেই পারলেন না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ঘরের এক কোণে গুঁটি-শুটি মেরে কোন মতে জেগে কাটিয়ে দিলেন। সকালে আবূ আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে গতরাতের ঘটনা ও তাঁদের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন। তিনি ওপরে চলে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৮, হায়াতুস সাহাবা-২/৩২৮-৩২৯)

হযরত আবূ আইউবের মৃত্যুর পর এই বাড়ীটি তাঁর আযাদকৃত দাস আফলাহ-এর হাতে চলে যায়। ঘরটির দেওয়াল ধসে গিয়ে বিরান হওয়ার উপক্রম হলে তাঁর নিকট থেকে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে মুগীরা ইবন 'আবদির রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম খরীদ করে সংস্কার করেন। আর আফলাহ সেই অর্থ মদীনার গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৮, টীকা নং-৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবূ আইউবের গৃহে অবস্থানকালে সাধারণতঃ আনসারগণ পালাক্রমে অথবা আবূ আইউব নিজে তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন। খাওয়ার পর যা বেঁচে যেত তিনি আবূ আইউবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবূ আইউব খাবারের থালায় রাসূলুল্লাহর (সা) আঙ্গুলের ছাপ দেখে দেখে যে দিক থেকে তিনি খেয়েছেন সেখান থেকেই খেতেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাসূল (সা) খাবার স্পর্শ না করে, সবই ফেরত পাঠান। দ্বিধা ও সংকোচের সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে খাবার গ্রহণ না করার কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, খাবারে রসুন ছিল। আমি রসুন পছন্দ করিনে। তবে তোমরা খাবে। আবূ আইউব বললেন, 'আপনার যা পছন্দ নয়, আমিও তা পছন্দ করবো না।' (মুসলিম-২/১৯৮, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৯, উসুদুল গাবা-২/৮১)

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আনাসের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের সমবেত করেন এবং রুচি, সামাজিক মর্যাদা, ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুসারে একজন মুহাজির ও একজন আনসারের মধ্যে মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। ইয়াসরিবে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ (প্রচারক) মুস'য়াব ইবন 'উমাইর আল-কুরাইশীর সাথে আবূ আইউবের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (তাবাকাত ৩/৪৮৪) মুস'য়াব প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক উৎসাহী সাহাবী। ইসলামী দা'ওয়াতের পথে তিনি বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে সর্বপ্রথম দায়ী (প্রচারক) হিসাবে তাঁকে মদীনায় পাঠান। তাঁর সাথে আবূ আইউবের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য হল, তাঁর মধ্যেও মুসয়াবের মত উৎসাহ উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী একথার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

বদর, উহুদ, খন্দক, বাইয়াতুর রিদওয়ান সহ সকল যুদ্ধ ও অভিযানে আবূ আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। (উসূদুল গাবা-২/৮০, আল-ইসাবা-১/৪০৫) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তিনি সত্যিকারেই জীবন ও ধন-সম্পদ বিক্রী করে দিয়েছিলেন। রাসূলে পাকের (সা) ওফাতের পর খলীফাদের যুগে যত যুদ্ধ হয়েছে, হাজারো দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর একটি থেকেও পিছিয়ে থাকেননি। রাত-দিন, প্রকাশ্যে ও নিরিবিলিতে সর্বক্ষণ তাঁর শ্লোগান ছিল আল্লাহর এই বাণী- 'ইনফিরূ খিফাফান ওয়াসিকালান'- তোমরা হালকা এবং ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়। (তাওবা-৪১) অর্থাৎ একাকী ও দলবদ্ধভাবে, উদ্দমী ও হতোদ্দম অবস্থায়, যৌবনে ও বার্ধক্যে, প্রাচুর্য ও দারিদ্রের মধ্যে- মোটকথা সর্ব অবস্থায়। (ফাতহুল কাদীর-২/২৬৩) তিনি বলতেন ঃ আমি নিজেকে সব সময় 'খাফীফ ও সাকীল'-ই পেয়েছি। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৫৭-৪৫৮; তাবাকাত-৩/৪৮৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মাত্র একটি বার তিনি ঘর থেকে বের হননি। সেই যুদ্ধে খলীফা একজন কম বয়স্ক যুবককে সেনাপতি নিয়োগ করেন। যার নেতৃত্বের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সেনাপতি হলেন ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া (রা)। তবে বেশী দিন ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খেতে থাকেন, অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হন। অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। আপন মনে বলে ওঠেন ঃ কে আমার আমীর, তাতে আমার কী আসে যায়? এমন চিন্তার পর একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ইসলামী সেনা দলের একজন সৈনিক হিসাবে বেঁচে থাকা, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখা- তিনি জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪০৬, হায়াতুস সাহাবা ১/৪৫৮) তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশেই গমন করেন। (দায়িরা-ই মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা-১/৭৪৩)

হিজরী ৩৫ সনে হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন তখন আবূ আইউব মদীনায়। সেই দুর্যোগময় সময়ে মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে নববীতে

নামাযের ইমাম হতেন। আলী ও মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকালীন সেই সংকটময় সময়ে তিনি বিনা দ্বিধায় আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। কারণ, তাঁর মতে, তিনিই ইমাম, মুসলমানরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪০৭) ইবনুল আসীরের মতে আলীর (রা) সাথে তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা–২/৮১) মাস'উদী 'মুরূজ আজ–জাহব' গ্রন্থে হিঃ ৩৬ সনে আলীর (রা) সাথে উটের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। ইবন আবদিল বার 'আল–ইসতী'য়াব' গ্রন্থে মাস'উদীর কথা সমর্থন করেছেন। তবে হিঃ ৪র্থ শতকের ঐতিহাসিক মাস'উদীর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক আবূ আইউবের উটের যুদ্ধে যেগদানের কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। খারেজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'নাহরাওয়ানের' যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। যুদ্ধের পূর্বে যাঁরা খারেজীদের সাথে আপোষরফার চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে আবূ আইউবও একজন। তিনি আলীর (রা) সাথে 'মাদায়িন' গমন করেন। তাঁর প্রতি আলীর (রা) ছিল গভীর বিশ্বাস ও আস্থা। মদীনা থেকে 'দারুল খিলাফা' (রাজধানী) কূফায় স্থানান্তরিত হলে আলী (রা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আবূ আইউব সেই সময় মদীনায় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। [সীয়ারে আনসার–১/১১১; দায়িরা–ই মা'য়ারিফ–ই–ইসলামিয়্যা–(উর্দু) ১/৭৪৩]

হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের সময় আবু আইউব মদীনায়। তারপর হযরত মুয়াবিয়া (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আবু আইউব চাওয়া–পাওয়ার লোক ছিলেন না। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল জিহাদের ময়দানে ও মুজাহিদদের সারিতে একটুখানি স্থান। হিজরী ৪২ সনে বাইজেন্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান বৃদ্ধি পায়। তিনি এ সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমানের নেতৃত্বে জিহাদে শরিক হন। তখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর। হিঃ ৪২ সনে সামুদ্রিক যুদ্ধে যোগদানের জন্য মিসর গমন করেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাইজেন্টাইন রোমানদের ঘাঁটি কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। কার হাতে এ বিজয়–কর্ম সমাধা হয় তা দেখার জন্য মুসলিম আমীরগণ সব সময় উৎসুক ছিলেন। হিঃ ৫২ মতান্তরে ৪৯ সনে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের নির্দেশ দেন। এই বাহিনীতে ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস ও ইবন যুবাইরের মত মর্যাদাবান সাহাবীদের সাথে আবু আইউবও একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগ দেন।

মিসর, সিরিয়াসহ মুসলিম খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন সেনা ইউনিট এ যুদ্ধে যোগ দেয়। মিসরীয় সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন তথাকার গভর্ণর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উকবা ইবন 'আমির আল–জুহানী। তাছাড়া ফুদালা ইবন 'উবাইদ ও আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বেও দু'টি সেনা ইউনিট যোগ দেয়।

রোমানরা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এগিয়ে আসে। মুসলমানদের প্রস্তুতিও কম ছিল না। তাদের সংখ্যাও প্রায় শত্রুসংখ্যার সমান। মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে আবেগ উৎসাহ এত তীব্র ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মাত্র মুসলিম সৈনিক রোমানদের একটি পুরো সারির বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। একজন মুসলিম সৈনিক একবার একাই রোমানদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তার এই দুঃসাহস দেখে অন্যান্য মুসলমানদের মুখ থেকে সমস্বরে এ কুরআনের আয়াতটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে ঃ লা তুলকূ আয়দীকুম ইলাত তাহলুকাহ'– তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা। (আল–বাকারা–১৯৫) তাদের একথা শুনে আবু আইউব এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটির এই অর্থ বুঝলে? এ আয়াতটি তো নাযিল হয়েছিল ব্যবসায় ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আনসারদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। একবার আনসাররা বলল, গত বছর জিহাদে যোগদানের জন্য ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হয়েছে এবছর তা পুষিয়ে নিতে হবে। সেই প্রেক্ষাপটে এ আয়াতের অবতরণ। আয়াতটির তাৎপর্য হল, ধ্বংস জিহাদে নয়, জিহাদ ত্যাগ করা ও অতিরিক্ত ধন–সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ধ্বংস। (সীয়ারে আনসার–১/১১২; হায়াতুস সাহাবা–১/৪৭০–৪৭১, ৪৫৮–৪৫৯; তাবাকাত–৩/৪৮৪–৪৮৫) ।

এই কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানের সফরে এক মহামারি দেখা দেয়। বহু মুজাহিদ সেই মহামারিতে মারা যান। আবু আইউবও আক্রান্ত হলেন। তিনি অন্তিম রোগ শয্যায়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ইয়াযীদ ইবন মুয়াবিয়া শেষ বারের মত তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন,

'আবু আইউব, আপনার কিছু চাওয়ার আছে কি? আমি আপনার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবো।'

কিন্তু যে ব্যক্তি জান্নাতের বিনিময়ে নিজের সবকিছু বিক্রী করে দিয়েছেন, এ নশ্বর পৃথিবীতে তাঁর চাওয়ার কী থাকতে পারে? তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযীদের কাছে যা আশা করলেন তা কোন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। তিনি ধীর–স্থিরভাবে বললেন, আমি মারা গেলে তোমরা আমার মৃতদেহটি ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে শত্রু–ভূমির অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব নিয়ে যাবে এবং শেষ প্রান্তে দাফন করবে। মুসলিম বাহিনীকে এই পথে দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে যাতে তাদের অশ্বের পদাঘাত আমার কবরের ওপর পড়ে এবং আমি বুঝতে পারি, তারা যে সাহায্য ও কামিয়াবী চায় তা তারা লাভ করতে পেরেছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪০৭, আল–ইসাবা–১/৪০৫)

আবু আইউবের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা হয়। একদিন রাতে মুসলিম বাহিনী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে লাশটি উঠিয়ে নেয় এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের (আধুনিক ইস্তাম্বুল) নগর প্রাচীরের গা ঘেঁষে তাঁকে দাফন করে। মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্য তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। বিধর্মীরা তাঁর মাযারের অবমাননা করতে পারে, এই চিন্তায় ইয়াযীদ কবরটি মাটির সাথে সমান করে দেন। পরদিন সকালে

রোমানরা মুসলিম মুজাহিদদের কাছে জানতে চাইলো, কাল রাতে আপনাদের একটু ব্যস্ত দেখা গেল, কী হয়েছিল? তাঁরা জবাব দিলেন, আমাদের নবীর একজন অতি সম্মানিত সংগীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁরই দাফন কাজে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। যেখানে দাফন করা হয়েছে তোমরা তা জান। যদি তাঁর মাযাবের অবমাননা করা হয় তাহলে জেনে রাখ, বিশাল ইসলামী খিলাফতের কোথাও তোমাদের 'নাকুস' আর বাজবে না। (সীয়াবে আনসার-১/১১৩) ইস্তাম্বুলের সন্নিকটে হযরত আবু আইউবের কবরটি আজও বর্ণ ও ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষের এক তীর্থ-স্থান। রোমানরা তাদের দুর্ভিক্ষ ও খরার সময় তাঁর কবরের নিকট সমবেত হয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করতো এবং পানি চাইতো। (দায়িরা-ই মায়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা-১/৭৪৫, উসুদুল গাবা-২/৮২)

হযরত আবু আইউবের মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনুল আসীর উসুদুল গাবা (২/৮১) গ্রন্থে তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন। যথা হিজরী ৫০, ৫১ ও ৫২ সন। তবে হিজরী ৫২ সন অধিকাংশের মত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইবন আসাকির তাঁর একটি মতে হিজরী ৫৫ সন বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশিবছর।

হযরত আবু আইউবের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে বহু কথা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনা জানা যায় যা খুবই শিক্ষণীয়। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সেসব বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন, 'একদা প্রচন্ড গরমের দিনে ঠিক দুপুরের সময় আবু বকর ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে আসলেন। 'উমার তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন,

-এমন অসময়ে বের হলেন যে?

-কী করবো, দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

-আল্লাহর কসম, আমারও একই দশা। তাঁদের দু'জনের কথা শেষ না হতেই হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দেখে বললেন ঃ

-কি ব্যাপার, এ অসময়ে তোমরা এখানে?

-ক্ষুধার জ্বালায় আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

রাসূল (সা) বললেন ঃ যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, আমিও ক্ষুধার জ্বালায় ঘরে থাকতে পারিনি। এসো তোমরা আমার সাথে।

তাঁরা তিন জন হাঁটতে হাঁটতে আবু আইউবের বাড়ীর দরজায় পৌছলেন। আবু আইউবের অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন রাসূলে কারীমের (সা) জন্য খাবার তৈরী রাখা। তিনি দেরি করলে বা না খেলে তাঁর পরিবারের লোকেরা তা ভাগ করে খেয়ে ফেলতো; তাঁদের তিনজনের সাড়া পেয়ে উম্মু আইউব (আবু আইউবের স্ত্রী) বেরিয়ে এসে বললেন,

-আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়, আহলান ওয়াসাহলান।

-আবু আইউব কোথায়?

আবু আইউব নিকটেই তাঁর খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) গলার আওয়ায শুনে এই কথা বলতে বলতে ছুটে আসলেন :

–ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমন সময় তো আপনার শুভাগমন হয় না।

–তোমার কথাই ঠিক।

আবু আইউব দৌড়ে বাগানে গেলেন এবং এক কাঁধি শুকনো ও পাকা–কাঁচা খেজুর কেটে নিয়ে আসলেন।

রাসূল (সা) বললেন : তুমি এটা কেটে আন তা কিন্তু আমি চাইনি।

–আপনি এর থেকে কিছু শুকনো, পাকা ও কাঁচা খেজুর খান– এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি আপনাদের জন্য এক্ষুণি বকরী জবেহ করব। রাসূল (সা) বললেন : জবেহ করলে দুধালো বকরী জবেহ করবে না।

আবু আইউব দুধ দেয় না এমন একটি বকরী জবেহ করলেন। স্ত্রীকে বললেন : গোশত ভুনা কর এবং রুটি বানাও। তুমি তো রুটি বানাতে দক্ষ। আবু আইউব লেগে গেলেন বকরীর অর্ধেকটা রান্না করতে। রান্নার কাজ শেষ করে তা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে হাজির করলেন।

রাসূল (সা) এক টুকরো গোশত উঠিয়ে একটি রুটির ওপর রেখে বললেন :

–আবু আইউব, শিগগির তুমি এই টুকরোটি ফাতিমাকে দিয়ে এস। বহু দিন সে এমন খাবার দেখে না।

তাঁরা সকলে পেট ভরে খেলেন। তারপর রাসূল (সা) বললেন, 'রুটি, গোশত, খুরমা, পাকা ও আধাপাকা খেজুর।' চোখ দু'টি তাঁর পানিতে ভরে গেল। তারপর বললেন : "যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ। এই নি'য়ামত (দান, অনুগ্রহ) সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা এই নিয়ামত লাভ করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে তাতে হাত দেবে এবং পেট ভরে খাওয়ার পর বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাজী আশবা'য়ানা ওয়া আন'য়ামা আলাইনা ফা আফদালা।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় নেওয়ার সময় আবু আইউবকে বললেন :

–আগামী কাল আমার সাথে দেখা করবে।

পরদিন আবু আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছোট একটি দাসীকে আবু আইউবের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন : আবু আইউব, তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আমার কাছে যতদিন ছিল, আমরা তাঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখিনি।

দাসীটি সংগে করে আবু আইউব বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রী প্রশ্ন করলেন : আইউবের বাপ, এটা আবার কার?

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে দান করেছেন। 'দাতা অতি মহান, দানটিও অতি সম্মানিত'—স্ত্রী মন্তব্য করলেন।

–রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ দিয়েছেন।

–উপদেশ কিভাবে বাস্তবায়ন করবে?

–তাকে আযাদ করে দেওয়া ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশ বাস্তবায়নের আর কোন উত্তম পন্থা নেই।

–তুমি সঠিক হিদায়াত পেয়েছ। তুমি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

অতঃপর তাঁরা দাসীটি আযাদ করে দিলেন। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা–১/১২৪–১৩০; হায়াতুস সাহাবা–১/৩০৮–৩১০)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিনতু হুয়াই–এর সাথে যে রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম বাসর হয়, সে রাতে সকলের অজ্ঞাতসারে আবু আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) দরযায় কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যুষে রাসূল (সা) বের হয়ে আবু আইউবকে দেখতে পান। আবু আইউব বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তাঁর বাপ, ভাই ও স্বামীকে হত্যা করেছেন– এজন্য আমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিনি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) হেসে দেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৪৩, হায়াতুস সাহাবা–২/৬৬৩)

সাহাবা সমাজের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত উঁচুতে ছিল যে, অন্যান্য সাহাবীরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমর, বারা' ইবন আযিব, আনাস ইবন মালিক, আবু উমামা, যায়িদ ইবন খালিদ আল–জুহানী, মিকদাম ইবন মা'দিকারাব, জাবির ইবন সুমরা, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল–খাতামী প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীরা তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আতা ইবন ইয়াসার, 'আতা ইবন ইয়াযীদ, লায়সী, আবু সালামা, আবদুর রহমান ইবন আবী–লায়লার মত বিশিষ্ট তাবে'ঈগণও ছিলেন তাঁর শাগরিদ। তাঁরা সকলে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (উসুদুল গাবা–২/৮১; আল–ইসাবা–১/৪০৫)

আবু আইউব ছিলেন সাহাবাদের কেন্দ্রবিন্দু। কোন মাসয়ালায় সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সবাই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। একবার ইহরাম অবস্থায় জানাবাতের গোসলের সময় হাত দিয়ে মাথা ঘষা যায় কিনা– এ ব্যাপারে ইবন 'আব্বাস ও মিসওয়ার ইবন মাখরামার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাঁরা বিষয়টি জানার জন্য আবদুল্লাহ ইবন হুসাইনকে পাঠালেন আবু আইউবের নিকট। আবদুল্লাহ যখন পৌছলেন তখন ঘটনাক্রমে আবু আইউব গোসল করছিলেন। আবদুল্লাহর উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি মাথাটি বাইরে বের করে দিয়ে তা ঘষতে ঘষতে বলেন, দেখ, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) গোসল করতেন। (বুখারী–১/২৪৮)

হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে 'উকবা ইবন 'আমির আল–জুহানী যখন মিসরের গভর্ণর তখন আবু আইউব দুইবার মিসর ভ্রমণ করেন। প্রথম সফরটি হাদীসের অন্বেষণে। তিনি শুনেছিলেন, 'উকবা রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। 'উকবার মুখ থেকে সেই একটিমাত্র হাদীস শোনার জন্য মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত এত দীর্ঘপথ পাড়ি দেন। মিসর পৌছে তিনি মাসলামা ইবন মাখলাদের বাড়ীতে যান। মাসলামা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বুকে বুক মিলান। আবু আইউব তাঁকে বলেন, 'আমাকে একটু 'উকবার বাড়ীটি দেখিয়ে দাও।' সেখানে পৌছে তিনি 'উকবাকে বলেন, 'একটি কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, আমি ও আপনি ছাড়া তাঁদের আর

কেউ এখন বেঁচে নেই। আচ্ছা, 'সতরুল মুসলিম'— মুসলমানের সতর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) আপনি কী বলতে শুনেছেন?' 'উকবা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন গোপন বিষয় গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।' এতটুকু শুনেই আবু আইউব মদীনার দিকে যাত্রা করেন। বাহনটিকে ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রামও নিলেন না। অতঃপর হাদীসটি তিনি এভাবে বর্ণনা করতেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৮; মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৪/১৫৪)

হযরত আবু আইউবের জ্ঞান আহরণ ও তার প্রচার প্রসারের প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ ছিল যে, মৃত্যু শয্যায়ও তা থেকে বিরত থাকেননি। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন যা আগে কখনও করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে হাদীস দু'টি মানুষের মধ্যে প্রচার করা হয় (মুসনাদে আহমাদ-৫/৪১৪)

হযরত আবু আইউব কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ইবন সাদ বর্ণনা করেনঃ

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে আনসারদের মধ্যে পাঁচ জন কুরআন সংগ্রহ করেন। মা'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদাহ্ ইবন সামিত, উবাই ইবন কা'ব, আবু আইউব ও আবু দারদা। দ্বিতীয় খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান (রা) খলীফাকে লিখলেন ঃ শামের অধিবাসীরা নানা পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করছে। তাদেরকে সঠিকভাবে কুরআন শিক্ষা দিতে পারে এমন কিছু বিজ্ঞ শিক্ষক সেখানে পাঠান। এই চিঠি পেয়ে 'উমার উপরোক্ত পাঁচ জনকে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে বলেন ঃ 'তোমাদের শামবাসী ভাইয়েরা কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়েছে। তোমাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিনজন এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। আর ইচ্ছা করলে তোমরা সবাই অংশগ্রহণ করতে পার।' তাঁরা খলীফার আবেদনে সাড়া দিলেন। তাঁরা বললেন ঃ 'আবু আইউব বয়সের ভারে দুর্বল, আর উবাই ইবন কা'ব রোগগ্রস্ত।' অতঃপর বাকী তিনজন যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৫)

হযরত আবু আইউব থেকে দেড়শো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।। তবে 'জালা' আল-কুলূব'-এর গ্রন্থকার তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২১০টি বলে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে পাঁচটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ'-এর ৫ম খন্ডে ৪১২ থেকে ৪২৩ পৃষ্ঠায় ১১২টি এবং ১১৩-১১৪ পৃষ্ঠায় তাঁর বর্ণিত আরও কিছু হাদীস সংকলন করেছেন। [দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)-১/৭৪৫]

হযরত আবু আইউবের চরিত্রে তিনটি বৈশিষ্ট বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। ১. রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসা, ২. ঈমানী তেজ ও উদ্দীপনা, ৩. সত্য ভাষণ। রাসূলুল্লাহকে (সা) এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন যে, তাঁর ওফাতের পর রওজা পাকের কাছে গিয়ে পড়ে থাকতেন।

তাঁর ঈমানী তেজ ও দৃঢ়তার প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত কোন

একটি যুদ্ধেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। আর জীবনের শেষ প্রান্তে আশি বছর বয়সেও মিসরের পথে রোম সাগর পাড়ি দিয়ে .ইস্তাম্বুলের নগর প্রাচীরের সন্নিকটে ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য গমন করেন।

আর ব্যক্তি বা রাষ্ট্র– কারও ভয়েই তিনি সত্য কথা বলা থেকে কখনও বিরত থাকেননি। একবার মিসরের গভর্ণর 'উকবা ইবন 'আমির আল–জুহানী–যিনি একজন সাহাবী, কোন কারণবশতঃ মাগরিবের নামায পড়াতে একটু বিলম্ব করলেন। আবু আইউব উঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন 'মা হাজিহিস সালাতু ইয়া উকবা'– উকবা এটা কেমন নামায? উকবা বললেন, একটি কাজে আটকে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে। আবু আইউব বললেন ঃ 'আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, আপনার এই কাজের দ্বারা মানুষের ধারণা হবে রাসূলুল্লাহ (সা) এই সময় নামায় আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের নামায তাড়তাড়ি আদায়ের জন্য তিনি কত তাকীদ দিয়েছেন।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪১৭)

ইসলামী বিধি–বিধান তিনি নিজে যেমন পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতেন তেমনি অন্যদের নিকট থেকেও অনুরূপ অনুসরণ আশা করতেন। কারও মধ্যে সামান্য বিচ্যুতি লক্ষ্য করলেও তা সংশোধন করে দিতেন। একবার হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ছেলে আবদুর রহমান কোন এক যুদ্ধে চারজন বন্দীকে হাত–পা বেঁধে হত্যা করেন। এ কথা আবু আইউব জানতে পেরে তাঁকে বলেন, 'পশুর মত এভাবে হত্যা করা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। আমি তো এভাবে একটি মুরগীও জবেহ করা পছন্দ করিনে।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪২২)

রোমানদের সাথে যুদ্ধের সময় জাহাজে একজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে বহু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী ছিল। একদিন আবু আইউব দেখতে পেলো একজন মহিলা কয়েদী বড় ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। তিনি মহিলাটির এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, 'তার সন্তান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।' আবু আইউব ছেলেটির হাত ধরে মহিলার হাতে তুলে দেন। অফিসার আবু আইউবের বিরুদ্ধে কমান্ডারের নিকট অভিযোগ করেন। কমান্ডারের প্রশ্নের জবাবে আবু আইউব বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।' (মুসানাদে আহমাদ–৫/৪১২)

তিনি সিরিয়া ও মিসরে গেলেন। দেখলেন, সেখানকার পায়খানাসমূহ কিবলামুখী করে তৈরী করা। তিনি বার বার শুধু বলতে লাগলেন, 'কী বলবো? এখানে পায়খানা কিবলামুখী করে তৈরী করা, অথচ রাসূল (সা) এমনটি করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪১২)

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার বলেন ঃ 'আমার পিতার (আবদুল্লাহ ইবন 'উমার) জীবদ্দশায় একবার আমাদের বাড়ীতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হল। আমার পিতা অন্যদের সাথে আবু আইউবকেও দাওয়াত দিলেন। সুন্দর সুন্দর সবুজ চাদর দিয়ে আমাদের বাড়ীর দেওয়াল ঢেকে দেওয়া হল। আবু আইউব এসেই মাথা উঁচু করে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ, তোমরা

দেওয়াল ঢেকে দিয়েছ?' সালেম বলেন ঃ আমার পিতা লজ্জিত হয়ে জবাব দিলেন, 'আবু আইউব, মহিলারা আমাদেরকে কাবু করে ফেলেছে।' আবু আইউব বললেন ঃ 'সবার ব্যাপারে এ আশংকা আমার আছে। তবে তোমার ব্যাপারে এমন আশংকা ছিলনা। আমি তোমার বাড়ীতে ঢুকবো না, আহারও করবো না।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৩০৫)

হযরত আবু আইউব যে কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইফ্‌ক-এর ঘটনায়। এই ইফ্‌ক বা হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠু। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন ঃ আবু আইউব, 'আয়িশার সম্পর্কে লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা কি তুমি শুনেছ?' বললেন ঃ 'হাঁ, শুনেছি। তাহা মিথ্যে কথা।, উম্মু আইউব, তুমি কি এমন কাজ করতে পার?' বললেন ঃ আল্লাহর কসম! এমন কাজ আমি কক্ষণও করতে পারিনে।' আবু আইউব বললেন ঃ 'তাহলে 'আয়িশা- যিনি তোমার চেয়েও উত্তম, তিনি কিভাবে করতে পারেন?' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩০২)

কনস্ট্যান্টিনোপল যুদ্ধের সময় একদিন একদল মুসলিম সৈনিক তাদের জাহাজে আবু আইউবকে খাবারের দা'ওয়াত দিল। তিনি হাজির হলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছ; অথচ আজ আমি রোযা রেখেছি। তোমাদের দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ একজন মুসলমানের ওপর তার অন্য এক মুসলিম ভাইয়ের ছয়টি অধিকার আছে। তার কোন একটি ছেড়ে দিলে একটি অধিকার ছেড়ে দেওয়া হবে। ১. দেখা হলে তাকে সালাম দিতে হবে। ২. দাওয়াত দিলে সাড়া দিতে হবে। ৩. হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে জবাব দিতে হবে। ৪. অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে। ৫. মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হতে হবে। ৬. কোন ব্যাপারে উপদেশ চাইলে উপদেশ দিতে হবে।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৫)

হযরত আবু আইউব ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। কুয়োর ধারে গোসলের সময়েও চারিদিকে কাপড় টানিয়ে ঘিরে নিতেন। (বুখারী-১,২৪৮)

কাফির মুনাফিকদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এ কঠোরতা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে সময় মদীনার মুনাফিকরা (কপট) মসজিদে আসতো, মুসলমানদের নানা কথা কান পেতে শুনতো। বাইরে গিয়ে তারা মুসলমানদের দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। একদিন কতিপয় মুনাফিক মসজিদে নববীতে একত্রিত হল। তারা যখন পরস্পর গায়ে গা মিশিয়ে নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে, ঠিক সেই সময় রাসূল (সা) তাদেরকে দেখে ফেলেন। তিনি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে আবু আইউব ছুটে গিয়ে 'আমর ইবন কায়েসের একটি ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি তার ঠ্যাং ধরে টানছেন আর সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে ঃ আবু আইউব, তুমি এভাবে আমাকে বনী-সা'লাবের মিরবাদ (খোঁয়াড়) থেকে বের করে দিচ্ছ? (মসজিদের স্থানে পূর্বে উট-বকরীর খোঁয়াড় ছিল) তারপর আবু আইউব রাফে ইবন ওয়াদীয়ার দিকে

ধেয়ে যান এবং তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে টানতে টানতে ও লাথি–চড় মারতে মারতে মসজিদ থেকে বের করে দেন। আবু আইউব টানছেন আর মুখে বলছেন ঃ 'পাপাত্মা মুনাফিক দূর হ। যে পথে এসেছিস সেই পথে চলে যা।' (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫২৮)

হযরত আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) আশ্রয় দেন এবং প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করেন তাতে নবী–খান্দানের লোকদের নিকট বিশেষভাবে, আর সাধারণভাবে সকল মুসলমানের নিকট তাঁরা এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন, হযরত আলীর খিলাফতকালে হযরত ইবন 'আববাস (রা) যখন বসরার গভর্ণর তখন একবার আবু আইউব গেলেন সেখানে। ইবন 'আববাস তাঁকে বললেন, 'আমার ইচ্ছা, যেভাবে আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য ঘর খালি করে দিয়েছিলেন, আজ আমিও তেমনিভাবে আপনার জন্য ঘর খালি করে দিই।' একথা বলে তিনি পরিবারের সকল সদস্যকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে সকল সাজ সরঞ্জামসহ বাড়ীটি তাঁর থাকার জন্য ছেড়ে দেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪০৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর সাহাবা–ই–কিরামের পূর্ববর্তী সেবা ও আত্মত্যাগ অনুযায়ী প্রত্যেকের ভাতা নির্ধারিত হয়। আবু আইউবের ভাতা প্রথমে ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম নির্ধারিত হয়। হযরত আলী তা বাড়িয়ে বিশ হাজার করেন। তাঁর ভূমি চাষাবাদের জন্য প্রথমে ৮ (আট) টি দাস নিযুক্ত ছিল, হযরত আলী (রা) তা চল্লিশ জনে উন্নীত করেন।

হযরত আবু আইউবের ভাগ্যবতী স্ত্রীর নাম উম্মু হাসান বিনতু যায়িদ। অভিজাত আনসারী মহিলা। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে, তাঁর গর্ভে একমাত্র ছেলে 'আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

যদিও হযরত আবু আইউবের (রা) জীবন যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে এবং তরবারি কাঁধ থেকে নামিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাননি, তথাপি সে জীবন ছিল প্রভাতের মৃদুমন্দ শীতল বায়ুর ন্যায় প্রশান্ত। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিলেন ঃ

"তুমি যখন নামায আদায় করবে, তা যে শেষবারের মত আদায় করছো, এমনভাবে করবে। এমন কথা কক্ষণও বলবে না যার জন্য পরে কৈফিয়াত দিতে হয়। মানুষের হাতে যা আছে তা পাওয়ার আশা কক্ষণও করবে না।"

কোন ঝগড়া–বিবাদে কক্ষণও তাঁর জিহবা অসংযত হয়নি। কোন লালসা তাঁর অন্তরকে কক্ষণও কাবু করতে পারেনি। একজন 'আবেদের মত, দুনিয়া থেকে এই মুহূর্তে একজন বিদায় গ্রহণকারীর মত সারাটি জীবন তিনি অতিবাহিত করে গেছেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪০৮)

সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা)

আসল নাম সা'দ, ডাকনাম আবু 'আমর, লকব বা উপাধি সায়্যিদুল আউস। মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। পিতার নাম মু'য়াজ ইবন নু'মান, মাতা কাবশা মতান্তরে কুবাইশা 'বিনতু রাফি'। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরীর চাচাতো বোন। জাহিলী যুগেই পিতা মু'য়াজের মৃত্যু হয়। তবে মাতা কাবশা হিজরাতের পরে ঈমান আনেন এবং সা'দের ইনতিকালের পরেও বহু দিন জীবিত ছিলেন। গোটা আউস গোত্রের মধ্যে আবদুল আশহাল শাখাটি ছিল সর্বাধিক অভিজাত এবং বংশানুক্রমে নেতৃত্ব ছিল তাদেরই হাতে। সা'দ ছিলেন তাঁর সময়ে একজন বড় মাপের নেতা। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২, উসুদুল গাবা-২/২৯৬, তাবাকাত-৩/৪২০, তাহজীবুত তাহজীর-৩/৪৮১) তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আকাবার প্রথম বাইয়াতের পর থেকে যদিও মদীনায় ইসলামের প্রভাব পড়তে থাকে তবে তা প্রকৃতপক্ষে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত ছিল। আকাবার শপথের পর মদীনাবাসীদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুস'য়াবকে দা'ঈ-ই-ইসলামের (আহবানকারী) দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় পাঠান। ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন সফল দা'ঈ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি নিরলস চেষ্টার মাধ্যমে মদীনার প্রতিটি লোকের কানে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেন। হযরত মুস'য়াব মদীনায় এসে যখন ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন সা'দ ইবন মু'য়াজ একজন চরম অস্বীকারকারী। তাঁর এ অবস্থা বেশী দিন থাকেনি। অনতিবিলম্বে তিনিও মুস'য়াবের দা'ওয়াতে সাড়া দেন। ইবন ইসহাক তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

একদিন আস'য়াদ ইবন যুরারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রেরিত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সংগে করে দা' ওয়াতী কাজে বনী আবদুল আশহাল ও বনী জাফার গোত্রে গেলেন। তাঁরা ' মারাক' নামক একটি কূয়োর ধারে দেওয়ালের ওপর বসলেন। আর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু লোক তাঁদের পাশে জড় হলেন। সা'দ ইবন মুয়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর উভয়ই তখন বনী আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা। তখনও তাঁরা মুশ্‌রিক বা পৌত্তলিক। উল্লেখ্য যে, সা'দ ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারার খালাতো ভাই। যাই হোক, খবরটি সা'দ ও উসাইদের কানে গেল। সাথে সাথে সা'দ উসাইদকে বললেনঃ 'তোমার বাপের সর্বনাশ হোক! তুমি এখনই এ দু'জন লোকের কাছে যাও। তারা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে আমাদের বাড়ীর ওপর চড়াও হয়েছে। তাদের তাড়িয়ে দাও, এপথ মাড়াতে নিষেধ কর। যদি ঐ দ্বিতীয় লোকটির সাথে আমার খালাতো ভাই আস'য়াদ ইবন যুরারা না থাকতো তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না, আমি নিজেই যেতাম। তার সামনে আমার যাওয়া শোভন হবে না। 'উসাইদ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁদের নিকট গেলেন। উল্টো ফল ফললো। তাড়াতে গিয়ে নিজেই তাঁদের কথায় প্রভাবিত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। তিনি

মুস'য়াব ও আস'য়াদকে বললেন ঃ 'আমি পিছনে এমন এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি, যদি তিনি তোমাদের কথা শোনেন তাহলে গোত্রের একটি লোকও তোমাদের থেকে দূরে থাকবে না। আমি এখনই সা'দ ইবন মু'য়াজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি নিজ গোত্রের দিকে ফিরে চললেন। সা'দ তখন গোত্রীয় এক আড্ডায় বসা। উসাইদকে ফিরে আসতে দেখে তিনি মন্তব্য করলেনঃ 'আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, উসাইদ যে চেহারায় গিয়েছিল তার থেকে ভিন্ন এক চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরছে।' উসাইদ কাছাকাছি এসে পৌঁছালে সা'দ জিজ্ঞেস করলেনঃ কী করেছ? উসাইদ জবাব দিলেনঃ

আমি তাদের দু'জনের সাথে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে তেমন খারাপ কিছু দেখিনি। তবুও তাদেরকে এখানে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। তারাও বলেছে, তোমরা যা ভালো মনে কর, তাই হবে। তবে আমি শুনেছি, বনী হারিছার লোকেরা আস'য়াদ ইবন যুরারাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তো একথা জানে, আস'য়াদ তোমার খালাতো ভাই।'

সা'দ সাথে সাথে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং বর্শাটি হাতে তুলে নিয়ে তাঁদের দুজনের দিকে ছুটলেন। নিকটে পৌঁছে যখন তিনি দেখলেন, তাঁরা অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে বসে আছেন তখন তিনি বুঝলেন, উসাইদ তাঁকে ধোকা দিয়ে তাঁদের কথা শুনাতে চেয়েছে। তিনি তাঁদের দু'জনকে গালাগালি করতে করতে আস'য়াদকে বললেনঃ 'শোন আবূ উসামা! তোমার ও আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকতো তাহলে আমি এত কথা বলতাম না। আমরা যা পছন্দ করিনে তাই তুমি আমাদের বাড়ীর ওপর এসে করে যাচ্ছ।' এ দিকে সা'দকে আসতে দেখে আস'য়াদ, মুসয়াবকে বলেছিলেনঃ 'মুস'য়াব! আপনার নিকট একজন গোত্র নেতা আসছেন। এব্যক্তি যদি আপনার কথা মেনে নেন তাহলে গোত্রের দু'ব্যক্তিও আপনার থেকে দূরে থাকতে পারবে না।'

মুস'য়াব অত্যন্ত নরম মিযাজে সা'দকে বললেনঃ 'আপনি কি একটু বসে আমার কথা শুনবেন? আমার কথা পসন্দ হলে, ভালো লাগলে, মানবেন। আর পসন্দ না হলে, খারাপ লাগলে আমরা চলে যাব।' সা'দ বললেনঃ ' এ তো খুব ইনসাফের কথা।' তিনি মাটিতে বর্শাটি গেঁড়ে বসে পড়লেন। মুস'য়াব অত্যন্ত ধীর– স্থিরভাবে তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন, তাঁকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন। মুস'য়াব ও আস'য়াদ দু'জনেই বর্ণনা করেছেনঃ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর সা'দ কোন কথা বলার পূর্বেই আমরা তাঁর চেহারায় ইসলামের দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলাম। ইসলামের দা'ওয়াত শোনার পর সা'দ তাঁদের কাছে জানতে চান? 'তোমাদের এই ইসলাম, এই দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে কি কি কাজ করতে হয়?' তাঁরা বললেন, 'গোসল করে পবিত্র হতে হয়, পোশাক পরিচ্ছন্ন করতে হয়, তারপর কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে দু'রাকা'য়াত সালাত আদায় করতে হয়।' সা'দ তাই করলেন। তারপর বর্শাটি হাতে তুলে নিয়ে উসাইদের সাথে গোত্রীয় আড্ডার দিকে রওয়ানা দিলেন।

তাঁদেরকে ফিরতে দেখে গোত্রীয় লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো ঃ 'সা'দ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলেন এখন তাঁর সেই চেহারা নেই। তাঁকে ভিন্ন এক চেহারায় দেখা যাচ্ছে।' সা'দ নিকটে এসে গোত্রীয় লোকদের বললেনঃ 'ওহে আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা! বিভিন্ন ব্যাপারে তোমরা আমার কাজ–কর্ম কেমন দেখে থাক?' তাঁরা সমস্বরে জবাব দিলঃ 'আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মতামতের অধিকারী ব্যক্তি এবং আমাদের বিশ্বস্ত

নাকীব বা দায়িত্বশীল।' সা'দ বললেনঃ তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনবে তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম।'

আস'য়াদ ও মুস'য়াব বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! সা'দের এই ঘোষণার পর সন্ধ্যা হতে না হতে বনী আবদুল আশহালের সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সা'দের ইসলাম গ্রহণের পর আস'য়াদ ও মুস'য়াব তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে সেখানে এমন কোন বাড়ী বা গোত্র ছিল না যেখানে দুই/একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরপর সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর দুইজন মিলে বনী আবদুল আশহালের মূর্তিগুলি ভাংতে শুরু করেন। (দ্রঃ তাবাকাত-৩/৪২০, ৪২১; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৫, ৪৩৭,৪৭৯; আল-বিদায়া-৩/১৫২; উসুদুল গাবা-৩/২৯৬; হায়াতুস সাহাবা-১/১৮৭-১৯০)

মদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হযরত সা'দের অবদান ছিল অনন্য। এই গৌরবে অন্য কোন সাহাবী তাঁর জুড়ি নেই। কারণ, একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে গোটা গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুধু তাঁর ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই কারণে রাসূল (সা) বলেছেনঃ'আনসারদের সর্বোত্তম গৃহ বনু নাজ্জার। তারপর আবদুল আশহালের স্থান।' হযরত সা'দ ও তাঁর গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার মধ্যবর্তী সময়ে।

ইবন 'আসাকির বুখারী ও কালবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করার পর কুরাইশরা তাঁর কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছে না। তাঁরা কা'বার পাশে তাদের পরামর্শ গৃহে বসে আছে। এমন সময় তারা জাবালে আবূ কুবায়সের দিক থেকে একটি কবিতা আবৃত্তির কণ্ঠ শুনতে পেল। তার কিয়দাংশ নিম্নরূপঃ

'দুই সা'দ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিরুদ্ধবাদীদের ভয় থেকে মুহাম্মাদ নিরাপদ হয়ে যাবে। ওহে আউসের সা'দ, ওহে খাযরাজের সা'দ! তোমরা মুহাম্মাদের রক্ষক হয়ে যাও।' -এরূপ আরো কয়েকটি পংক্তি।

এই কবিতা শুনে কুরাইশরা বুঝতে পারে, আউস ও খাযরাজ গোত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্যকারী দু'সা'দ হলেন- সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদা। (তাহজীবে ইবন 'আসাকির-৬/৮৯)

ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর সা'দ 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা উমায়্যা ইবন খালাফ ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সা'দ তার বাড়ীতে উঠলেন। উময়্যাও মদীনায় এলে সা'দের বাড়ীতে উঠতো। তিনি উমায়্যাকে বললেন, হারাম শরীফ (কা'বার আশপাশ) যখন জনশূন্য হয় তখন আমাকে বলবে। দুপুর বেলা উমায়্যা তাঁকে সংগে করে হারামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথে আবূ জাহলের সাথে দেখা। সে উমায়্যাকে জিজ্ঞেস করলোঃ এ ব্যক্তি কে?

উমায়্যাঃ সা'দ ইবন মু'য়াজ।

আবূ জাহলঃ এ তো খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি একজন ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে মক্কায় দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি তাঁর সাথে না থাকলে তাঁর বাড়ী ফেরা কঠিন হতো।

উল্লেখ্য যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করতো কাফিররা তাদের ধর্মত্যাগী বলতো। হযরত সা'দ সাথে সাথে আবূ জাহলের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। বললেনঃ তুমি আমাকে বাধা দিয়েই দেখনা কেমন হয়। আমি তোমার মদীনার রাস্তা বন্ধ করে দেব।

উমায়্যা বললোঃ সা'দ! আবুল হাকাম (আবূ জাহল) মক্কার একজন বিশিষ্ট নেতা। তার সামনে নিচু স্বরে কথা বল।

সা'দ বললেনঃ চলো যাই। আমি রাসূলের (সা) নিকট শুনেছি, মুসলমানরা তোমাদেরকে হত্যা করবে। আবূ জাহল প্রশ্ন করলোঃ তারা কি মক্কায় এসে হত্যা করবে? সা'দ বললেনঃ তা আমার জানা নেই।

হিজরী ২য় সনের রাবীউল আওয়াল মাসে রাসূল (সা) কুরাইশ নেতা উমায়্যা ইবন খালাফের নেতৃত্বাধীন এক'শ লোকের একটি কাফিলার সন্ধানে বের হন। ইতিহাসে এটা 'বাওয়াত' অভিযান নামে খ্যাত। একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে সা'দ ইবন মু'য়াজকে মদীনায় রেখে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৭)

হযরত রাসূলে কারীম (সা), আবূ 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ মতান্তরে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (তাবাকাত-৩/৪২১; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৫)

হিজরী ২য় সনে 'বাওয়াত' অভিযানের পর ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ আসন্ন। হযরত সা'দের ভবিষ্যদ্বানী সত্যে পরিণত হওয়ার সময় সমাগত। মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য তোড়জোড় শুরু করলো। খবর পেয়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বদরের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে কুরাইশ বাহিনীর সর্বশেষ গতিবিধি অবগত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শে বসেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে আবূ বকর, 'উমার, মিকদাদ (রা) প্রমুখ সাহাবী নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর রাসূল (সা) আনসারদের লক্ষ্য করে বলেনঃ 'ওহে লোকেরা, আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।' সাথে সাথে সা'দ ইবন মু'য়াজ উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবতঃ আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন?' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হা। 'সা'দ বললেনঃ 'আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যবাদী বলে জেনেছি, আর আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, যা কিছু আপনি নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। আপনার কথা শোনার ও আপনার আনুগত্য করার আমরা অঙ্গিকার করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যা ইচ্ছা আপনি করুন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার নামে শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। যদি আপনি আমাদেরকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে থাকবে না। আগামী কালই আপনি আমাদেরকে নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হোন, আমরা তাতে ক্ষুণ্ন হবো না। যুদ্ধে আমরা দারুন ধৈর্যশীল, শত্রুর মুকাবিলায় পরম সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন আচরণ প্রত্যক্ষ করাবেন যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমাদের সাথে নিয়ে আপনি অগ্রসর হোন।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমরা তাদের মত হবো না যারা মূসাকে (আ) বলেছিল, আপনিও আপনার রব যান এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করুন। আর আমরা এখানে বসে থাকি। বরং আমরা বলি, আপনি ও আপনার রব যান, আমরা আপনাদের অনুসরণ করবো। হতে পারে এক উদ্দেশ্যে আপনি বেরিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহ আর একটি করলেন। দেখুন, আল্লাহ আপনার দ্বারা কি করান।' ঐতিহাসিকরা বলেছেন, আল্লাহ

সা'দের এই কথার সমর্থনে সূরা আনফালের ৫ নং আয়াতটি নাযিল করেন। সা'দের উপরোক্ত ভাষণে রাসূল (সা) ভীষণ খুশী হন। সৈন্য মোতায়েনের সময় তিনি আউস গোত্রের ঝান্ডাটি সা'দের হাতে তুলে দেন। অন্যএকটি বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে গোটা আনসার সম্প্রদায়ের পতাকা ছিল সা'দের হাতে। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬১৩, ৬১৫; উসুদুল গাবা-২/২৯৯; তাবাকাত-৩/৪২১; আল-বিদায়া-৩/২৬২; হায়াতুস সাহাবা-১/৪১৫)

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সা'দ ইবন মু'য়াজ বললেনঃ 'ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমরা আপনার জন্য একটি 'আরীশ' বা তাঁবু স্থাপন করে একটি বাহিনী মোতায়েন রাখিনা কেন? আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব। তাতে যদি আল্লাহ আমাদের সম্মান দান করেন, আমরা বিজয়ী হই, তাহলে তো আমাদের আশা পূর্ণ হলো। আর যদি এর বিপরীত কিছু ঘটে তাহলে আপনি এই বাহিনী সহ আমাদের পিছনে ছেড়ে আসা লোকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। হে আল্লাহর নবী! আমাদের যে সব লোক মদীনায় পিছনে রয়ে গেছে, আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা তাদের থেকে একটুও বেশী নয়। যদি তারা বুঝতে পারতো আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন, তবে তারা এভাবে পিছনে পড়ে থাকতো না। আল্লাহ তাদের দ্বারা আপনার হিফাজত করবেন। তারা আপনাকে সৎ উপদেশ দান করবে এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।' এই বক্তব্যের জন্য রাসূল (সা) সা'দের প্রশংসা করে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রণক্ষেত্রের অদূরে একটি 'আরীশ' নির্মিত হয় এবং তিনি সেখান থেকে বদর যুদ্ধ পরিচালনা করেন। (আল-বিদায়া-৩/২৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২০)

এই বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী যখন পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে তখন মুসলিম মুজাহিদরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ধরে বন্দী করতে শুরু করে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন 'আরীশে' অবস্থান করছেন। তাঁর ওপর অকস্মাৎ পাল্টা আক্রমণ হতে পারে, এমন এক আশঙ্কায় সা'দ ইবন মু'য়াজ আরো কিছু আনসারী মুজাহিদকে সংগে নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে 'আরীশের' দরযায় পাহারায় নিয়োজিত হন। রাসূল (সা) সা'দের চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করে বলেনঃ সা'দ! মনে হচ্ছে লোকদের কাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না। সা'দ বললেনঃ হাঁ। পৌত্তলিকদের সাথে এটা আমাদের প্রথম সংঘাত। তাদের পুরুষদের জীবিত রাখার চেয়ে হত্যা করাই আমার পছন্দ। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২৮) একটি বর্ণনা মতে, এ যুদ্ধে তিনি 'আমর ইবন 'উবাইদুল্লাহকে হত্যা করেন। এতে তাঁর একটি দাসও যোগদান করে। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৭, ৪৭৯)

উহুদ যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থলের পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। সূচনাতেই রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছা ছিল মদীনার ভেতর থেকেই কাফিরদের প্রতিরোধ করার। মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূলেরও ছিল একই ইচ্ছা। কিন্তু কিছু নওজোয়ান মুজাহিদ যাঁরা ছিলেন শাহাদাত লাভের চরম অভিলাষী, তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য জিদ ধরে বসেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই রাসূল (সা) তাঁদের মতামত মেনে নেন এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য অন্দর মহলে প্রবেশ করেন। সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর তখন বললেনঃ তোমরা রাসূলকে (সা) মদীনার বাইরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছ; অথচ তাঁর ওপর আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়। তোমাদের উচিত, তোমাদের মতামত প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং বিষয়টি

সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ছেড়ে দেওয়া। এদিকে রাসূল (সা) যখন তরবারি, ঢাল, বর্ম ইত্যাদি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন সবাই অনুতপ্ত হলেন। একযোগে তাঁরা বললেন, আপনার বিরুদ্ধাচারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনার নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। রাসূল (সা) বললেনঃ এখন আমার করার কিছুই নেই। কারণ একজন নবী অস্ত্র সজ্জিত হলে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার কোন অবকাশ থাকে না। (তাবাকাত–২/২৬)

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা পিছু হটে গেল। দারুন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। এ সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) অটল ও দৃঢ় থাকেন। অন্য যে পনেরো ব্যক্তি রাসূলের (সা) পাশে অটল থাকেন তাঁদের একজন সা'দ ইবন মু'য়াজ। এই উহুদে তাঁর ভাই 'আমর ইবন মু'য়াজ শাহাদাত বরণ করেন। (তাবাকাত–২/৩০; আনসাবুল আশরাফ–১/৩১৮, ৩২৯)।

উহুদ যুদ্ধের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন আনসারদের বনী আবদুল আশহাল ও জুফার গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, ঐ গোত্রদ্বয়ের মেয়েরা উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত তাদের লোকদের জন্য কান্নাকাটি ও মাতম করছে। দয়ার নবীর দু'টি চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনিও কাঁদলেন। তারপর বললেন ঃ 'কিন্তু 'হামযার' জন্য কাঁদার তো কেউ নেই।' সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর নিজ গোত্র বনী আবদুল আশহালে ফিরে যখন একথা শুনলেন তখন তাঁরা তাঁদের গোত্রের মহিলাদের নির্দেশ দিলেনঃ 'তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে যাও এবং তাঁর চাচা হামযার জন্য শোক ও মাতম কর।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৯৯)

মদীনার ইহুদী গোত্র বনী কুরায়জার নেতা কা'ব ইবন আসাদ তার গোত্রের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। খন্দক যুদ্ধের সময় সে বনী নাদার গোত্রের নেতা হুয়ায় ইবন আখতাবের কুপরামর্শ ও উস্কানিতে সেই চুক্তি ভেঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। একথা রাসূলুল্লাহ (সা) সহ মুসলমানদের কানে গেল। রাসূল (সা) ঘটনার যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য আউস গোত্রের পক্ষ থেকে সা'দ ইবন মু'য়াজ ও খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে সা'দ ইবন 'উবাদাকে পাঠান। তাদের সাথে আরও যান আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও খাওয়াত ইবন জুবায়র। তাঁরা বনী কুরায়জায় যান এবং তাদের সাথে আলোচনা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি সত্য। তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁদের তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পেশ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২১)

হযরত সা'দের দৃঢ়তার বহু কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এমন একটি ঘটনা বালাজুরী ও ইবনুল আসীর বর্ণনা করেছেন। গাতফান গোত্রের নেতা আল–হারেস ইবন আউফ ও 'উয়ায়না ইবন হিসনের সাথে রাসূল (সা) এ শর্তে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে মদীনার প্রতি কোন প্রকার হুমকী থাকবে না এবং বিনিময়ে তারা মদীনায় উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। এর মধ্যে হিঃ ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের ডামাডোলে মদীনায় দারুণ অভাব দেখা দিল। রাসূলে কারীম (সা) এ সন্ধির ব্যাপারে সা'দ ইবন মু'য়াজ ও

সা'দ ইবন 'উবাদার সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা দু'জন বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! এ যদি আপনার পসন্দ হয়, আমরা তা পালন করবো। যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তা হলে তো অবশ্যই পালনীয়। তবে কি এটা আমাদের কথা চিন্তা করে করছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যা, তোমাদের কথা চিন্তা করেই করছি। আমি দেখেছি, গোটা আরব এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। আমি চেয়েছি, অন্ততঃ এর বিনিময়ে তাদের শত্রুতা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকুক।' একথা শুনে সা'দ ইবন মু'য়াজ বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা ও আমরা ছিলাম এক সাথে পৌত্তলিক। আমরা কেউ আল্লাহর ইবাদাত করতাম না, তাঁকে জানতামও না। তখনও তারা ব্যবসা উপলক্ষে এবং অতিথি হিসেবে ছাড়া আমাদের একটি খেজুরও খাওয়ার আশা করেনি। আজ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আল্লাহ ইসলাম ও আপনার দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর এখন কিনা আমাদের সম্পদের একটি অংশ তাদেরকে দিতে হবে? এমন সন্ধির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা না করা পর্যন্ত শুধু তরবারি ছাড়া আর কিছুই আমরা তাদেরকে দিব না।' রাসূল (সা) তাঁর কথা মেনে নিলেন। (আল-বিদায়া-৪/১০৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৬,৩৪৭)

যুদ্ধ শুরুর সময় প্রায় কাছাকাছি। সা'দ বর্ম পরে হাতে বর্শা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছেন। পথে বনী হারেছার দুর্গে তাঁর মা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) পাশে বসে ছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর ছেলে একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে চলেছে। তার একটি পংক্তি এমন ঃ 'যখন আজল এসে যায় তখন আর মৃত্যুর জন্য আপত্তি কিসের।'

মা চেঁচিয়ে বললেন ঃ 'ছেলে! তুমি তো পিছনে পড়ে গেছ, তাড়াতাড়ি যাও।' সা'দের যে হাতে বর্শা ছিল সেই হাতটি বর্মের বাইরে বেরিয়ে ছিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে হযরত আয়িশা বললেন ঃ 'সা'দের মা! দেখ, তার বর্মটি কত ছোট।' যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছার সাথে সাথে তাঁকে লক্ষ্য করে হিববান ইবন 'আবদি মান্নাফ একটি তীর ছোঁড়ে। কোন কোন বর্ণনায় হিববানের পরিবর্তে আবু উসামা অথবা খাফাজা ইবন 'আসিমের নাম এসেছে। তীরটি তাঁর হাতে লেগে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে। খুশীর চোটে হিব্বান বলে ওঠে 'আমি 'আরিকার পুত্র।' একথা শুনে রাসূল (সা), মতান্তরে সা'দ বলে ওঠেন ঃ 'দোযখের মধ্যে আল্লাহ তোমার মুখমন্ডল ঘামে নিমজ্জিত করুন।' উল্লেখ্য যে, 'আরাকার অর্থ ঘাম। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম ঃ ২/২২৬-২২৮; উসুদুল গাবা-২/২৯৬)

সেকালে মসজিদে নববীতে যুদ্ধে আহতদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য একটি শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই শিবিরের প্রতিষ্ঠা হয় উহুদ যুদ্ধের পর এবং তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরার নিকটে। আসলাম গোত্রের 'রুফাইদা' নাম্নী এক সেবা পরায়না সৎকর্মশীলা মহিলা ছিলেন এই শিবিরের একজন সেবিকা। তিনি আহতদের সেবা ও চিকিৎসা করতেন। রোগীর সেবা ও ক্ষত চিকিৎসায় তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। খন্দক যুদ্ধে সা'দ ইবন মু'য়াজ আহত হলে রাসূল (সা) নির্দেশ দেন ঃ 'তোমরা সা'দকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ। তাহলে আমি নিকট থেকেই তার দেখাশুনা করতে পারবো।' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩৯; উসুদুল গাবা-২/২৯৭; দায়িরা-ই-মা'রিফ-ইসলামিয়্যা, উর্দু-১১/৩৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতিদিন এই শিবিরে এসে অসুস্থ সা'দের দেখাশুনা করতেন। তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন, তাই আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন ঃ 'হে

আল্লাহ! কুরাইশদের সাথে এ সংঘাত যদি এখনও অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তাদের সাথে লড়াই করার আমার খুব সাধ। কারণ, আপনার রাসূলকে তারা কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং মাতৃভূমি মক্কা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর যদি সংঘাত শেষ হওয়ার সময় হয়ে থাকে তাহলে এই ক্ষতের দ্বারাই আমাকে শাহাদাত দান করুন। আর বনী কুরায়জার ব্যাপারে আমার চোখে প্রশান্তি না আসা পর্যন্ত আমার মরণ দিও না।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২৭; উসুদুল গাবা–২/২৯৬; বুখারী–২/৫৯১) আল্লাহ পাক তাঁর দু'আর শেষ কথাটি কবুল করেন।

খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ ও তাদের মিত্র বাহিনীর পশ্চাদাপসরণের পর রাসূল (সা) মদীনার যাবতীয় ফাসাদের উৎস ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জাকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তারা চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই বনী কুরায়জার সাথে প্রাচীনকাল থেকে মদীনার আউস গোত্রের মৈত্রী চুক্তি ছিল। রাসূল (সা) যখন তাদেরকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আউস গোত্রের লোকেরা বললো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিপক্ষ খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে তারা ছিল আমাদের মিত্র। এর আগে আপনি আমাদের ভাই খাযরাজীদের মিত্র গোত্র বনী কায়নুকা'র বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা তো আপনার জানা আছে।' মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুলও একই রকম কথা বললো। আসলে তারা রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে বনী কুরায়জার ব্যাপারে কোন কঠিন দন্ডের আশংকা করছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'ওহে আউস গোত্রের লোকেরা! তোমাদের গোত্রের কেউ একজন তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিলে তোমরা কি তাতে খুশী হবে?' তারা বললো ঃ হাঁ, খুশী হবো।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তাদের ব্যাপারে সা'দ ইবন মু'য়াজ রায় দেবে।'

বনী কুরায়জার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য রাসূল (সা) এভাবে সা'দ ইবন মু'য়াজকে বিচারক নিয়োগ করলেন। সা'দ তো তখন আহত অবস্থায় দারুণ অসুস্থ। আউস গোত্রের লোকেরা উটের পিঠে গদি বসিয়ে তার ওপর সা'দকে উঠিয়ে রাসূলের (সা) নিকট নিয়ে গেল। তারা সা'দকে বললো ঃ 'আবু 'আমর! আপনার মিত্রদের সাথে একটু ভালো আচরণ করবেন। সম্ভবতঃ এ জন্যই রাসূল (সা) আপনাকে বিচারক মনোনীত করেছেন।' তারা বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করলে সা'দ বললেন ঃ 'আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার বিন্দুমাত্র পরোয়া সা'দের নেই।' সা'দ যখন রাসূলের (সা) নিকট পৌছুলেন তখন রাসূল (সা) আশেপাশে বসা আনসার ও মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'কু মু ইলা সায়্যিদিকুম– তোমাদের নেতার সম্মানার্থে তোমরা উঠে দাঁড়াও।' সা'দের গোত্রের লোকেরা বিচারের ক্ষেত্রে একটু নমনীয় হওয়ার জন্য যখন আবারও পীড়াপীড়ি শুরু করলো তখন তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি অনুসরণ করা উচিত।' তারপর রাসূল (সা) সা'দকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'এই লোকেরা তোমার রায়ের অপেক্ষায় আছে।' সা'দ বললেন, 'আমি আমার রায় ঘোষণা করছি ঃ তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত তাদেরকে হত্যা করা, তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস–দাসীতে পরিণত করা এবং তাদের ধন–সম্পদ বন্টন করে দেওয়া হোক।' তাঁর এই রায় শুনে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ যে ফায়সালা দিয়েছেন তুমিও ঠিক একই ফায়সালা দিয়েছ।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৩৯, ২৪০; উসুদুল গাবা–২/২৯৭; আল–ইসাবা–২/৩৮)

বনী কুরায়জার ব্যাপারে সা'দের রায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর অল্প কিছু দিন তিনি জীবিত ছিলেন। একদিন রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁর ক্ষতে সেঁক দেন। তাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে ফুলে যায়। হঠাৎ একদিন ক্ষতটি ফেটে তীব্র বেগে রক্ত ঝরতে থাকে। ইবন 'আব্বাস বলেনঃ যখন সা'দের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহ শুরু হয় তখন রাসূল (সা) দৌড়ে এসে তাঁর মাথাটি কোলের ওপর উঠিয়ে নেন। সা'দের রক্তে রাসূলের (সা) চেহারা ও দাড়ি ভিজে যায়। রাসূল (সা) একটি সাদা চাদর দিয়ে তাঁর দেহটি ঢেকে দেন। চাদরটি এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। সা'দ ছিলেন ফর্সা মোটা মানুষ। রাসূল (সা) তখন সা'দের জন্য দু'আ করেন এই বলে ঃ 'হে আল্লাহ! সা'দ তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছে, তোমার নবীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর পথে চলেছে। তুমি তাঁর রূহকে সর্বোত্তমভাবে কবুল কর।' রাসূলের (সা) এই দু'আ শুনে সা'দ চোখ খোলেন এবং বলেন ঃ 'আস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। (তাবাকাত-৩/৪২৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৫৭)

হযরত সা'দ ইনতিকাল করলেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ 'সা'দ ইবন মু'য়াজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর রাতের বেলা একটি রেশমী পাগড়ী মাথায় বেঁধে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ 'ইয়া মুহাম্মদ! এ মৃত ব্যক্তিটি কে, যার জন্য আসমানের সবগুলি দরযা খুলে গেছে এবং 'আরশ কেঁপে উঠেছে?' রাসূল (সা) কাপড় টানতে টানতে খুব দ্রুত সা'দের নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি ইনতিকাল করেছেন। (তাবাকাত-৩/৪৩২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫০, ২৫১)

রাসূল (সা) সা'দের মাথাটি কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকলেন। তখনও তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। চতুর্দিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগলো। আবু বকর (রা) দৌড়ে এসে লাশ দেখে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। রাসূল (সা) তাঁকে এমনটি করতে নিষেধ করলেন। 'উমার (রা) কাঁদতে কাঁদতে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। গোটা তাঁবুতে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। সা'দের দুখিনী মা কাঁদতে কাঁদতে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। 'উমার (রা) তাঁকে কবিতা পড়তে নিষেধ করলেন; কিন্তু রাসূল (সা) বললেনঃ থাক, তাকে পড়তে দাও। অন্য বিলাপ কারিনীরা মিথ্যা বলে থাকে; কিন্তু সা'দের মা সত্য বলছে।' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২; তাবাকাত-৩/২২৮, ২২৯)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ীতে যাচ্ছিলেন। সাহাবীরাও সংগে ছিলেন। তিনি এত দ্রুত চলছিলেন যে, সাহাবীরা তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন। একজন তো বলেই বসলেন; 'আপনি এত দ্রুত চলছেন কেন? আমরা তো রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি!' রাসূল (সা) বললেনঃ 'আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের আগেই ফিরিশ্‌তারা তাকে গোসল না দিয়ে ফেলে, যেমন দিয়েছিল হানজালাকে।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪৫)

রাসূল (সা) সা'দের জানাযার সাথে গোরস্তানে গিয়েছিলেন। মুনাফিকরাও গিয়েছিল। তাঁর লাশ হালকা বোধ হচ্ছিলো। এজন্য মুনাফিকরা বলাবলি করছিল, এমন হালকা লাশ তো আমরা আর কখনও দেখিনি। সম্ভবতঃ বনী কুরায়জার ব্যাপারে সে যে রায় দিয়েছিল, এটা তারই কুফল। কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন; 'যাঁর হাতে আমার জীবন

তাঁর নামের শপথ! ফিরিশতাকুল তাঁর খাটিয়া বহন করছে।' ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আরও বললেনঃ 'নিশ্চয় এই সা'দ অতি নেক্কার বান্দা। তার জন্য আল্লাহর 'আরশ দুলে উঠেছে, আসমানের দরযাসমূহ খুলে গেছে এবং তাঁর জানাযায় এমন ৭০ হাজার ফিরিশতা যোগদান করেছে যারা এর আগে আর কখনও পৃথিবীতে আসেনি।' (তাবাকাত-৩/৪৩০; উসুদুল গাবা-২/২৯৭, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫১)

ইবন ইসহাক জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সা'দকে দাফনের সময় আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলাম। তিনি প্রথমে, একবার জোরে 'সুবহানাল্লাহ' উচ্চারণ করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে 'সুবহানাল্লাহ' পড়লেন। তারপর তিনি 'তাকবীর' ধ্বনি দিলেন, লোকেরাও 'তাকবীর' দিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এভাবে 'তাসবীহ' পড়লেন কেন? বললেনঃ এ নেক্কার লোকটির কবর বড় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ পাক প্রশস্ত করে দিয়েছেন।' (তাবাকাত-৩/৪৩২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫১, ২৫২)

হযরত সা'দকে দাফনের পর রাসূলে কারীমকে (সা) দারুণ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। চোখ দিয়ে ক্রমাগতভাবে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আল-ইস্‌তীয়াব গ্রন্থকার বলেছেনঃ 'খন্দক যুদ্ধের একমাস এবং বনী কুরায়জার ঘটনার কয়েক রাত্রি পর হিজরী পঞ্চম সনে সা'দের ওফাত হয়।' (টীকাঃ আল-ইসাবা-২/২৮)

মদীনার বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। (আল-আ'লাম-৩/১৩৯) ইবন ইসহাক তাঁকে খন্দক যুদ্ধে বনী 'আবদিল আশহালের শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২)

হযরত সা'দের ওফাতের ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক অসাধারণ ঘটনা। তিনি ইসলামের খিদমতে যে অবদান রাখেন এবং তাঁর মধ্যে যে ঈমানী চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার জন্য তাঁকে আনসারদের 'আবু বকর' বলে গণ্য করা হতো। 'ইফক' বা হযরত আয়িশার প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন রাসূল (সা) ক্ষোভের সাথে বললেনঃ 'এ আল্লাহর দুশমন (আবদুল্লাহ ইবন উবাই, মুনাফিক সর্দার) আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এর প্রতিবিধান করতে পারে? 'সাথে সাথে সা'দ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ 'আউস গোত্রের কেউ থাকলে আমাকে বলুন, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজীদের কেউ হয়, আমাদেরকে নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবো।' (শাহীরাতুন নিসা ফিল 'আলম আল-ইসলামী-৫৯) তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝা যায় তাঁর জানাযায় ফিরিশতাদের অংশগ্রহণ এবং আল্লাহর 'আরশ কেঁপে উঠার মাধ্যমে। তাই একজন আনসারী কবি গর্ব করে বলেছিলেনঃ 'একমাত্র সা'দ আবু 'আমরের মৃত্যু ছাড়া আর কোন মরণশীলের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে, এমন কথা আমরা কখনও শুনিনি।' এমনিভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারী কবি হাস্‌সান ইবন সাবিতও তাঁর অনেক কবিতায় সা'দের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপন করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২, ২৬৯, ২৭০, ২৭২)

হযরত সা'দ ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘদেহী, সুদর্শন পুরুষ। মৃত্যুকালে 'আমর ও আবদুল্লাহ নামে দুই ছেলে রেখে যান। তাঁরা দু'জনই বাই'য়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁদের মা হিন্দা বিনতু সাম্মাকও ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিতা সাহাবিয়্যা। (তাবাকাত–৪২০, ৪৩৩)

মদীনায় ইসলামের প্রথম ভাগেই হযরত সা'দের ওফাত হয়। জীবনের মাত্র পাঁচটি বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ অল্প সময়ে তিনি হয়তো বহু হাদীস শুনে থাকবেন; কিন্তু হাদীস বর্ণনার সিলসিলা যেহেতু রাসূলুল্লাহর (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর শুরু হয়, এ কারণে তাঁর বর্ণনা প্রচারিত হয়নি। তবে সহীহ বুখারীতে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের একটি বর্ণনা এসেছে যাতে সা'দের 'উমরার কথা আছে এবং উহুদে সা'দ ইবন রাবী'র শাহাদাতের ঘটনা প্রসঙ্গে আনাস (রা) তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটাও বুখারীতে এসেছে। (তাহজীব আত–তাহজীব–৩/৪৮২)

নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ ছিলেন অতি উঁচুমানের লোক। 'আয়িশা (রা) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) পরে বনী 'আবদুল আশহালে তিন ব্যক্তি থেকে উত্তম আর কেউ নেই। তাঁরা হলেনঃ সা'দ ইবন মু'য়াজ, উসাইদ ইবন হুদাইর ও 'আব্বাদ ইবন বিশর।' (আল–ইসাবা–২/৯৭) সা'দ নিজেই বলতেনঃ আমি একজন সাধারণ মানুষ, তবে তিনটি বিষয়ে যে পর্যন্ত পৌছানো উচিত, আমি সেখানে পৌচেছি। ১· রাসূলুলাহর (সা) মুখ থেকে যে বাণী আমি শুনি তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস করি। ২· নামাযের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আমার মনে জাগে না। ৩· মৃত ব্যক্তির জানাযার কাছে থাকলে মুনকির–নাকীরের প্রশ্নের চিন্তা ছাড়া আমার মধ্যে আর কিছু থাকে না। টীকাঃ আল ইসতীয়াব; আল ইসাবা–২/৩৩; তাহজীব আত তাহজীব–৩/৪৮২)

হযরত সা'দের 'আমলের ওপর হযরত রাসূলে কারীমের (সা) যে দারুণ আস্থা ছিল সে কথা একটি হাদীসে জানা যায়। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'কবরের একটি চাপ অবশ্যই আছে। যদি কেউ এই চাপ থেকে রেহাই পেয়ে থাকে, তাহলে সে সা'দ ইবন মু'য়াজ।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৫২; তাবাকাত–৩/৪৩২। তাছাড়া ইমাম আহমাদ ও বায়হাকীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

কিন্দার রাজা উকাযদারকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এলেন। তার মূল্যবান পোশাক দেখে, মতান্তরে রাসূলকে (সা) উপহার দেওয়া একখানা কাপড় দেখে সাহাবীরা অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁদের এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) বললেনঃ 'তোমরা এই দেখে অবাক হচ্ছো? জান্নাতে সা'দ ইবন মু'য়াজের রুমালগুলিও এর থেকে সুন্দর হবে।' (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৮৩; তাবাকাত–৩/৪৩৬; উসুদুল গাবা–২/২৯৭, ইবন হিশাম–২/৫২৬; সহীহ বুখারী–১/৫৩৬)

আবু সা'ঈদ আল–খুদরী (রা) বলেনঃ 'যাঁরা বাকী গোরস্তানে সা'দের কবর খুঁড়েছিল আমি তাঁদের একজন। আমরা কবরের মাটি খোঁড়ার সময় মিশকের ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। শুরাহবীল ইবন হাসানা বলেনঃ এক ব্যক্তি সা'দের কবরের মাটি থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে ঘরে রেখে দেয়। কিছুদিন পরে সে দেখে, তা মাটি নয়; বরং মিশ্‌ক। (তাবাকাত–৩/৪৩১; হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৯৫) ■

সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)

আসল নাম সা'দ, ডাকনাম আবু কায়স ও আবু সাবিত। প্রথমটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। (উসুদুল গাবা-২/২৮৩) লকব বা উপাধি সায়্যিদুল খাযরাজ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'সায়িদাহ' শাখার সন্তান। পিতার নাম 'উবাদা ইবন দুলাইম এবং মাতার নাম 'উমরা বিন্‌তু মাস'উদ। 'উমরা সাহাবিয়্যা (মহিলা সাহাবী) ছিলেন এবং হিজরী ৫ম সনে ইন্তিকাল করেন। সা'দ তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'দুমাতুল জান্দাল' যুদ্ধে যোগদানের জন্য মদীনার বাইরে। মদীনায় ফিরে রাসূল (সা) তাঁর মার কবরে যান এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। (তাবাকাত-৩/৬১৪; আল-ইসাবা-২/৩০)

হযরত সা'দের সম্মানিত দাদা 'দুলাইম' ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সবচেয়ে বড় নেতা। তাছাড়া মদীনার জনকল্যাণমূলক কাজেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সায়িদাহ খান্দানের সম্মান ও গৌরব মূলতঃ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। দেবী 'মানাত'-এর পূজা করতেন। এ দেবীর মূর্তি ছিল মক্কার নিকটে 'মুসালাল্' নামক স্থানে। তিনি প্রতি বছর সেখানে দশটি উট বলি দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'উবাদা, তারপর সা'দ ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রাখেন। ইসলামী যুগে সা'দের ছেলে কায়স পূর্ব পুরুষের ধারা বজায় রেখে উটগুলি কা'বার চত্বরে কুরবানী করতেন। একবার হযরত আবু 'উবাইদা ও হযরত 'উমার (রা) কায়সকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু কায়স তাঁদের কথার প্রতি মোটেও কর্ণপাত করেননি। তাঁরা কায়সের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করেন। তখন রাসূল (সা) বলেনঃ কায়স তো দানশীল পরিবারের সন্তান। (আল-ইসতী'য়াবঃ টীকা আল-ইসাবা-২/৩৭)

সা'দের পিতা 'উবাদা ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। পিতার মত একইভাবে জীবন কাটিয়ে ছেলে সা'দের জন্য ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। ছেলেকে তিনি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলেন। 'সা'দ' সেই জাহিলী আরবেই 'কামিল' উপাধি লাভ করেন। কারণ, তৎকালীন আরবে হাতে গোনা যে ক'জন লোক আরবী লিখতে জানতো, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তাঁর আরবী লেখা ছিল চমৎকার। তাছাড়া তিনি ছিলেন সে সময়ের আরবের একজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু ও দক্ষ তীরন্দাজ। আর এ বিদ্যাগুলি যারা বিশেষভাবে রফ্‌ত করতো আরববাসী শুধু তাদেরকেই 'কামিল' উপাধি দিত। (দ্রঃ তাহজীব আত-তাহজীব-৩/৪৭৫; আল ইসাবা-২/৩০; তাবাকাত-৩/৬১৩)

শেষ 'আকাবার বাই'য়াতের সময় সা'দ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বনী সায়িদার 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) নিয়োগ করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫০; উসুদুল গাবা-২/২৮৩) তাঁকে উঁচু স্তরের সাহাবী গণ্য করা হতো। বুখারী শরীফে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'ওয়া কানা জা কিদামিন ফিল ইসলাম'- ইসলামে তিনি ছিলেন প্রথম স্তরের মানুষ।

'আকাবার শেষ বাই'য়াত যেভাবে সম্পন্ন হয়, আনসারদের যে সংখ্যক মানুষ তাতে

অংশগ্রহণ করেন এবং যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শর্তের ওপর তা অনুষ্ঠিত হয় তাতে তা গোপন থাকা সম্ভব ছিল না। যদিও তা রাতের অন্ধকারে গোপনে হয়েছিল। কারণ, রাসূলকে (সা) নিয়ে কুরাইশদের চিন্তার অন্ত ছিল না। তারা সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। সুতরাং রাতের যে লগ্নে রাসূল (সা) 'আকাবায় মদীনা থেকে আগত লোকদের নিকট থেকে বাই'য়াত গ্রহণ করেন, ঠিক সেই সময়ে; কেউ একজন মক্কার 'জাবালে আবু কুরাইসের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল; 'দেখ সা'দ যদি মুসলমান হয়ে যায় তালে মুহাম্মাদ একেবারেই নির্ভিক হয়ে যাবে।' (দ্রঃ উসুদুল গাবা-২/২৮৪; আল ইসতী'য়াব; আল ইসাবা-২/৩৭)

এ আওয়ায কুরাইশদের কানে পৌঁছালেও প্রথমে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তারা সা'দ বলতে 'কাদায়া' ও তামীম গোত্রের সা'দ নামের লোকগুলিকে বুঝেছিল। পরের রাতে ঐ পাহাড় থেকে আবার একটি কবিতার কিছু চরণ আবৃত্তি করতে শোনা গেল। তাতে পরিষ্কার ভাবে সা'দের নাম ও পরিচয় ছিল। কুরাইশরা দারুণ বিস্ময়ের মধ্যে পড়ে গেল। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তারা 'দারুন নাদওয়া' বা পরামর্শ গৃহে সমবেত হলো। তারা মদীনার আউস গোত্রের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন 'উবাই ইবন সুলুলের সাথে কথা বললো, কিন্তু সে বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কুরাইশরা চারিদিকে গোয়েন্দা নিয়োগ করে যার যার মত বাড়ীতে ফিরে গেল। আর মদীনাবাসী মুসলমানরা 'ইয়াজজ'-এর পথে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলো।

ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'নাকীবগণ 'আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত শেষ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে স্বদেশের পথ ধরলো। এদিকে বাই'য়াতের কথা লোকমুখে প্রচার হয়ে গেল। খোঁজ-খবর নিয়ে কুরাইশরা বুঝতে পারলো, ব্যাপারটি সত্য। তারা বাই'য়াতকারীদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লো এবং সা'দ ইবন 'উবাদা ও আল মুনজির ইবন 'উমারকে পেয়ে গেল। তবে সা'দকে ধরতে পারলেও আল মুনজির ইবন 'উমার পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। সা'দের মাথার চুল ছিল লম্বা। তারা সেই চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চললো। সা'দ বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তাদের হাতে বন্দী। কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমার কাছে আসলো। তাদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল সুদর্শন যুবককে দেখে আমি ভাবলাম, যদি এ সম্প্রদায়ের কারও মধ্যে ভালো কিছু থাকে তাহলে হয়তো এর মধ্যেই আছে। সে ছিল সুহাইল ইবন 'আমর। কিন্তু সে আমার আশার মুখে ছাই দিয়ে কাছে এগিয়ে এসে আমার গায়ে জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। আমি তখন মনে মনে বললাম; আল্লাহর কসম! এরপর এ সম্প্রদায়ের অন্য কারও কাছে ভালো কিছু আশা করা বৃথা। একজন প্রশ্ন করলো; তুমি কি মুহাম্মাদের দীন কবুল করেছ? আমি বললাম; হাঁ, কবুল করেছি। তখন তাঁরা আমাকে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধলো। এসময় একজন আমার উরুতে টোকা মেরে বললোঃ কুরাইশদের কারও সাথে তোমার কি কোন চুক্তি আছে? বললামঃ হাঁ আছে। মুতয়িম ইবন 'আদী ও আল-হারিস ইবন উমায়্যা যখন আমাদের আবাসভূমিতে যায়, আমি তাদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। সে বললোঃ তোমার বাপ নিপাত যাক! শিগগিরই তাদের নাম ধরে জোরে জোরে সাহায্য চাও। আমি তাই করলাম। লোকটি ছুটে তাদের দু'জনের কাছে গিয়ে বললোঃ কুরাইশদের কয়েক ব্যক্তি যে লোকটিকে বন্দী করে মারধোর ও অপমান করছে সে তোমাদের দু'জনের নাম ধরে ডাকছে। সে বলছে, তোমাদের সাথে নাকি তার মৈত্রী চুক্তি আছে। তারা জিজ্ঞেস করলোঃ লোকটি কে? সে বললোঃ সা'দ ইবন 'উবাদা। তারা

বললোঃ সে সত্য বলেছে। তারপর মুতয়িম ইবন ’আদী ও আল হারিস ইবন উমায়্যা ছুটে এসে তাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে মদীনার পথ ধরিয়ে দেয়।’

এই মুতয়িম ইবন আদী ছিলেন মক্কার এক অতি ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি। ইসলামের সূচনা পর্বে মক্কায় তিনি রাসূলকে (সা) নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাকে খবর দিয়েছিল, সে ছিল আবুল বাখতারী ইবন হিশাম।

যাইহোক, সা’দ এভাবে বন্দী হওয়ায় মদীনা অভিমুখী আনসারদের কাফেলায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা পরামর্শ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়, জীবনের ঝুঁকি থাকলেও মক্কায় ফিরে সা’দের সন্ধান নিতে হবে। এর মধ্যে সা’দকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তারা তাঁকে সংগে করে সোজা মদীনার পথ ধরলো। (দ্রঃ তারীখু ইবন ’আসাকির–৬/৮৫,৮৬; আনসাবুল আশরাফ–১/২৫৪, ২৫৫; সীরাতু ইবন হিশাম–১/১৫০, ১৫১; তাবাকাত–১/১৫০)

সা’দের বন্দীর বিষয়টি নিয়ে কুরাইশ পক্ষের কবি দাররার ইবনুল খাত্তাব ইবন মিরদাস একটি কবিতা রচনা করে। কবি হাস্সান ইবন সাবিত তার জবাবে বড় একটি কবিতা লেখেন। তাতে সা’দের প্রশংসা ও কুরাইশদের নিন্দা করা হয়েছে। আনসাবুল আশরাফ ও সীরাতু ইবন হিশামসহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। (দ্রঃ আনসাবুল আশরাফ–১/২৫৫ ; সীরাতু ইবন হিশাম–১/১৫০, ১৫১)

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। এ উপলক্ষে মদীনার প্রতিটি অলি–গলিতে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। তিনি আবু আইউবের বাড়ীতে পৌঁছতেই সেখানে হাদিয়া তোহফা আসা শুরু হয়ে যায়। হযরত সা’দ তাঁর বাড়ী থেকে বড় এক পাত্র সারীদ ও ’উরাক পাঠিয়ে দেন। (তাবাকাত–১/১৬১)

হিজরাতের কয়েক মাস পর থেকে ইসলামী আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করতে থাকে। হিজরাতের দ্বাদশ মাস সফরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ছোট্ট একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে যান। এটাকে ‘ওয়াদ্দান’ অভিযানও বলা হয়। এ বাহিনীতে কোন আনসার মুজাহিদ ছিল না। এ সময় পনেরোটি রাত রাসূল (সা) মদীনার বাইরে ছিলেন। তিনি সা’দ ইবন ’উবাদাকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় রেখে যান। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৮৭; তাবাকাত–১/৩)

হিজরী দ্বিতীয় সনে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে হযরত সা’দের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতভেদ আছে। ইয়াকুব ইবন সুফইয়ান, মূসা ইবন ’উকবা, খলীফা ইবন খায়্যাত, আল ওয়াকিদী, আল মাদায়িনী, ইবনুল কালবী প্রমুখ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁকে বদরী যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। আবু আহমাদ তাঁর ‘আল কুনা’ গ্রন্থে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরে অংশগ্রহণ করেন।(দ্রঃ উসুদুল গাবা–২/২৮৩; আল ইসতীয়াব ; আল ইসাবা–২/৩৬; তারীখ ইবন ’আসাকির–৬/৮৪, ৮৫) পক্ষান্তরে ইবন ইসহাক তাঁকে বদরী যোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। ইবন সা’দ ও বালাজুরী বলেনঃ সা’দ বদরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে কুকুরে কামড়ায়। এ কারণে তিনি যেতে পারেননি। রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ যদিও সা’দ বদরে হাজির হয়নি, তবে সে যাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূল (সা) তাঁকে বদরের গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। ইবন আসাকির বলেন, এটা সর্বসম্মত ও প্রমাণিত

নয়। (দ্রঃ তাকরীবুত তাহজীব–১/২৮৮; উসুদুল গাবা ২/২৮৩, আল ইসবা ২/৩০; তারীখ ইবন 'আসাকির ৬৮৪, ৮৫) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সা'দের বদরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, তিনি বদরে শরীক হননি। আল্লামা ইবন হাজার 'আসকিলানীর মতও এটাই। তিনি ইমাম মুসলিমের ভাষা দ্বারা নিজ মতের স্বপক্ষে খুব সুক্ষ্মভাবে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। (দ্রঃ ফাতহুল বারী–৫/২২৪)

বদর যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের যুদ্ধগুলির মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এর পূর্বে যদিও চারটি গাযওয়া ও চারটি সারিয়্যা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন আনসারী সৈনিক অংশগ্রহণ করেনি। এর নানা কারণ থাকতে পারে। একটি এই হতে পারে যে, 'আকাবার বাই'য়াতের সময় আনসারদের পক্ষ থেকে শুধু এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, যারা মদীনা আক্রমণ করবে শুধু তাদেরকেই তারা প্রতিরোধ করবে। মদীনার বাইরে কোন সংঘাত হলে সে বিষয়ে তাদের ভূমিকা কী হবে তার কোন উল্লেখ তাতে ছিল না। আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, রাসূল (সা) প্রথমতঃ মদীনার মূল বাসিন্দাদেরকে কুরাইশদের শত্রু হিসেবে দাঁড় করাতে চাননি।

অতএব রাসূল (সা) যখন বদরে যাত্রার মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন তখন আনসারদের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন। মদীনার সকল গোত্রের লোকদের একটি বৈঠকে ডাকা হলো। সেখানে যুদ্ধের বিষয়টি উঠলো। হযরত আবু বকর (রা) উঠে তাঁর মতামত পেশ করলেন। হযরত 'উমার (রা) কিছু বলার জন্য উঠলেন, কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। সেই বৈঠকে হযরত সা'দ ইবন 'উবাদাও ছিলেন। তিনি বুঝলেন, রাসূল (সা) তাঁদের মতামত চাচ্ছেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যার হাতে আমার জীবন, তাঁর জাতের কসম, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র অভিযানের নির্দেশ দেন, আমরা তা দলিত মথিত করে ছাড়বো। আর যদি শুকনো মাটিতে অভিযানের আদেশ দেন তাহলে ইয়ামনের 'বারকে গিমাদ' পর্যন্ত উট ছুটিয়ে নিয়ে যাব। (সহীহ মুসলিম–২/৮৪; আল–বিদায়া–৩/২৬৩; কানযুল 'উম্মাল–৫/২৭৩; হায়াতুস সাহাবা–১/৪২৪)

উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে সীরাত লেখকদের অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি বদরে যোগদান করেছিলেন। অথচ সহীহ মুসলিমের এ বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে সিরিয়া থেকে আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফিলা আসার খবর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) পেলেন তখন তিনি পরামর্শ করেন। মূলতঃ এ বাণিজ্য কাফেলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) মদীনা থেকে বের হন; যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়। (মুসলিম–২/৮৪) কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন, মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনী বদরের দিকে এগিয়ে আসছে। আর তখনই রাসূল (সা) যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে মদীনাবাসীদের অনেকেই বুঝতে পারেননি যে, রাসূল (সা) বদরে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। তাই তাদের অনেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনা থেকে বের হননি। আর তাদেরই একজন সা'দ ইবন 'উবাদা। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৮৮)

বদরের পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার পৌত্তলিক শক্তি এমন তোড়জোড় সহকারে ধেয়ে আসে যে মদীনায় একটা ভীতির সঞ্চার হয়। গোটা মদীনায় সারা রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। মদীনার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তান যথা সা'দ ইবন মু'য়াজ, 'উসাইদ ইবন হুদাইর

প্রমুখের সাথে তিনিও অস্ত্র হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহের হিফাজতে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা সারা রাত মদীনা পাহারা দেন। শাওয়ালের ৬ তারিখ জুম'আর দিন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আনসার গোত্র খাযরাজের পতাকাটি সা'দ ইবন 'উবাদার হাতে তুলে দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৪, ৩১৭) প্রস্তুতি শেষ হলে রাসূল (সা) ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বের হন। আউস ও খাযরাজ গোত্রের দুই নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদা নিজ নিজ গোত্রের ঝান্ডা হাতে নিয়ে আগে আগে চললেন। মধ্যে রাসূল (সা) এবং ডানে বাঁয়ে অন্যান্য আনসার-মুহাজির মুজাহিদগণ। এমন শান শওকাতে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) বের হতে দেখে কাফির ও মুনাফিকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

শনিবার উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধ শুরু হলো। সংঘর্ষ এমন তীব্র ছিল যে, এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। তবে রাসূল (সা) ময়দানে অটল থাকলেন। এ সময় মাত্র ১৪ ব্যক্তি নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে থেকে কাফিরদের হটিয়ে দেন। অনেকের মতে ঐ ১৪ জনের একজন সা'দ ইবন 'উবাদা। (যারকানী-২/৪০)

হিজরী ৫ম সনে সংঘটিত হয় বনী মুসতালিক বা মুরাইসী'র যুদ্ধ। এতে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের ঝান্ডা তাঁরই হাতে অর্পণ করা হয়। (তাবাকাত, মাগাযী অধ্যায়-৪৫) এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাকে (রা) কেন্দ্র করে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে যায়। তারা হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্র সম্পর্কে কিছু অশোভন উক্তি করে এবং তাতে কিছু সরল মুসলমানও জড়িয়ে পড়ে। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রাসূল (সা) ভীষণ কষ্ট পান এবং একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাটি 'ইফ্ক' বা বানোয়াট কাহিনী নামে পরিচিত হয়েছে।

এই 'ইফ্ক'-এর ঘটনার এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুল আমার পরিবারের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে। এতে আমি দারুণ কষ্ট পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এর প্রতিবিধান করতে পারে? সাথে সাথে আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ বলে ওঠেন; আমি প্রস্তুত। আপনি যে হুকুম দেবেন তা পালন করবো। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর খাযরাজ গোত্রের হলে আপনার নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছি। উল্লেখ্য যে প্রাচীন কাল থেকে আউস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা ও রেষারেষি চলে আসছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের মধ্যে বড় ধরনের অনেক যুদ্ধও হয়েছিল। ইসলাম তাদের সেই বৈরিতা দূর করে দেয়। তা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে পূর্ব শত্রুতার কিছুটা রেশ বিদ্যমান ছিল। এ কারণে সা'দ ইবন মু'য়াজের কথায় খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা অপমান বোধ করেন। কথাটি তিনি সহজভাবে নিতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে সা'দ ইবন মু'য়াজ! তুমি ঠিক বলোনি। তোমরা কক্ষনো খাযরাজকে হত্যা করতে পারবে না, তাদেরকে পরাভূত করতেও সক্ষম হবে না। যদি তোমার নিজ গোত্র আবদুল আশহালের ব্যাপার হতো তাহলে তোমার মুখ থেকে এমন কথা বের হতো না। উসাইদ ইবন হুদাইর ছিলেন সা'দ ইবন মু'য়াজের খালাতো বা মামাতো ভাই। তিনি সা'দ ইবন 'উবাদাকে লক্ষ্য করে বললেন; আপনি এসব কী বলছেন! রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ পেলে

আমরা অবশ্যই তা পালন করবো। তারপর দুই গোত্র উত্তেজিতভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। রাসূল (সা) মিম্বরে ছিলেন। তিনি উত্তেজনা দূর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। (ফাতহুল বারী–৮/৩২; সহীহুল বুখারী–৭/৩৩৫; সীয়ারে আনসার–২/৩৩)

হিজরী ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার মুসলমানদের অবস্থা যখন অতি সঙ্কটজনক তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) গাত্‌ফান গোত্রের দুই নেতা 'উয়াইনা ইবন হিস্‌ন ও আল হারিস ইবন 'আউফের সাথে একটি চুক্তি করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করতে চাইলেন যে, মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়ংশের বিনিময়ে তারা কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। রাসূল (সা) পরামর্শের জন্য সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে ডাকলেন। তাঁরা উপস্থিত হলে রাসূল (সা) বললেন; আমি 'উয়াইনা ও আল হারিসকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ এই শর্তে দিতে চাই যে, তারা কুরাইশদের পক্ষ ত্যাগ করে ফিরে যাবে; কিন্তু তারা অর্ধেক দাবী করছে। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কী?

সা'দ ইবন 'উবাদা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যদি ওহীর নির্দেশ হয় তাহলে তো দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। আর তা যদি না হয় তাহলে তাদের দাবীর জবাব তো শুধু তরবারি। আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে ফলের পরিবর্তে তরবারির ধার উপহার দেব।

রাসূল (সা) বললেন ঃ 'ওহী নয়। ওহী হলে তো তোমাদের সাথে পরামর্শের কোন প্রশ্নই উঠতো না। সা'দ বললেন ঃ 'তাহলে তরবারির মাধ্যমে তাদেরকে জবাব দিতে হবে। জাহিলী যুগেও এমন অপমান আমরা চিন্তা করিনি। আর এখন তো আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দান করে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এখন দেব আমরা আমাদের ফসলের একাংশ তাদেরকে?' রাসূল (সা) তাঁদের দুই জনের সাথে আলোচনা করে খুব খুশী হলেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। তারপর সা'দ ইবন উবাদা খসড়া চুক্তি পত্রটি হাতে নিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম– ২/২২১–২২৩; উসুদুল গাবা– ২/২৮৪; আনসাবুল আশরাফ– ১/৩৪৬, ৩৪৭, হায়াতুস সাহাবা– ২/৪৪,৪৫) এই খন্দক যুদ্ধেও আনসারদের ঝান্ডা সা'দ 'উবাদার হাতে ছিল।

মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের অবরোধের সময় সা'দ ইবন উবাদা নিজ খরচে মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে খেজুর বন্টন করেন। তেমনিভাবে বনু কুরাইজার অবরোধের সময় তিনি মুসলিম সৈনিকদের রসদপত্র সরবরাহ করেন। (দায়িরা–ই–মা'খারিফ ইসলামিয়্যা– ১১/৩২)

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রাসূল (সা) 'গাবা' অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সা'দকে ৩০০ সদস্যের একটি বাহিনীর অফিসার বানিয়ে মদীনার নিরাপত্তার দায়িত্বে রেখে যান। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন ঃ গাবা অভিযানের সময় সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর গোত্রের তিন শো লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) না ফেরা পর্যন্ত পাঁচ রাত্রি মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাছাড়া রাসূল (সা) যখন 'জ্বিকারাদ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন সাহায্যের জন্য মদীনায় খবর পাঠান। হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা দশটি উট বোঝাই করে খেজুর পাঠান। রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাহিনীতে সা'দের ছেলে কায়সও ছিলেন একজন অশ্বারোহী সৈনিক। তিনি পিতা প্রেরিত উট ও খেজুর যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পেশ করলেন তখন তিনি বললেন ঃ হে কায়স! তোমার পিতা তোমাকে ঘোড় সওয়ার করে পাঠিয়েছেন, মুজাহিদদের শক্তিশালী করেছেন

এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মদীনা পাহারা দিয়েছেন। তারপর তিনি দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দ ও তার পরিবার–পরিজনের ওপর রহম করুন! সা'দ ইবন 'উবাদা কতই না ভালো মানুষ। তখন খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলে ওঠে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাদের খান্দানের লোক, আমাদের নেতা এবং নেতার ছেলে। (তারীখে ইবন আসাকির– ৬/৮৮; তাবাকাত ঃ মাগাযী–৫৮)

হিজরী ৭ম সনে খাইবার যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে তিনটি ঝান্ডা ছিল। তার একটি ছিল সা'দ ইবন 'উবাদার হাতে। (তাবাকাত ঃ মাগাযী– ৭৭) তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামের নিকট বস্তুগত সাহায্যের আবেদন জানালে অন্যদের মত সা'দ ইবন 'উবাদাও তাঁর হাতে বিপুল অর্থ তুলে দেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪২১; দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–১১/৩২)

মক্কা বিজয়ের দিন খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) ঝান্ডাটি হযরত সা'দের হাতে ছিল। মুসলিম সৈনিকদের একটি দল 'কাদায়া'র দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করছিল। আবু সুফইয়ান হযরত 'আব্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের একটি দলের পুরোভাগে ছিলেন সা'দ ইবন 'উবাদা। তাদের দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলা দেখে আবু সুফইয়ানের দু' চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তিনি 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কারা? আব্বাস জবাব দিলেন ঃ আনসার। এদের কমান্ডার সা'দ ইবন 'উবাদা। ঝান্ডা তাঁরই হাতে।

সা'দ আবু সুফইয়ানের কাছাকাছি এসে তাঁকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'দেখবে আজ কেমন তুমুল যুদ্ধ হয়। আজ কা'বা হালাল (রক্তপাত বৈধ) হয়ে যাবে।' একথা শুনে আবু সুফইয়ানের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি 'আব্বাসকে বলেন, 'আজ তো তুমুল লড়াই হবে।' সা'দের বাহিনী অতিক্রমের পরই রাসূলুল্লাহর (সা) দলটি উপস্থিত হয়। তাঁকে দেখে আবু সুফইয়ান চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ আপনাকে দয়ালু ও সৎকর্মশীল করে সৃষ্টি করেছেন। সা'দ আমাকে ভয় দেখিয়ে গেছে। আজ নাকি ঘোরতর যুদ্ধ হবে, কুরাইশদের বিনাশ ঘটবে। আবু সুফইয়ানের কথা সমর্থন করে আরও কয়েকজন একই কথা বললেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে হযরত 'উমার সা'দের কথা শুনে তা রাসূলকে (সা) অবহিত করেন। হযরত 'উসমান ও হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বললেন ঃ 'আমাদের ভয় হচ্ছে, সা'দের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে না ওঠে।' দার্‌রার ইবন খাত্তাব আল–ফিহ্‌রী একটি কবিতা আবৃত্তিও করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গিয়ে কবিতার মাধ্যমে ফরিয়াদ কর। দার্‌রারের সেই সব কবিতার অংশবিশেষ 'আল–ইসতী'য়াব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট কুরাইশরা এমন সময় আশ্রয় নিয়েছে যখন তাদের আর কোন আশ্রয় স্থল নেই, আর দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং আসমানের আল্লাহ তাদের শত্রু হয়ে গেছে। সা'দ মক্কাবাসীদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে।'

কবিতা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সা'দ ঠিক বলেনি। আজ কা'বার সম্মান আরও বৃদ্ধি

পাবে। তার গায়ে গিলাফ চড়ানো হবে।' তিনি আলীকে (রা) বললেন, 'তুমি ছুটে যাও। সা'দের হাত থেকে ঝান্ডাটি নিয়ে তার ছেলে কায়সের হাতে দাও। আলী ছুটে গিয়ে ঝান্ডাটি চাইলেন। সা'দ তা দিতে অস্বীকার করে বললেন, সত্যিই যে রাসূল (সা) তোমাকে পাঠিয়েছেন তার প্রমাণ কি? রাসূল (সা) তাঁর পাগড়ীটি পাঠালেন। তখন সা'দ ঝান্ডাটি নিজের ছেলের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু যে আশঙ্কা সা'দকে নিয়ে ছিল, একই আশঙ্কা তাঁর ছেলেকে নিয়েও দেখা দিল। আবেদন জানানো হলো ঃ সা'দের ছেলে কায়সের হাত থেকে ঝান্ডাটি অন্য কারও হাতে দেওয়া হোক। তখন রাসূল (সা) ঝান্ডাটি নিয়ে যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের হাতে তুলে দেন। সহীহ বুখারীতে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ঝান্ডা হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের হাতে ছিল, তার তাৎপর্য এটাই। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪০৬, ৪০৭; উসুদুল গাবা- ২/২৮৪; হায়াতুস সাহাবা- ১/১৬৯; আল-ইসতীয়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-২/৩৯; বুখারী- ২/৬১৩; ফাতহুল বারী- ৮/৭)

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এতে খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা সা'দের হাতে ছিল। (তাবাকাত ঃ মাগাযী- ১০৮) উল্লেখিত যুদ্ধগুলি ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় উপস্থিতির পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছোট-বড় যত যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলিতে সা'দ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিটি অভিযানেই তিনি ছিলেন আনসারদের পতাকাবাহী।

হিজরী ১১ সনে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাত হয়। প্রাচীন কাল থেকে মদীনার মালিকানা ছিল আনসারদের। ইসলামের সূচনা পর্ব থেকেই তারা রাসূলকে (সা) সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল। যে সময় ইসলামের কোন আবাসভূমি ছিল না, রাসূল (সা) ব্যাকুল হয়ে একটি আশ্রয় খুঁজছিলেন, কুরাইশদের ভয়ে যখন আরবের কোন একটি গোত্র তাঁকে আশ্রয় দিতে দুঃসাহস করেনি তখন আনসারদের ৭২/৭৫ জনের একটি দল মক্কায় এসে আরব-আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শর্তে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (শপথ) করেন এবং সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে রাসূলকে (সা) মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে জীবন ও সম্পদ কুরবানীর দিক দিয়ে আনসাররা ছিল সকলের অগ্রগামী। হযরত কাতাদা বলতেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোন একটি গোত্র আনসারদের সমসংখ্যক শহীদ উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি আনাসের নিকট শুনেছি, উহুদে সত্তর জন, বীরে মা'উনায় সত্তর জন এবং ইয়ামামায় সত্তর জন আনসার শাহাদাত বরণ করেন। (বুখারী- ২/৫৮৪; সীয়ারে আনসার- ২/২৭) তাছাড়া কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীসে আনসারদের অনেক ফজীলাত ও মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। এসব কারণে তাদের অন্তরে খিলাফতের নেতৃত্বলাভ করার আকাঙ্খা সৃষ্টি হওয়া ছিল অতি স্বাভাবিক।

মদীনার আনসারগণ সেই প্রাচীনকাল থেকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র দু'টি আউস ও খাযরাজ। লোকসংখ্যা ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে খাযরাজ গোত্রটি ছিল তুলনামূলকভাবে একটু বেশী বরেণ্য। এর নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মনোনীত দ্বাদশ নাকীবের অন্যতম। অপর দিকে সা'দ ইবন মু'য়াজ ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। তবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় সা'দ ইবন 'উবাদা মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

সা'দ ইবন 'উবাদার বাড়ীটি ছিল মদীনার বাজার সংলগ্ন। তাঁর ঘরের সাথেই ছিল একটি ছাউনী। এর মালিকানা ছিল খাযরাজ গোত্রের বনী সায়িদা শাখার লোকদের। এ জন্য তা 'সাকীফা বনী সায়িদা' নামে প্রসিদ্ধ। এটাকে আনসাররা মক্কার 'দারুন নাদওয়ার' মত পরামর্শ গৃহ হিসাবে ব্যবহার করতো।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট আনসারগণ উক্ত সাকীফায় সমবেত হলেন। সা'দ ইবন 'উবাদা তখন ভীষণ অসুস্থ। লোকেরা তাঁকেও ধরাধরি করে মঞ্চে এনে বসিয়ে দিল। তিনি বালিশে হেলান ও কাপড় মুড়ি দিয়ে বসলেন। তাদের এই সমাবেশের উদ্দেশ্য, আনসারদের মধ্য থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) একজন খলীফা নির্বাচন। সা'দ ইবন 'উবাদা সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিতে চাইলেন। তিনি নিকটতম লোকদের বললেন, আমার আওয়াজ হয়তো সবার কানে পৌছবে না। আমি যা বলবো তোমরা তা জোর গলায় সবার কানে পৌছে দেবে। তারপর তিনি আনসারদের মর্যাদা, কার্যাবলী, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি দিক তুলে ধরে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সারকথা ছিল এরূপঃ

'আনসারদের যে সম্মান এবং দীনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগামিতা তা আরবের আর কোন গোত্রের নেই। রাসূল (সা) দশ বছরের বেশী সময় ধরে নিজ গোত্রে ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। তাঁদের না ছিল রাসূলকে (সা) নিরাপত্তা দানের শক্তি, আর না ছিল তাঁদের দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার ক্ষমতা। তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধানেই ছিল অক্ষম।

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সম্মানিত করতে চাইলেন। তাই তিনি তোমাদেরকে এক সাথে দু'টি উপাদান সরবরাহ করলেন। তোমরা ঈমান আনলে, রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাদের আশ্রয় দিলে এবং নিজেদের থেকেও আল্লাহর রাসূলকে (সা) প্রিয় মনে করলেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে জিহাদ করলে। শেষ পর্যন্ত গোটা আরব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং নিকট ও দূরের সকলেই মস্তক অবনত করে দেয়। সুতরাং এই বিজিত অঞ্চলের সবটুকু তোমাদের তলোয়ারের নিকট দায়বদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা) আজীবন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং ওফাতের সময় সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। এ সকল কারণে এ খিলাফতের একমাত্র হকদার তোমরা এবং এ ব্যাপারে আর কেউ তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনা।'

তাঁর ভাষণ শেষ হলে উপস্থিত আনসারমন্ডলী সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপনার কথা খুবই যুক্তিসম্মত। আমাদের মতে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিকতর যোগ্য আর কেউ নেই। আমরা আপনাকেই খলীফা বানাতে চাই। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা চললো। একজন বললো, যদি মুহাজিররা মানতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের কি জবাব দেওয়া যাবে? অন্য একজন তাকে বললো, আমরা তখন তাদেরকে বলবো, তাহলে আমীর দু'জন হবে- একজন আমাদের আর একজন তোমাদের। এছাড়া আর কিছুতেই আমরা রাজী হবো না। তার একথা শুনে সা'দ মন্তব্য করেনঃ এ হলো প্রথম দুর্বলতা। এদিকে আনসারদের এ সমাবেশের কথা হযরত 'উমারের (রা) কানে পৌছে গেল। তিনি হযরত আবু বকরকে (রা)

সংগে নিয়ে সাকীফা বনী সায়িদার সমাবেশে উপস্থিত হলেন। হযরত 'উমারের (রা) কঠোর প্রকৃতি আনসারদের উত্তেজিত করে তুললো। আনসারী বক্তারাও বারবার উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করছিল। হযরত 'উমার (রা) এবং তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, এমন কি তরবারির ভয়-ভীতি দেখানো পর্যন্ত পৌঁছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ধীর ও স্থির প্রকৃতির মানুষ হযরত আবু বকর (রা) 'উমারকে (রা) নিবৃত করেন এবং নিজেই এক আবেগময় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই বিখ্যাত বাণী- 'আল আয়িম্মাতু মিন কুরাইশ'- ইমাম হবে কুরাইশদের ভিতর থেকে- উল্লেখ করেন। ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাবেশের রূপ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তারপর হযরত 'উমার (রা) দাঁড়িয়ে আবু বকরের (রা) ফজীলাত ও মর্যাদা বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা শুনে আনসাররা চেঁচিয়ে বলতে থাকে- 'না'উযুবিল্লাহ আন নাতাকাদ্দামা আবা বকর' - আবু বকরের আগে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আল্লাহর পানাহ চাই।

'উমারের ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুহাজিরদের মধ্য থেকে যথাক্রমে 'উমার, আবু 'উবাইদা এবং আনসারদের মধ্য থেকে খাযরাজ গোত্রের বাশীর ইবন সা'দ সর্ব প্রথম আবু বকরের হাত স্পর্শ করে বা'ইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। তারপর সমবেত জনতা বা'ইয়াতের উদ্দেশ্যে একযোগে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরা এই বলে চেঁচাতে শুরু করে যে, সাবধান! সা'দ যেন পায়ে পিষে না যায়। একথা শুনে 'উমার (রা) বললেনঃ আল্লাহ তাকে পিষে ফেলুক। এমনিতেই সা'দ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছিলেন। 'উমারের একথায় তিনি দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে লোকদের বললেন ঃ তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। (দ্রঃ মুসনাদ-১/২১; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা-১/১৬৮, ১৬৯; তাবারীঃ হিজরী ১১ সনের ঘটনাবলী-১৮৪৩; বুখারী-২/১০১০; হায়াতুস সাহাবা-২/১২-১৮)

'আল্লামা যিরিক্লী 'ফিল বুদয়ি ওয়াত তারীখ' (৫/১৩২) গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানরা যখন আবু বকর (রা) উদ্ধৃত হাদীস 'আল-আয়িম্মাতু মিন কুরাইশ' মেনে নিয়ে তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করে তখন সা'দ বলেন ঃ 'লা ওয়াল্লাহ্! লা উবায়ি'উ কুরাশিয়্যাম আবাদা'- আল্লাহর কসম, না। আমি কক্ষণো কোন কুরাইশীর হাতে বা'ইয়াত করবো না। (আল-আ'লাম-৩/১৩৫)

বেশ কিছু দিন খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে কোন রকম ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না। শেষে একদিন এক ব্যক্তিকে বলে পাঠালেন যে, সা'দ যেন এসে বাই'য়াত করে যান। সা'দ বাই'য়াত করতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। হযরত 'উমার (রা) খলীফাকে বললেন, তাঁর থেকে আপনি অবশ্যই বাই'য়াত নিন। সেখানে হযরত বাশীর ইবন সা'দ আল-আনসারীও ছিলেন। তিনি বললেন, একবার যখন তিনি বাই'য়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন আর কোন ভাবেই তাঁর থেকে বাই'য়াত নেওয়া যাবেনা। চাপাচাপি করলে রক্তারক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তিনি রুখে দাঁড়ালে তাঁর পরিবার ও বংশের লোকেরাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত গোটা খাযরাজ গোত্রই তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে একটি ঘুমন্ত ফিত্না জাগিয়ে তোলা উচিত হবে না। আমার মতে তাঁকে থাকতে দিন, একটি লোক কী আর করবে? বাশীরের এ মত সবাই পছন্দ করলেন। হযরত সা'দ (রা) খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের শেষ পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। অবশেষে মদীনা ছেড়ে শামে চলে যান এবং দিমাশ্কের নিকটবর্তী- 'হাওরান' নামক একটি উর্বর ও সবুজ স্থান বসবাসের জন্য নির্বাচন

করেন। আমরণ সেখানেই বসবাস করেন। (উসুদুল গাবা–২/৮৪; আনসাবুল আশরাফ–১/৫৮৯; তারীখু ইবন আসাকির–৬/৯০)

হযরত সা'দের মদীনা ত্যাগের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) খলীফা হওয়ার পর বাই'য়াত থেকে দূরে থাকার জন্য একবার তাঁকে তিরস্কার করেন। জবাবে সা'দ বলেনঃ আপনার বন্ধু আবু বকর আমার কাছে আপনার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ছিলেন। আল্লাহর কসম! আপনার প্রতিবেশীত্ব আমাকে অতিষ্ট করে তুলেছে। 'উমার বলেনঃ কেউ তার প্রতিবেশীকে পছন্দ না করলে দূরে সরে যেতে পারে। এরপর সা'দ কালবিলম্ব না করে শামে চলে যান। (আল–আ'লাম–৩/১৩৫; তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮৪)

হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে হিজরী ১১, ১৪ ও ১৫ সনের কথা উল্লেখ আছে। ইবন আসাকির হিজরী ১৪ সনটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। (তারীখ–৬/৯১) আবু 'উবাইদ কাসেম ইবন সাল্লামের মতে তিনি 'হাওরানে' মারা যান। এবং সেখানেই দাফন করা হয়। আর দিমাশ্‌কের 'আল–মুনীহা' নামক স্থানে তাঁর যে কবরের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ইবন আসাকির তা সঠিক বলে মনে করেননি। (তারীখু ইবন আসাকির–৬/৯১; আল–ইসতী'য়াব; টীকা আল–ইসাবা–২/৪০; উসুদুল গাবা–২/২৮৪)

হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ হত্যা সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। বালাজুরী বলেনঃ সা'দ ইবন 'উবাদা শামে হিজরাত করেন এবং সেখানে নিহত হন। তিনি আবু বকরের হাতে বাই'য়াত করেননি। 'উমার (রা) তাঁর কাছে একজন লোক পাঠান। তাঁকে বলে দেন তাঁকে বাই'য়াত করতে বলবে। যদি অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। লোকটি শামে গেল এবং সা'দকে 'হাওরানের' একটি প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানে পেল। সে তাঁকে বাই'য়াত করতে বললো। তিনি বললেনঃ আমি কোন কুরাইশের হাতে বাই'য়াত করবো না। লোকটি বললোঃ তাহলে আমি আপনাকে হত্যা করবো। তিনি বললেনঃ আমাকে হত্যা করলেও আমি বাই'য়াত করবো না। লোকটি তখন বললোঃ তাহলে গোটা উম্মাত যাতে ঢুকেছে আপনি কি তার বাইরে? বললেন; বাই'য়াতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তাদের বাইরে।

লোকটি তখন তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৫৮৯) ডঃ হামীদুল্লাহ বলেন, এটা চরমপন্থী শিয়াদের একটি মনগড়া কথা। (আনসাবুল আশরাফঃ টীকা–১/২৫০) অন্য একটি বর্ণনা মতে, কেউ তাঁকে হত্যা করে গোসল খানায় ফেলে রাখে। বাড়ীর লোকেরা যখন দেখতে পায় তখন তাঁর প্রাণ স্পন্দন থেমে গেছে। তাঁর সারা দেহ নীল হয়ে যায়। ঘাতকের সন্ধান করেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুধু দূর থেকে ভেসে আসা কবিতার একটি চরণ আবৃত্তির শব্দ শোনা যায়, যার অর্থ এরূপঃ 'আমরা খাযরাজ নেতা সা'দ ইবন 'উবাদাকে হত্যা করেছি। আমরা দুইটি তীর নিক্ষেপ করেছি এবং তাঁর কলিজা ভেদ করতে ভুল করিনি।' যেহেতু ঘাতকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং শব্দ শোনা গেছে, এজন্য অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁকে জ্বীনে হত্যা করেছে। (দ্রঃ উসুদুল–গাবা–২/২৮৫; আল–ইসতী'য়াবঃ আল–ইসাবার পার্শ্ব টীকা–২/৪০; আনসাবুল আশরাফ–১/২৫০)

হযরত সা'দের দুই স্ত্রী ছিল–গাযিয়্যা বিনতু সা'দ ইবন খলীফা ও ফুকাইহা বিনতু 'উবায়েদ ইবন দুলাইম। ফুকাইহা ছিলেন সা'দের চাচাতো বোন। তিনি সাহাবিয়্যাও ছিলেন। গাযিয়্যার গর্ভে সা'দের তিন ছেলে সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান এবং ফুকাইহার গর্ভে দুই ছেলে কায়স, সাদুস ও এক মেয়ে উমামা জন্মগ্রহণ করেন। (তাবাকাত–৩/৬১৩; আল–ইসতীয়াবঃ আল–ইসাবার পার্শ্ব টীকা–২/৫৩৮)

হযরত সা'দের প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছিল, মদীনা ত্যাগের পর সবই ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে দেন। এক ছেলে তখন পেটে। তিনি তার অংশ দিয়ে যাননি। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 'উমার (রা) কায়সকে ডেকে বলেন, তুমি তোমার পিতার ভাগ বাতিল করে দাও। কারণ, মৃত্যুর পর তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। কায়স বললেন, আমার পিতার ভাগ ঠিক থাকবে। তবে ইচ্ছা করলে সে আমার অংশটি নিতে পারে। (আল–ইসতীয়াব–২/৫৩৯)

হযরত সা'দের বাড়ীটি ছিল মদীনার বাজারের শেষ প্রান্তে। সেখানে একটি মসজিদ ও কয়েকটি দুর্গও ছিল। বনু হারিস পল্লীতে তাঁর আর একটি বাড়ী ছিল। (খুলাসাতুল ওফা'–৮৮)

হযরত রাসূলে কারীমের (রা) হাদীসের প্রতি সা'দ অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। সাহাবীদের যুগে ব্যাপকভাবে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। কুরআন ও লেখা হয়েছিল। তাসত্ত্বেও হাদীস লেখার ব্যাপক প্রচলন তখন হয়নি। তবে সা'দ হাদীস লিখেছিলেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদে এ রকম একটি বর্ণনা এসেছেঃ 'কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ হাদীসটি সা'দ ইবন 'উবাদার পুস্তক বা পুস্তকসমূহে পেয়েছেন।' (মুসনাদ–৫/২৮৫) হযরত সা'দ হাদীস লেখার সাথে সাথে তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রচারও করেন। একারণে তাঁর ছেলে কায়স ও সাঈদ, পৌত্র শুরাহবীল, প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আবু 'উমামা ইবন সাহল, তাবে'ঈ ইবন মুসায়্যিব প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮৪)

হযরত সা'দের চরিত্রে দানশীলতার গুণটির চরম বিকাশ ঘটেছিল। 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রকারদের প্রায় প্রত্যেকে তাঁর চরিত্র রূপায়ণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল'। শুধু তিনি নন, পুরুষানুক্রমে তাঁরা ছিলেন আরবের বিখ্যাত দানশীল। তাঁর চার পুরুষ বদান্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। এমন গৌরব সে যুগে খুব কম লোকেরই ছিল। তার দাদা দুলাইম, পিতা 'উবাদা, পুত্র কায়স এবং তিনি নিজে–প্রত্যেকেই ছিলেন আপন আপন সময়ের বিখ্যাত জনহিতৈষী ও অতিথি সেবক। (আল–ইসতীয়াবঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৩৬)

তাঁর দাদার সময় আতিথেয়তা এত ব্যাপক ছিল যে, একজন ঘোষক দুর্গের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে আহবান জানাতো, যারা গোশ্ত, চর্বি ও উপাদেয় খাবার খেতে চায় তারা যেন আমাদের অতিথি হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) একবার সা'দের দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নাফে'কে ডেকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন, এ হচ্ছে সা'দের দাদার দুর্গ। একজন ঘোষক এ দুর্গের চূড়ায় উঠে ঘোষণা করতোঃ কেউ চর্বি–গোশ্ত খেতে চাইলে দুলাইমের বাড়ীতে এসো। দুলাইম মারা গেলে তাঁর ছেলে 'উবাদার সময়েও একই রকম ঘোষণা দেওয়া হতো। সা'দের সময়ও এ ধারা অব্যাহত থাকে। আমি সা'দের ছেলে কায়সকেও একই রকম করতে দেখেছি। কায়স ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। (আল–ইসতী'য়াবঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৩৬–৩৭)

প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর বলেনঃ আমি সা'দ ইবন 'উবাদাকে তাঁর দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা দিতে দেখেছিঃ কেউ চর্বি ও গোশ্‌ত পছন্দ করলে সা'দ ইবন 'উবাদার বাড়ীতে এসো। তারপর তাঁর ছেলেকেও আমি একই রকম করতে দেখেছি। যৌবনে একদিন আমি মদীনার রাস্তায় হাঁটছি। এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আমার পাশ দিয়ে 'আওয়ালীতে তাঁর ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে বললেনঃ বালক, দেখতো সা'দ ইবন 'উবাদার দুর্গের ওপর থেকে কেউ আহবান জানাচ্ছে কিনা। আমি তাকিয়ে দেখে বললামঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি ঠিকই বলেছ। (তাবাকাত–৩/৬১৩; হায়াতুস সাহাবা–২/১৮৯) এমন ব্যাপক আতিথেয়তা ও দানশীলতা বনী সা'য়িদাকে মদীনার 'হাতেম' বানিয়ে দিয়েছিল।

ইসলাম ও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি সা'দের বদান্যতার অনেক মুখরোচক কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে দু' একটি সত্য কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

হযরত রাসূলে কারীম (রা) যখন হিজরাত করে মদীনায় আসলেন তখন সা'দের বাড়ী থেকে রাসূল (রা) ও তাঁর পরিবারের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত খাবার আসতো। প্রতিদিন বড় এক গামলা গোশ্‌ত অথবা দুধের সারীদ অথবা সিরকা ও তেল বা ঘিয়ের সারীদ আসতো, এই পাত্রটি রাসূল (রা) ও তাঁর সহধর্মিনীদের গৃহে চক্‌কর দিত। (আল–ইসাবা–২/৩০; তাবাকাত–৩/৬১৪; হায়াতুস সাহাবা–২/৭০০)

একবার সা'দ ইবন 'উবাদা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্য বরতন ভর্তি রান্না করা মগজ নিয়ে আসলেন। রাসূল (রা) বললেনঃ এটা কি? সা'দ বললেনঃ যিনি সত্য সহকারে আপনাকে পাঠিয়েছেন সে সত্তার নামে শপথ, আমি আজ ৪০টি তাজা–মোটা উট নহর (জবেহ) করেছি। আমার ইচ্ছা হলো আপনাকে একটু পেট ভরে মগজ খাওয়াই। রাসূল (সা) খেলেন এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। (কানযুল 'উম্মাল–৭/৪০; হায়াতুস সাহাবা–২/১৮৯)

সাহাবীদের 'আসহাবে সুফ্‌ফা' নামে একটি দল ছিল। যাঁরা বহু দূর–দূরান্ত থেকে ঘর–বাড়ী ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। তাদের এখানে আসা ও অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'ইলম হাসিল এবং দীনের প্রশিক্ষণ লাভ করা। রাসূল (সা) তাদেরকে সচ্ছল সাহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিতেন। অন্যরা যেখানে দুই একজন করে সাথে নিয়ে যেতেন, সেখানে হযরত সা'দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৮০ জনকে আহার করানোর জন্য নিয়ে যেতেন। (আল–ইসাবা–২/৩০; কানযুল 'উম্মাল–৫/১৯০; হায়াতুস সাহাবা–২/১৯৬)

ইয়াহইয়া ইবন 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণিত আছে। সা'দ ইবন 'উবাদা ও তাঁর ছেলে কায়স ইবন সা'দ পালাক্রমে জিহাদে যেতেন। একবার সা'দ লোকদের সাথে জিহাদে গেলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাইরের অনেক অতিথি এলো। সেনা শিবিরে বসে সা'দ একথা জানতে পেয়ে বললেনঃ কায়স যদি আমার ছেলে হয় তাহলে আমার দাস নিস্‌তাসকে ডেকে বলবে, চাবি দাও, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মেটানোর জন্য খাবার বের করে নিই। তখন হয়তো নিস্‌তাস বলবেঃ তোমার আব্বার চিঠি নিয়ে এসো। এতে কায়স হয়তো ক্ষেপে গিয়ে তার নাকে ঘুষি মেরে চাবিটি ছিনিয়ে নেবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মত খাদ্য বের করে নেবে। আসলে ব্যাপারটিও তাই হয়েছিল। সেবার কায়স রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এক শো ওয়াসক খাদ্য নিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা–২/২০০)

ওয়াকিদী বলেনঃ বিদায় হজ্জের সময় একদিন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ভারবাহী পশুটি হারিয়ে গেল। সা'দ ও কায়স সাথে সাথে একটি পশু নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তাঁর পশুটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সা'দ আরজ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জেনেছি, আপনার পশুটি হারিয়ে গেছে। তাই এ পশুটি নিয়ে এসেছি। রাসূল (সা) বললেনঃ আল্লাহ আমার বাহনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এটি নিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন। ওহে আবু সাবিত! আমি মদীনায় আসার পর থেকে তোমরা যে সমাদর করেছ তাকি যথেষ্ট নয়? সা'দ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সম্পদ থেকে যা আপনি গ্রহণ করেন না তার চেয়ে যা কিছু আপনি গ্রহণ করেন তাই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। রাসূল (সা) তাঁর কথা সমর্থন করে বলেনঃ আবু সাবিত! সত্য বলেছ। সুসংবাদ লও। তুমি সফলকাম হয়েছ। (তারীখু ইবন আসাকির-৬/৮৮)

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। সা'দ ইবন 'উবাদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জানতে চান যে, তাঁর মা একটি মান্নত মেনেছিলেন; কিন্তু তা পূরণ না করেই মারা গেছেন। এখন তিনি কি তা পূরণ করে দেবেন? রাসূল (সা) তাঁকে পূরণ করে দিতে বলেন। এমনি ভাবে তাঁর মা'র পক্ষ থেকে সাদাকা করার কথা জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা) তাঁকে বলেনঃ হাঁ তুমি তা করতে পার। তখন সা'দ রাসূলকে (সা) সাক্ষী রেখে তাঁর 'আল-মিখরাফ' বাগিচাটি দান করার কথা ঘোষণা করেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে। সা'দ তাঁর মা'র মৃত্যুর পর একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ কোন সাদাকা সবচেয়ে ভালো? তিনি বলেনঃ তুমি মানুষকে পানি পান করাও।

সা'দ মদীনার মসজিদে তাঁর মায়ের নামে পানি পানের ব্যবস্থা করেন। যা বহু দিন যাবত 'সিকায়া আলে সা'দ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রা) নিকট জানতে চায় যে, সা'দের মায়ের নামে যে পানির ব্যবস্থা তাতো সাদাকা। সে পানি কি আমি পান করতে পারি? হাসান (রা) জবাব দিলেনঃ আবু বকর ও 'উমার যখন পান করেছেন তখন তোমার আপত্তি কিসে? (তাবাকাত-৩/৬১৪, ৬১৫; মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৫/২৮৫)

'জাতুল ফুদুল' নামে সা'দ ইবন 'উবাদার একটি বর্ম ছিল। রাসূল (সা) যে দিন বদরের উদ্দেশ্যে বের হন, সা'দ বর্মটি তাঁকে দান করেন। সেই সাথে 'আল-আদব' নামে একখানি তরবারিও দান করেন। এ দু'টি যুদ্ধাস্ত্র রাসূল (সা) বদরে ব্যবহার করেন। এই বদরে রাসূল (সা) 'জুল-ফিকার' তরবারিটি গনীমাত হিসাবে লাভ করেন। ওয়াকিদীর মতে ঐ তরবারিটি ছিল কাফির সৈনিক মুনাব্বিহ অথবা নাবীহ্ ইবন হাজ্জাজের। কালবীর মতে আল-আ'স ইবন মুনাব্বিহ্ ইবন হাজ্জাজের। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫২১)

ইবন 'আসাকির হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার সা'দ ইবন 'উবাদা নবী কারীমকে (সা) আহারের দাও'য়াত দিলেন। তিনি উপস্থিত হলে সা'দ খেজুর ও হাড়সহ গোশ্ত হাজির করলেন। রাসূল (সা) তা খেলেন এবং এক পেয়ালা দুধও পান করলেন। শেষে বললেন ঃ নেক্কার লোকেরা তোমার খাবার খেয়েছে, রোযাদাররা ইফ্তার করেছে এবং ফিরিশ্তারা তোমাদের জন্য দু'আ করেছে। হে আল্লাহ! সা'দ ইবন 'উবাদার পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। (কানযুল 'উম্মাল-৫/৬৬; হায়াতুস সাহাবা-২/১৮৯, ৩৬৪)

এভাবে হযরত সা'দের আতিথেয়তা, দানশীলতা, উদারতা ও বদান্যতার বহু কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি হযরত সা'দের ভালোবাসার রূপ এমন ছিল যে, রাসূল (সা) সম্পর্কে তাঁর গোত্রের অতি গোপন কথাটিও তিনি তাঁর নিকট পৌঁছে দিতেন। হাওয়াযিন যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) 'তালীফে কুলুবের' জন্য কুরাইশ বংশের নও মুসলিমদেরকে গনীমতের বড় বড় অংশ দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে অনেক আনসার যুবক ক্ষুব্ধ হয়ে বললোঃ রাসূল (সা) স্বগোত্রীয় লোকদের দিলেন এবং আমাদেরকে মাহরূম করলেন। অথচঃ আমাদের তরবারি হতে এখনো কুরাইশদের রক্ত ঝরছে। সা'দ ইবন 'উবাদা সাথে সাথে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। তিনি সা'দকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার মত কি? বললেনঃ আমিও আমার সম্প্রদায়ের একজন। তবে এমন কথা বলিনা। রাসূল (সা) তাঁকে বললেনঃ যাও, লোকদের অমুক তাঁবুতে সমবেত কর। ঘোষণা শুনে মুহাজির ও আনসার উভয় সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হলো। সা'দ শুধু আনসারদের থাকতে বলে মুহাজিরদের চলে যেতে বললেন। তারপর রাসূল (সা) এসে এক আবেগময় ভাষণ দান করলেন। সে ভাষণের কিছু অংশ ছিল এরূপঃ তোমরা কি এতে খুশী নও যে, অন্যরা ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাক, আর তোমরা আমাকে নিয়ে ফিরবে? রাসূলুল্লাহর (সা) এমন প্রশ্নে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সমস্বরে তারা জবাব দেয়, আপনার পরিবর্তে গোটা দুনিয়া কিছুই না। (বুখারী-২/৬২০; মুসনাদ-৩/৭২০; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯৮, ৪৯৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৮)

উহুদ যুদ্ধের সময় গোটা মদীনা একটা মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ে। এ সময় সা'দ ইবন 'উবাদা নিজের বাড়ী ছেড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ী পাহারা দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীমও (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যেতেন। সা'দের ছেলে কায়স বলেনঃ একবার রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে আসলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি সালাম দিলেন। সা'দ সালাম শুনে খুব নিচু স্বরে জবাব দিলেন। কায়স বললেনঃ আপনি কি রাসূলকে (সা) ভিতরে আসার অনুমতি দেবেন না? সা'দ বললেনঃ দেরী কর। তাঁকে আমাদের ওপর একটু বেশী করে সালাম দেওয়ার সুযোগ দাও। রাসূল (সা) তিনবার সালাম দিয়ে কোন জবাব না পেয়ে ফিরে চললেন। সা'দ তখন দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি আপনার সালাম শুনেছি। জবাবও দিয়েছি একটু আস্তে আস্তে। আমি চেয়েছি, আপনি আমাদের ওপর একটু বেশী সালাম দিন। রাসূল (সা) সা'দের সাথে আবার ফিরে আসলেন। সেদিন তিনি সা'দের বাড়ীতে আহার করে তাঁর পরিবারের সকলের জন্য দু'আ করেন। (উসুদুল গাবা-২/২৮৩ হায়াতুস সাহাবা-২/৪৯১, ৫১৫; ৩/৩১৪)

একবার রাসূল (সা) এক দু'আয় বলেনঃ হে আল্লাহ! আনসারদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষ করে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে।

একবার হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ী গেলেন। তিনি সোজা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইশারায় দূরে সরে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার দরজার সামনে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূল (সা) বললেনঃ যখন দরজার সামনেই থাকবে, অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। (হাযাতুস সাহাবা-২/৫১৬)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাত আদায়কারী হিসাবে সা'দকে নিয়োগ করলেন। একদিন রাসূল (সা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ কিয়ামতের দিন যাতে তোমাকে উট কাঁধে করে উঠতে

না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। সা'দ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তেমন কিছু করি তাহলে সত্যি এমন হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ। সা'দ আরজ করলেনঃ আমাকে অব্যাহতি দিন। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে অব্যাহতি দান করেন। (তারীখু ইবন আসাকির–৬/৮৯; মুসনাদ–৫/২৮৫)

একবার হযরত সা'দ অসুস্থ হলে রাসূল (সা) সাহাবীদের সংগে করে তাঁকে দেখতে যান। সা'দ অচেতন ছিলেন। সাহাবীদের মধ্য থেকে নানাজনে নানারকম মন্তব্য করলেন। কেউ বললেন, শেষ হয়ে গেছে। কেউ বললেন, না এখনো দম আছে। একথা শুনে রাসূল (সা) কেঁদে ফেলেন। সাথে সাথে গোটা মজলিসে কান্না শুরু হয়ে যায়। (বুখারী–২/১৭৪)

আর একবার রাসূল (সা) যায়িদ ইবন সাবিতকে বাহনের পিছনে বসিয়ে অসুস্থ সা'দকে দেখতে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৬৯)

একবার রাসূল (সা) সা'দকে দেখতে যাচ্ছেন। পথে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূল বসে ছিল। সে রাসূলকে (সা) কিছু কটু কথা বললো। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয় হয় অবস্থা। রাসূল (সা) সকলকে নিবৃত্ত করলেন এবং সা'দের বাড়ী উপস্থিত হলেন। তিনি বললেনঃ সা'দ! আজ আমাকে আবু হুবাব (ইবন উবাই) যে সব কথা বলেছে তাকি শুনেছ? সা'দ আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আসল কথা হলো, ইসলাম আসার পূর্বে মানুষ ধারণা করেছিল সে মদীনার বাদশাহ হবে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে পাঠালেন তখন তাদের সে ধারণা চুরমার হয়ে গেল। এটা হলো সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশ। এবার রাসূল (সা) তাঁর অনুরোধে ইবন উবাইকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী–২/৬৫৬; হায়াতুস সাহাবা–২/৫০৯) হযরত সা'দ যে নরম প্রকৃতির ও শান্তিপ্রিয় স্বভাবের ছিলেন উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা তা বুঝা যায়।

ইবন 'আসাকির হযরত যায়িদ ইবন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর ছেলেকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন। সালাম বিনিময়ের পর রাসূল (সা) তাঁকে বললেনঃ এখানে, এখানে। এই বলে তাঁকে ডান পাশে বসালেন। তারপর বললেনঃ মারহাবান বিল আনসার, মারহাবান বিল আনসার– আনসারদের প্রতি স্বাগতম, আনসারদের প্রতি স্বাগতম! ছেলেটি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাসূল (সা) বসতে বললেন। সে বসে পড়লো। একটু পরে তিনি তাকে কাছে আসতে বললেন। সে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ও পায়ে চুমু দিল। রাসূল (সা) বললেনঃ আমিও আনসারদের একজন। সা'দ তখন বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন যেমন আপনি আমাদের সম্মান দেখিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন, আমার সম্মান দেখানোর আগেই আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত করেছেন। আমার পরে তোমরা অনেক কষ্ট ভোগ করবে। তখন সবর করবে। অবশেষে হাউজে কাওসারের নিকট আমার সাথে তোমাদের আবার সাক্ষাত হবে। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪০৪)

হযরত সা'দের একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা মজলিস ছিল। একদিন রাসূল (সা) সেখানে গিয়ে কিভাবে রাসূলের (সা) ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৪)

হযরত সালমান আল–ফারেসী (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মনিবের হাত থেকে মুক্তি লাভের

উদ্দেশ্যে তার সাথে একটি চুক্তি করেন। তার একটি শর্ত ছিল, তিনি মনিবকে ৩০০ (তিন শো) খেজুরের চারা লাগিয়ে দেবেন। হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁকে ষাটটি (৬০) চারা দিয়ে সাহায্য করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৮৭)

এক সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দশটি গর্ভবতী উট ছিল। তার তিনটিই স'াদ তাঁকে দান করেন। তার একটির নাম ছিল 'মুহরাহ্'। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫১২)

সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সা'দ ইবন 'উবাদা পরার জন্য তাঁকে কাপড় দান করেন। সেই কাপড় পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গেলে তিনি বলেনঃ যে তাকে কাপড় পরিয়েছে আল্লাহ তাকে জান্নাতের কাপড় পরাবেন। সাফওয়ান তখন বলেঃ আমাকে সা'দ ইবন 'উবাদা কাপড় দান করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৮৯)

হযরত ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াত- 'যারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আারোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি দুর্‌রা লাগাবে এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না। তারাই ফাসিক'- নাযিল হয় তখন সা'দ ইবন 'উবাদা বলে ওঠেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এভাবে নাযিল হয়েছে? তাঁর মধ্যে বিস্ময়ের ভাব দেখে রাসূল (সা) বলেনঃ ওহে আনসারগণ! শোন, তোমাদের নেতার কথা শোন। তারা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ তিনি একজন প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। আল্লাহর কসম। তিনি কুমারী ছাড়া কোন মেয়ে বিয়ে করেননি। তেমনিভাবে তাঁর তালাক দেওয়া কোন মহিলাকেও কেউ কখনো বিয়ে করতে সাহস করেনি। এর একমাত্র কারণ, তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ। সা'দ বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি জানি এটি সত্য এবং আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, একজন দুরাচারীকে আমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে দেখেও তাকে কিছুই না বলে চারজন সাক্ষীর তালাশে বেরিয়ে যাব এবং তাকে নির্বিঘ্নে তার কুকর্ম শেষ করার সুযোগ করে দেব। আল্লাহর কসম! আমি যখন সাক্ষী নিয়ে ফিরে আসবো তখন তো তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বলেনঃ কক্ষণো না। সেই সত্তার নামে শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্যই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করবো। তখন রাসূল (সা) আনসারদের ডেকে বলেন, শোন, তোমাদের নেতার কথা শোন। সে অবশ্যই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক। তবে তার থেকেও আমি এবং আমার থেকেও আল্লাহ বেশী মর্যাদাবোধের অধিকারী। (দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৮৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৮, ৬৩৯)

মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন আবু 'উবাইদাহ, মু'য়াজ, বিলাল ও সা'দ ইবন 'উবাদার মত প্রথম শ্রেণীর সাহাবীরা শামে গেলেন তখন সেখানের একজন খৃষ্টান রাহিব (সাধক) তাদেরকে দেখে মন্তব্য করেনঃ হযরত 'ঈসার যে সকল হাওয়ারীকে (সাথী) শূলীতে চড়ানো হয়েছিল এবং করাত দিয়ে দু'ফালি করে ফেলা হয়েছিল তারাও সংগ্রামে মুহাম্মাদের (সা) এ সকল সাহাবীদের সমকক্ষ ছিলেন না। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৯১) ■

স্া'দ ইবনুর রাবী' (রা)

সা'দ ইবনুর রাবী আল-আনসারী মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু আল-হারিস শাখার সন্তান। হায়সাম উল্লেখ করেছেন, 'আবুর রাবী' তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম। পিতা আর-রাবী ও মাতা হুযাইলা বিন্‌তু ইনৃবা। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁর জন্মসন সম্পর্কে নীরব। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, তাবাকাত-৩/৫২২, উসুদুল গাবা- ২/২৭৭)

সা'দ ইবনুর রাবী'র ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। আবূ নু'য়াইম তাঁর 'দালায়িল' গ্রন্থে 'আকীল ইবন আবী তালিব ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রথম 'আকাবায়, যে বার ছয়জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) ইসলাম গ্রহণ করে বায়'য়াত করেন তাঁদের একজন ছিলেন সা'দ। সেই ছয় ব্যক্তি হলেন ঃ ১· আস'য়াদ ইবন যুরারা ২· আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান ৩· আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ৪· সা'দ ইবনুর রাবী' ৫· আন-নু'মান ইবন হারিসা ও ৬· 'উবাদা ইবনুস সামিত। (হায়াতুস সাহাবা-১/১০৫) পক্ষান্তরে কোন কোন বর্ণনায় বুঝা যায়, তিনি দ্বিতীয় আকাবার বারো সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি এই দ্বিতীয় 'আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় আকাবায় তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন লোকের সংগে তিনি যোগ দেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে তাঁদের গোত্র বনু আল-হারিস ইবনুল খাযরাজের যুগ্ম 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮১, তাবাকাত-৩/৫২২, উসুদুল গাবা-২/২২৭)

ইবন হিশাম বর্ণনা করেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুবা থেকে যে দিন মদীনায় উপস্থিত হন, মদীনার সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে স্বাগতঃ জানায়। তিনি বিভিন্ন গোত্রের ভিতর দিয়ে চলছিলেন, আর সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর বাহনের পথ রোধ করে তাদের ওখানে অবতরণের আবেদন জানাচ্ছিল। যখন তিনি বনু আল-হারিস ইবনুল খাযরাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সা'দ ইবনুর রাবী খারিজা ইবন যায়িদ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বনী হারিসার আরও কিছু লোক সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাওয়ারীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে 'আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাদের সংখ্যা, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষার দিকে আসুন। (অর্থাৎ আপনাকে সম্মানের সাথে আশ্রয় দানের মত ক্ষমতা আমাদের আছে) রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা আমার বাহনের পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত। তাঁরা সবাই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫)

যুহরী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সাদ ইবনুর রাবী ও আবদুর রহমান ইবন 'আউফের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। হযরত সা'দ তাঁর এই মুহাজির ভাইয়ের প্রতি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখান দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। অন্যান্য আনসারগণ নিজ নিজ অর্থ-সম্পদ, জায়গা-জমি সবই অর্ধেক তাঁর দ্বীনী মুহাজির ভাইকে ভাগ করে দেন; কিন্তু হযরত সা'দ অর্থ-সম্পদ ছাড়াও একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার দ্বীনী ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আর আব্দুর রহমান

যদিও সে সময় রিক্ত ও নিঃস্ব, তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি সা'দের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্পর্কে আনাস ইবন 'আউফ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ সা'দ তাঁর দ্বীনী ভাইকে সংগে করে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং এক সাথে আহার করেন। তারপর বলেন ঃ আল্লাহর নামে আপনি আমার ভাই। আপনার স্ত্রী নেই; কিন্তু আমার দুই স্ত্রী। একজনকে আমি তালাক দেব, আপনি তাঁকে বিয়ে করবেন। আব্দুর রহমান বলেন ঃ আল্লাহর কসম! কক্ষনো না। সা'দ বললেন ঃ আমার বাগানে চলুন, আধা-আধি ভাগ করে নিই। আব্দুর রহমান বললেন ঃ না। আল্লাহ আপনার ছেলে-মেয়ে ও মাল-দৌলতে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করুন। এসবের কোন কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি একটু দেখিয়ে দিন। (আল-ইসাবা-৩/২৬, উসুদুল গাবা-২/২৭৮, তাবাকাত-৩/৫২৩)

হযরত সা'দ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি বনী মাখযুমের রিফা'য়া ইবন রিফা'য়াকে হত্যা করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১১, তাবাকাত-৩/৫২৩)

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশরা ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করলো। তাদের সেই সমর প্রস্তুতির খবর দিয়ে একটি চিঠি মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব গোপনে মদিনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। চিঠিতে তিনি তাদের প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে এ কথাও লিখেন যে, 'তারা তোমাদের ওপর আপতিত হলে, তোমরা যা ভালো মনে কর তাই করবে এবং সেই জন্য প্রস্তুতি নাও।' বনী গিফারের একটি লোক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কুবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে চিঠিটি পৌঁছে দেয়। রাসূল (সা) সর্বপ্রথম তা উবাই ইবন কা'বকে পড়তে দেন এবং গোপন রাখতে বলেন। তারপর সা'দ ইবনুর রাবী'র নিকট আসেন এবং তাঁকেও বিষয়টি অবহিত করেন। তাঁকেও কথাটি কারও নিকট ফাঁস না করার নির্দেশ দেন। রাসূল (সা) চলে যাওয়ার পর সা'দের স্ত্রী সা'দকে জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূল (সা) তোমাকে কি বললেন ?

সা'দ ঃ তোমার মা নিপাত যাক। তোমার তা শোনার কি প্রয়োজন?

স্ত্রী ঃ আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। এই বলে তিনি সব কথা সা'দকে শোনান। সা'দ ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে বললেন ঃ দেখছি, তুমি আমাদের কথা আঁড়ি পেতে শুনে থাক। সা'দ তাঁর স্ত্রীকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হলেন এবং সব ঘটনা খুলে বলার পর আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহঃ আমার ভয় হচ্ছে, খবরটি হয়ত ছড়িয়ে পড়বে, আর আপনি ধারণা করবেন আমিই তা ছড়িয়েছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ বিষয়টি ছেড়ে দাও। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৩-৩১৪)

হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে একদল প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পরাস্ত করে হত্যা করে। (আল-আ'লাম-৩/১৩৪, উসুদুল গাবা-২/২৭৭, আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩০) তাঁর দেহে তীর-বর্শার মোট বারোটি আঘাত লাগে। তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছেন তখন মালিক ইবন দুখশান তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ মুহাম্মাদ (সা) নাকি নিহত হয়েছেন, তুমি জান ? সা'দ জবাব দেন, তিনি নিহত হলেও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তুমি তোমার দ্বীনের পক্ষে জিহাদ কর। মুহাম্মাদ (সা) তো তাঁর রবের বাণী ও দ্বীনের বিধি-বিধান পৌঁছানোর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করে গেছেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৭, তাবাকাত-৩/৫২৩)

উহুদের যুদ্ধ শেষে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেন ঃ কেউ সা'দ ইবনুর রাবী'র খোঁজ নিয়ে আসতো। এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি যাচ্ছি। যারকানী বলেন, লোকটি পড়ে থাকা লাশগুলির চারপাশে চক্কর দিয়ে সা'দের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। কিন্তু যখন তিনি এই কথা বলে চিৎকার করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার খোঁজে আমাকে পাঠিয়েছেন। তখন ক্ষীণকণ্ঠের একটা আওয়াজ ভেসে এল; আমি মৃতদের মধ্যে। তখন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, জিহ্বাও আয়ত্তে নেই। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোকটি যখন তাঁর খোঁজে ঘুরাঘুরি করছে, তখন সা'দই তাঁকে ডাক দেন। যাই হোক, সেই অবস্থায় সা'দ তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলবেন, আমাকে বারোটি আঘাত করা হয়েছে। আমিও আমার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। আর আনসারদের বলবেন, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসূল (সা) নিহত হন, আর তোমাদের একজনও জীবিত ফিরে যাও, আল্লাহকে মুখ দেখানোর যোগ্য তোমরা থাকবে না। কারণ, 'লাইলাতুল আকাবায়' (আকাবার রাত্রি) তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিলে। কোন কোন বর্ণনায় এই ব্যক্তির নাম উবাই ইবন কা'ব বলা হয়েছে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সা'দের পবিত্র রূহ তাঁর নশ্বর দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। (তাবাকাত-৩/৫২৩-২৪, আল-ইসতীয়াব-২/৩৪, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২১০, আল-ইসাবা-২/২৭)

হযরত উবাই ইবন কা'ব ফিরে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) সা'দের অন্তিম কথাগুলি পৌঁছালে তিনি বলেন, আল্লাহ তার ওপর করুণা বর্ষণ করুন। জীবন-মরণ উভয় অবস্থায় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে উপদেশ দিয়েছে। (উসুদুল গাবা-২৭৭) উহুদের অন্য এক শহীদ খারিজা ইবন যায়িদ ও সা'দকে উহুদের প্রান্তরে একই কবরে দাফন করা হয়। খারিজা ছিলেন সম্পর্কে সা'দের চাচা।

সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জাহিলী প্রথা অনুসারে তাঁর সকল সম্পত্তি দখল করে নেয়। সা'দ গর্ভবতী স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে যান। তখনও মীরাসের (উত্তরাধিকার) আয়াত নাযিল হয়নি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ বর্ণনা করেন। সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী একদিন তাঁর দুই কন্যাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এরা সা'দের কন্যা। ওদের পিতা উহুদে শাহাদত বরণ করেছে। আর ওদের চাচা সকল সহায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বসেছে, ওদেরকে কিছুই দেয়নি। অর্থ-সম্পদ ছাড়া ওদের বিয়ে শাদী হবে কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ওদের ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। এর পরই সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের এই অংশটুকু নাযিল হয় ঃ 'যদি কন্যা কেবল দুই-এর অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ।'

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মেয়ে দু'টির চাচাকে ডেকে নির্দেশ দেন ঃ সা'দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তার দুই মেয়েকে, এক-অষ্টমাংশ তাদের মাকে দেওয়ার পর বাকীটা তুমি গ্রহণ কর। (আল-ইসাবা-২/২৭, তাবাকাত-৩/৫২৪, উসুদুল গাবা-২/২৭৮, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২১০, তাছাড়া ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবন মাজা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন সা'দের কন্যা ও স্ত্রীদের জন্য এই ফায়সালা দান করেন

তখনও মাতৃগর্ভের সন্তানের কোন মীরাস বা উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়নি। এই ঘটনার অনেক পরে গর্ভের সন্তানের মীরাস দেওয়ার বিধান হয়। সা'দের স্ত্রীগর্ভের সেই সন্তানটি ভূমিষ্ট হয়। তাঁর নাম রাখা হয় উম্মু সা'দ বিনতু সা'দ এবং পরবর্তীকালে তিনি যায়িদ ইবন সাবিতের স্ত্রী হন। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যায়িদ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পিতার মীরাসের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলতে পার। বর্তমানে তিনি গর্ভের সন্তানদের মীরাসের অংশ দান করছেন। উম্মু সা'দ বললেন ঃ আমি আমার বোনদের কাছে কিছুই দাবী করবো না। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৮)

সেই জাহিলী আরবে যখন লেখার খুব কম প্রচলন ছিল, হযরত সা'দ লেখা জানতেন। (তাবাকাত–৩/৫২২, তাহজীবুল আসমা–১/২১০) যেহেতু তিনি গোত্রীয় নেতার সন্তান ছিলেন, তাই শিক্ষার বিশেষ সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং লেখাও শিখেছিলেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুখ থেকে শোনা কিছু হাদীসও মুখস্থ করেছিলেন। (উসুদুল গাবা–২/২৭৮)

তাঁর 'ঈমানী জোশ ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছিল আকাবার বাই'য়াত, উহুদের যুদ্ধ এবং মৃত্যুর পূর্বে করে যাওয়া অসীয়াতের মধ্যে।

এই সব কারণে সাহাবায়ে কিরামের নিকট হযরত সা'দের একটা বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তাঁর এক কন্যা একবার হযরত আবু বকরের (রা) নিকট আসলে তিনি তাঁর বসার জন্য নিজের কাপড় বিছিয়ে দেন। তা দেখে হযরত উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ মেয়েটি কার? খলীফা বললেন ঃ এ সেই ব্যক্তির মেয়ে– যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এমন মর্যাদা কি জন্য? বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় জান্নাতে পৌঁছে গেছেন আর তুমি–আমি এখনও এখানে পড়ে আছি। (আল–ইসাবা–২/২৭)

আবু বকর আয–যুবায়রী বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি খলীফা আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি সা'দ ইবনুর রাবীর ছোট্ট একটি মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার লালা মুছে দিচ্ছেন ও চুমু খাচ্ছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কে? তিনি জবাব দিলেন, এ এমন এক ব্যক্তির মেয়ে যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম। এ সা'দ ইবনুর রাবীর মেয়ে। তিনি ছিলেন 'আকাবার নাকীব, বদরের যোদ্ধা ও উহুদের শহীদ। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৯৫)

’আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)

’আবদুল্লাহ নাম। কুনিয়াত বা উপনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ আবু মুহাম্মদ, আবু রাওয়াহা অথবা আবু ’আমর। ‘শা’য়িরু রাসূলিল্লাহ’– ‘রাসূলুল্লাহর (সা) কবি’ তাঁর উপাধি। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনী আল–হারিস শাখার সন্তান। পিতা রাওয়াহা ইবন সা’লাবা এবং মাতা কাবশা বিনতু ওয়াকিদ। সাহাবিয়্যা ’আমরাহ বিনতু রাওয়াহা তাঁর বোন এবং কবি সাহাবী নু’মান ইবন বাশীর তাঁর ভাগ্নে। ইতিহাসে তাঁর জন্মের সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় জীবনে অতি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। (তাবাকাত–৩/৫২৫, আল–আ’লাম–৪/২১৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াললুগাত–১/২৬৫

তিনি তৃতীয় আকাবায় সত্তর জন (৭০) মদীনাবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই’য়াত করেন এবং সা’দ ইবনুর রাবী’র সাথে তিনিও বনু আল–হারিসার ‘নাকীব’ (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৪৩, ৪৫৮, তাবাকাত–৩/৫২৬, আনসাবুল আশরাফ–১/২৫২, তারীখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর–১/১৮১) তবে সম্ভবতঃ তিনি এই তৃতীয় ’আকাবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি প্রথম আকাবায় ছয়জনের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই’য়াত করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/১০৫)

ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে কুবায় উপস্থিত হলেন। তিনি যে দিন কুবা থেকে সর্বপ্রথম মদীনায় পদার্পণ করেন, সেদিন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সা’দ ইবনুর রাবী ও খারিজা ইবন যায়িদ তাদের গোত্র বনু আল–হারিসার লোকদের সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীর পথরোধ করে দাঁড়ান এবং তাঁকে তাদের গোত্রে অবতরণের বিনীত আবেদন জানান। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের বলেন, উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশমত চলছে, আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থামবে। তাঁরা পথ ছেড়ে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৯৫) হযরত রাসূলে কারীম (সা) মিকদাদ ইবন আসওয়াদ আল–কিন্দীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, ’উমরাতুল কাদা– প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কেবল হিজরী চতুর্থ সনে সংঘটিত ‘বদর আস–সুগরা’ অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান। (তাবাকাত–৩/৫২৬, সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৫৮) উল্লেখ্য যে, উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান ইবন হারব ঘোষণা দেয় যে, এখন থেকে ঠিক এক বছরের মাথায় ‘বদর আস–সুগরা’ তে আবার তোমাদের মুখোমুখি হব। রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরাইশরা অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়। এই বদর আস–সুগরা–তে রাসূল (সা) বাহিনীসহ আট দিন

অপেক্ষা করেন। এটা হিজরী চতুর্থ সনের জ্বিলকা'দ মাসের ঘটনা। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৯–৩৪০)

বদর যুদ্ধের সূচনা পর্বে কুরাইশ পক্ষের বাহাদুর 'উতবা ইবন রাবীয়া' তার ভাই শাইবা ইবন রাবীয়া ও ছেলে আল–ওয়ালীদ ইবন উতবাকে সংগে করে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে 'আউফ, মুয়াওয়াজ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সর্বপ্রথম এগিয়ে যান। 'উতবা তাঁদের জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা কারা? তাঁরা জবাব দেন ঃ আনসারদের একটি দল। 'উতবা বলল, তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাইনা। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬২৫)

বদরের বিজয় বার্তা দিয়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার চতুর্দিকে লোক পাঠান। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠান মদীনার উঁচু অঞ্চলের দিকে। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬৪২)

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাতে বন্দী কুরাইশদের সম্পর্কে সাহাবীদের মতামত জানতে চান। তাঁদের সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ প্রচুর জ্বালানী কাঠে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকায় তাদেরকে জড় করে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক। তারপর আমিই সেই কাঠে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলবো। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪২)

খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার রচিত কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,
আমরা যাকাত দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না
তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল কর,
যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখ।
যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে,
তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, আমরা অস্বীকার করবো।"
(সীয়ারেআনসার–২/৫৯)

এই খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজার নেতা কাব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সম্পাদিত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। খবরটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছে। তিনি খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন লোককে কা'বের নিকট পাঠান। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২১, আসাহ আস–সীয়ার–১৯০)

খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকান্ডের কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর তার সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নামটি উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ভাগ্নী তথা নু'মান ইবন বাশীরের বোন বলেন ঃ একদিন আমার মা 'উমরাহ বিনতু রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে কিছু খেজুর বেঁধে দিয়ে বললেন ঃ এগুলি তোমার বাবা বাশীর ও মামা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে দিয়ে এস, তাঁরা দুপুরে খাবেন। আমি সেগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আর আমার বাবা ও মামাকে

খোঁজ করছি। রাসূলে (সা) আমাকে দেখে ডাক দিলেন ঃ এই মেয়ে, এদিকে এস। তোমার কাছে কি? বললাম ঃ খেজুর। আমার মা আমার বাবা বাশীর ইবন সা'দ ও মামা 'আবদুল্লাহর দুপুরের খাবারের জন্য পাঠিয়েছেন। বললেন ঃ আমার কাছে দাও। আমি খেজুরগুলি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই হাতে ঢেলে দিলাম, কিন্তু হাত ভরলো না। তিনি কাপড় বিছাতে বললেন এবং খেজুরগুলি কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন; তারপর পাশের লোকটিকে বললেন ঃ যাও, খন্দকবাসীদের দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে বল। ঘোষণার পর, সবাই চলে এল এবং খাবার খেতে শুরু করল। তাঁরা খাচ্ছে, আর খেজুরও বাড়ছে। তাঁরা পেট ভরে খেয়ে চলে গেল, আর তখনও কাপড়ের ওপর কিছু খেজুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলো। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১১৮, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩১)

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাই'য়াতে রিদওয়ানেও 'আবদুল্লাহ যোগদান করেন।

আবু রাফে'র পরে উসাইর ইবন রাযিম ইহুদীকে খাইবারের শাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। সে গাতফান গোত্রে ঘুরাঘুরি করে তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পেয়ে ষষ্ঠ হিজরীর রমাদান মাসে তিরিশ সদস্যের একটি দলের সাথে 'আবদুল্লাহকে খাইবারে পাঠান। তিনি গোপনে উসাইর ইবন রাযিমের সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূল (সা) তিরিশ সদস্যের একটি বাহিনী 'আবদুল্লাহর অধীনে ন্যস্ত করে উসাইরকে হত্যার নির্দেশ দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৮)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উসাইরের সাথে দেখা করে বলেন, যদি আপনি নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তাহলে একটি কথা বলি। সে আশ্বাস দিল। 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনাকে খাইবারের নেতা বানানো তাঁর ইচ্ছা। তবে আপনাকে একবার মদীনায় যেতে হবে। সে প্রলোভনে পড়ে এবং তিরিশজন ইহুদীকে সংগে করে 'আবদুল্লাহর বাহিনীর সাথে চলতে শুরু করলো। পথে 'আবদুল্লাহ প্রত্যেক ইহুদীর প্রতি নজর রাখার জন্য একজন করে মুসলমান নির্দিষ্ট করে দিলেন। এতে উসাইরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল এবং ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। ধোঁকা ও প্রতারণার অপরাধে মুসলিম মুজাহিদরা খুব দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর খাইবারের মাথাচাড়া দেওয়া বিদ্রোহ দমিত হয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১৮, সীয়ারে আনসার-২/৬০)

পরে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) 'আবদুল্লাহকে খাইবারে উৎপাদিত খেজুর পরিমাপকারী হিসাবে আবারও সেখানে পাঠান। কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আবদুল্লাহর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। এক পর্যায়ে তারা ঘুষও দিতে চাইল। ইবন রাওয়াহা তাদেরকে বললেন ঃ ওহে আল্লাহর দুশমনরা। তোমরা আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? আমার প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার নিকট তোমরা বানর ও শুকর থেকেও ঘৃণিত। তোমাদের প্রতি ঘৃণা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা তোমাদের ওপর কোন রকম জুলুমের দিকে নিয়ে যাবে না। একথা শুনে তারা বলল ঃ এমন ন্যায়পরায়ণতার ওপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত। (হায়াতুস সাহাবা-২/১০৮, আল বিদায়া-৪/১৯৯)

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সে বছরের মূলতবী 'উমরাহ রাসূল (সা) পরের বছর হিজরী

সপ্তম সনে আদায় করেন। একে 'উমরাতুল কাদা' বা কাজা 'উমরা বলে। এই সফরে রাসূলে কারীম (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং উটের পিঠে বসে 'হাজারে আসাওয়াদ' চুম্বন করেন তখন আবদুল্লাহ তার বাহনের লাগাম ধরে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির কিছু অংশের মর্ম নিম্নরূপ ঃ

ওরে কাফিরের সন্তানরা! তোরা তাঁর পথ থেকে সরে যা, তোরা পথ ছেড়ে দে। কারণ, সকল সৎকাজ তো তাঁরই সাথে। আমরা তোদের মেরেছি কুরআনের ব্যখ্যার ওপর, যেমন মেরেছি তার নাযিলের ওপর। এমন মার দিয়েছি যে, তোদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্ধু ভুলে ফেলে গেছে তাঁর বন্ধুকে। প্রভু আমি তাঁর কথার ওপর ঈমান এনেছি। (তাবাকাত-৩/৫২৬-৫২৭,আলইসাবা-২/৩০৭)

এক সময় হযরত উমার (রা) ধমক দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহর হারামে ও রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এভাবে কবিতা পাঠ? রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করে বলেন ঃ 'উমার! আমি তার কথা শুনছি। আল্লাহর কসম! কাফিরদের ওপর তার কথা তীর বর্শার চেয়েও বেশী ক্রিয়াশীল। (আল-ইসাবা-২/৩০৭) তিনি আবদুল্লাহকে বলেন ঃ তুমি এভাবে বল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু, নাসারা 'আবদাহ ওয়া আ'য়াযুযা জুনদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ'- এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং একাই প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিতকরেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উপরোক্ত বাক্যগুলি আবৃত্তি করছিলেন, আর তার সাথে কন্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলেন সমবেত মুসলিম জনমন্ডলী। তখন মক্কার উপত্যকা সমূহে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছিল।(সীয়ারে আনসার-২/৬১)

হিজরী অষ্টম সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বসরার শাসকের নিকট দূত মারফত একটি চিঠি পাঠান। পথে মূতা নামক স্থানে এক গাসসানী ব্যক্তির হাতে দূত নিহত হয়। দূতের হত্যা মূলতঃ যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। রাসূল (সা) খবর পেয়ে যায়িদ ইবন হারিসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূতায় পাঠান। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন ঃ যায়িদ হবে এ বাহিনীর প্রধান। সে নিহত হলে জা'ফর ইবন আবী তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হবে। জা'ফরের পর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সেও যদি নিহত হয় তাহলে মুসলমানরা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদেরআমীরবানিয়েনেবে।

বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'সানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের বিদায় জানান। বিদায় বেলা মদীনাবাসীরা তাদেরকে বলল ঃ তোমরা নিরাপদে থাক এবং কামিয়াব হয়ে ফিরে এসো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা বলল ঃ কাঁদার কী আছে? তিনি বললেন, দুনিয়ার মুহাব্বতে আমি কাঁদছিনা। তিনি সূরা মারইয়াম এর ৭১ নং আয়াত- 'তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রব-এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত'- পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি কি সেই পুলিসিরাত পার হতে পারবো? লোকরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আল্লাহ তোমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত করবেন। তখন তিনি স্বরচিত একটি কবিতা

আবৃত্তি করেন। কবিতাটির অর্থ নিম্নরূপ। 'তবে আমি রহমানের কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আর কামনা করি অসির অন্তরভেদী একটি আঘাত, অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় নিযার এমন একটি খোঁচা, আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে– হায় আল্লাহ, সে কত ভালো যোদ্ধা ও গাজী ছিল।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৭৪, ৩৭৩ হায়াতুস সাহাবা–১/৫২৯,৫৩০)

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়িদ ও জা'ফর বাহিনীসহ সকালে মদীনা ত্যাগ করলেন। ঘটনাক্রমে সেটা ছিল জুময়ার দিন। 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জুময়ার নামায আদায় করে রওয়ানা হব। তিনি নামায আদায় করলেন। রাসূল (সা) নামায শেষে তাঁকে দেখে বললেন ঃ সকালে তোমার সংগীদের সাথে যাওনি কেন? 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, আপনার সাথে জুম'য়া আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু খরচ কর তবুও তাদের সকালে যাত্রার সাওয়াবের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।(হায়াতুস সাহাবা–১/৪৬৩)

মদীনা থেকে শামের 'মা'য়ান' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হিরাকল এক লাখ রোমান সৈন্যসহ 'বালকা'–র 'মাব' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে লাখম, জুজাম, কায়ন, বাহরা, বালী–সহ বিভিন্ন গোত্রের আরও এক লাখ লোক। এ খবর পেয়ে তাঁরা মায়ানে দুই দিন ধরে চিন্তা–ভাবনা ও পরামর্শ করেন। মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করে যে, আমরা শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতির সব খবর রাসূলকে (সা) অবহিত করি। তারপর তিনি আমাদেরকে অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন এবং আমরা সেই মোতাবিক কাজ করব।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তখন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ওহে জনমন্ডলী, এখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে পসন্দ করছো না; অথচ তোমার সবাই শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়েছো। আমরা তো শত্রুর সাথে সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের দ্বারা লড়বো না। আমরা লড়বো দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে– যে দ্বীনের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমাদের সামনে আছে দুইটি কল্যাণের যে কোন একটি– হয় বিজয়ী হবে নতুবা শাহাদাত লাভ করবে। সৈনিকরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল ঃ আল্লাহর কসম! ইবন রাওয়াহা ঠিক কথাই বলেছেন। তারা তাদের সকল দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাদের সাথে চলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৭৫, আসাহ আস–সীয়ার–২৮০)

তাঁরা 'মা'য়ান' ত্যাগ করে মূতায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এখানে অমুসলিমদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'মূতার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র তিনহাজার আর শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অগণিত। (সীয়ারে আনসার–২/৬২)

প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেনাপতি যায়িদ ইবন হারিসা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলেন। জা'ফর তাঁর পতাকাটি তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন। এবার আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার মুহূর্তে তাঁর মনে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। তিনি সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

'হে আমার প্রাণ! আমি কসম করেছি, তুমি অবশ্যই নামবে, তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে। মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, তোমার কী হয়েছে যে, এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছো? সেই কত দিন থেকে না এই জান্নাতের প্রত্যাশা করে আসছো, পুরানো ফুটো মশকের এক বিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও। হে আমার প্রাণ, আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে, এই মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তুমি যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেওয়া হয়েছে, তুমি তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।'

উপরোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। তখন তাঁর এক চাচাতো ভাই গোশতসহ একটুকরো হাড় নিয়ে এসে তার হাতে দেন। তিনি সেটা হাতে নিয়ে যেই না একটু চাটা দিয়েছেন, ঠিক তখনই প্রচন্ড যুদ্ধের শোরগোল ভেসে এলো। 'তুমি এখনও বেঁচে আছ'– এ কথা বলে হাতের হাড়টি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুপক্ষের এক সৈনিক এমন জোরে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একটি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি রক্তরঞ্জিত অবস্থায় সাথীদের আহবান জানান। সাথীরা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। (তাবাকাত–৩/৫২৯, সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৭৯, হায়াতুস সাহাবা–১/৫৩৩, সীয়ারে আনসার–২/৬৩, আনসাবুল আশরাফ–১/৩৮০, ২৪৪)

মূতায় অবস্থানকালে শাহাদাতের পূর্বে একদিন রাতে তিনি একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আবৃত্তি শুনে যায়িদ ইবন আরকাম কাঁদতে শুরু করেন। তিনি যায়িদের মাথার ওপর দুররা উঁচু করে ধরে বলেন ঃ তোমার কী হয়েছে? আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাবে। (আল–ইসাবা–২/৩০৭)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওহীর মাধ্যমে মূতার প্রতি মুহূর্তের খবর লাভ করে মদীনায় উপস্থিত লোকদের সামনে বর্ণনা করছিলেন। সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মূতার খবর আসার পূর্বেই রাসূল (সা) মদীনায় যায়িদ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহর শাহাদাতের খবর দান করেন। তিনি বলেন ঃ যায়িদ ঝান্ডা হাতে নেয় এবং শহীদ হয়। তারপর জা'ফর তুলে নেয়, সেও শহীদ হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। তিনি একথা বলছিলেন আর তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (আসাহ আস–সীয়ার–২৮১) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়িদ ও জা'ফরের শাহাদাতের খবর দেওয়ার পর রাসূল (সা) একটু চুপ থাকেন। এতে আনসারদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তারা ধারণা করে যে, 'আবদুল্লাহর এমন কিছু ঘটেছে যা তাদের মনঃপূত নয়। তারপর রাসূল (সা) বলেন ঃ অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তিনি আরও বলেন, তাদের সকলকে জান্নাতে আমার কাছে আনা হয়েছে। আমি দেখলাম, তারা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। তবে 'আবদুল্লাহর পালঙ্কটি তার অন্য দুই সঙ্গীর থেকে

একটু বাঁকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা এমন কেন? বলা হল ঃ তারা দুইজন দ্বিধাহীন চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু আবদুল্লাহর চিত্ত দ্বিধা-সংকোচে একটি দোল খায়। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০)

মূতার তিন সেনাপতির মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁদের কর্মকান্ড বর্ণনা করে এই বলে দুআ করেন ঃ আল্লাহ তুমি যায়িদকে ক্ষমা করে দাও। একথা তিনবার বলেন, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তুমি জাফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দাও। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৪)

মূতায় যাওয়ার পূর্বে একবার মদীনায় অসুস্থ অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বোন 'উমরাহ নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে আরবদের প্রথা অনুযায়ী বিলাপ শুরু করেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি বোনকে বলেন, তুমি আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে যা কিছু বলছিলে, তার সবই আমার কাছ থেকে সত্যায়িত করা হচ্ছিল। এই কারণে তাঁর মৃত্যুর সময় তারই উপদেশ মত সকলে 'সবর'(ধৈর্য্য) অবলম্বন করে। সহীহ বুখারীতে এসেছে- তিনি যখন মারা যান তাঁর জন্য কান্নাকাটি বা বিলাপ করা হয়নি। (উসুদুল গাবা-৩/১৫৭-১৫৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০)

মূতা রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান ছিল। কিন্তু উসুদুল গাবা গ্রন্থকার বলেছেন, তিনি নিহত হন এবং কোন সন্তান রেখে যাননি। (উসুদুল গাবা-৩/১৫৯, সীয়ারে আনসার-২/২৬৫)

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার স্ত্রী সম্পর্কে আল-ইসতীয়াব গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, তুমি যদি পাক অবস্থায় থাক তাহলে একটু কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও। তখন 'আবদুল্লাহ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য,
কাফিরদের ঠিকানা দোযখ,
'আরশ ছিল পানির ওপর,
'আরশের ওপর ছিলেন বিশ্বের প্রতিপালক,
আর সেই আরশ বহন করে তাঁরই শক্তিশালী ফিরিশতারা।"

তাঁর স্ত্রী কুরআনে পারদর্শী ছিলেন না। এই কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে, আবদুল্লাহ কুরআন থেকেই তিলাওয়াত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ সত্যবাদী, আমার চোখ দেখতে ভুল করেছে। আমি অহেতুক তোমাকে দোষারোপ করছি। দাসীর সাথে উপগত হওয়ার পর স্ত্রীর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য হযরত আবদুল্লাহ এমন বাহানার আশ্রয় নেন। তিনি পরদিন সকালে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনি হেসে দেন। (আল-ইসতীয়াব-১/৩৬২, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৫)

সামরিক দক্ষতা ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার আরও অনেক যোগ্যতা ছিল। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সমাদর করতেন। সেই জাহিলী আরবে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আরবীতে লেখা জানতো, 'আবদুল্লাহ তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'কাতিব' (লেখক) হিসাবে নিয়োগ করেন। তবে কখন কিভাবে তিনি লেখা শিখেছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস কিছু বলে না।

তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। ডক্টর 'উমার ফাররুখ বলেন, 'মদীনায় ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করলে আরবের মুশরিকগণ আরও শংকিত হয়ে পড়ে। মক্কার পৌত্তলিক কবিগণ বিশেষতঃ 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবা'রী, কা'ব ইবন যুহাইর ও আবু সুফইয়ান ইবন আল-হারিস রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতো। তখন মদীনায় হাসসান ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে সমুচিত জবাব দেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'পক্ষের এ কবিতার যুদ্ধ চলতে থাকে। 'আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর যুগের ভালো কবিদের একজন। তিনি হাস্‌সান ও কা'বের সমপর্যায়ের কবি। জাহিলী যুগে তিনি কবি কায়েস ইবনুল খুতাইম-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ মূলক কবিতা লিখে প্রতিযোগিতা করতেন। আর ইসলামী যুগে রাসূলের (সা) প্রশংসা এবং মুশরিক কবিদের প্রতিবাদ ও নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। (তারীখুল আদাব আল-আরাবী-১/২৫৮, ২৬১, ২৬২)

জুরযী যায়দান বলেন ঃ 'মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যারা মুসলমানদের নিন্দা করে কবিতা বলতো তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবারী, আবু সুফইয়ান ইবন আল-হারিস ও 'আমর ইবন আল-'আস ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। একদিন নবী (সা) বললেন ঃ যারা তাদের অস্ত্রের দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছে, জিহ্বা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে তাদেরকে কিসে বিরত রেখেছে? এই কথার পর যে তিন কবি উপরোক্ত কবিদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যান তাঁরা হলেন, হাস্‌সান, কা'ব ও আবদুল্লাহ। রাসূল (সা) মনে করতেন, এই তিন কবির কবিতা শত্রুদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন ঃ এই তিন কবি কুরাইশদের কাছে তীরের ফলার চেয়েও বেশী শক্তিশালী। (তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১৯১)

কবি হাস্‌সান কুরাইশদের বংশ ও রক্তের ওপর আঘাত হানতেন, কবি কা'ব কুরাইশদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাদের কুফরীর জন্য নিন্দা ও ধিক্কার দিতেন। (উসুদুল গাবা-৪/২৪৮) আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বলেন ঃ হাস্‌সান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কুরাইশ কবিদের মত যুদ্ধ বিগ্রহ ও গৌরবমূলক কাজ-কর্ম নিয়ে কবিতা রচনা করতেন এবং তার মধ্যে কুরাইশদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। আর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহ তাদের কুফরীর জন্য ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন। কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বোক্ত দু'জনের কবিতা ছিল তাদের নিকট 'আবদুল্লাহর কবিতা অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক। কিন্তু যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করলো তখন 'আবদুল্লাহর কবিতা সর্বাধিক প্রভাবশালী ও পীড়াদায়ক বলে তাদের নিকট প্রতিভাত হলো। (কিতাবুল আগানী-৪/১৩৬)

আবদুল্লাহ ছিলেন স্বভাব কবি। উপস্থিত কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন ঃ তাৎক্ষণিক কবিতা বলার ক্ষেত্রে আমি 'আবদুল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সক্ষম আর কাউকে দেখিনি। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫) একদিন তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। পূর্বেই সেখানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদল সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন। তিনি 'আবদুল্লাহকে কাছে ডেকে বলেন, তুমি এখন মুশরিকদের সম্পর্কে কিছু কবিতা শোনাও।' আবদুল্লাহ কিছু কবিতা শোনালেন। কবিতা শুনে রাসূল (সা) একটু

হাসি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে অটল রাখুন। (আল–ইসতীয়াব–১/৩৬২, তাবাকাত–৩/৫২৮,আল–ইসাবা–২/৩০৭)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) ওয়াজ নসীহাতের সময় বলতেন, তোমাদের এক ভাই আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা অশ্লীল কথা বলতেন। তারপর তিনি 'আবদুল্লাহর একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে কবিতাটি সংকলন করেছেন। (আল–ফাতহুর রাব্বানী, শরহু মুসনাদ আহমাদ–২২/২৮৭)

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সব কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে এখনও পঞ্চাশটি শ্লোক (verse) সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। সীরাতু ইবন হিশামে তার অধিকাংশ পাওয়া যায়। (দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)–১২/৭৮০)

যখন সূরা শু'য়ারা–এর ২২৪–২২৬ নং আয়াতগুলি– 'কবিদেরকে তারাই অনুসরণ করে যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তাই বলে বেড়ায়'– নাযিল হয় তখন হাস্‌সান, আবদুল্লাহ ও কাব এত ভীত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে যান। তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই আয়াত নাযিলের সময় আল্লাহ তো জানতেন আমরা কবি। তখন রাসূল (সা) আয়াতের পরবর্তী অংশ– 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে'– পাঠ করেন এবং বলেন এই হচ্ছো তোমরা। (আল–ইসাবা–২/৩০৭, তাবাকাত–৩/৫২৮, হায়াতুস সাহাবা–৩/৭৭, ১৭২)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাদীসগুলি খোদ রাসূল (সা) ও বিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন ইবন 'আব্বাস, উসামা ইবন যায়িদ, আনাস ইবন মালিক, নু'মান ইবন বাশীর ও আবু হুরাইরা। (আল–ইসাবা–২/৩০৬)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন একজন দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ ও সব সময় আল্লাহকে স্মরণকারী (জাকির) ব্যক্তি। আবুদ দারদা বলেন ঃ এমন কোন দিন যায়না যেদিন আমি তাঁকে স্মরণ করিনা। আমার সঙ্গে একত্র হলেই তিনি বলতেন, এস, কিছুক্ষণের জন্য আমরা মুসলমান হয়ে যাই। তারপর বসে 'জিকর' শুরু করতেন। 'জিকর' শেষ হলে বলতেন, এটা ছিল ঈমানের মজলিস। (উসুদুল গাবা–৩/১৫৭)

আনাস ইবন মালিক বলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীর দেখা হলে বলতেন, এস, আমরা কিছু সময়ের জন্য ঈমান আনি। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর এমন কথায় খুব রেগে গেল। সে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি দেখেন না, ইবন রাওয়াহা আপনার ঈমান ত্যাগ করে কিছুক্ষণের ঈমানকে পসন্দ করছে? তিনি বললেন, আল্লাহ ইবন রাওয়াহার ওপর রহম করুন! সে এমন সব মজলিস পসন্দ করে যার জন্য ফিরিশতারাও ফখর করে থাকে।

একবার তো তাঁর এমনি ধরনের আহবানে এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করে বলে বসলো, কেন আমরা কি মুমিন নই? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমরা মুমিন। তবে আমরা জিকর করবো, তাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। (আল–ফাতহুর রাব্বানী–২২/২৮৬, হায়াতুস সাহাবা–৩/১৫)

তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, দুই রাকায়াত নামায আদায় করতেন। আবার ঘরে ফিরে এসে ঠিক একই রকম করতেন। এ ব্যাপারে কক্ষণও অলসতা করতেন না। (আল-ইসাবা-২/৩০৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৮)

একবার এক সফরে এত প্রচন্ড গরম ছিল যে, মানুষ সূর্যের তেজ থেকে বাঁচার জন্য নিজ নিজ মাথার ওপর হাত দিয়ে রেখেছিল। এমন গরমে কে রোযা রাখে? কিন্তু তার মধ্যেও কেবল হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা 'সাওম' পালন করেন। (সহীহ বুখারী-১/২৬১, মুসলিম-১/৩৫৭, হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৯, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫)

জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। বদর থেকে নিয়ে মূতা পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। রিজাল শাস্ত্রবিদরা (চরিত অভিধান) বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ সবার আগে যুদ্ধে বের হতেন এবং সবার শেষে ঘরে ফিরতেন। (আল-ইসাবা-২/৩০৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আদেশ-নিষেধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। একটি ঘটনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেন। আর ইবন রাওয়াহা যাচ্ছেন মসজিদের দিকে। তিনি যখন মসজিদের বাইরের রাস্তায় এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন রাসূল (সা) বলছেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে পড়। এই নির্দেশ ইবন রাওয়াহার কানে যেতেই সেখানে বসে পড়েন। রাসূল (সা) খুতবা শেষ করার পর কোন এক ব্যক্তি ইবন রাওয়াহার ব্যাপারটি তাঁকে শোনান। শুনে তিনি মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লালসা আল্লাহ তার মধ্যে আরও বৃদ্ধি করে দিন। (আল-ইসাবা-২/৩০৬, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যেমন রাসূলকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি রাসূল (সা)ও তাঁকে ভালোবাসতেন। একবার আবদুল্লাহ অসুখে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে থাকে তাহলে সহজে তার মরণ দাও অন্যথায় তাকে ভালো করে দাও। (আল-ইসাবা-২/৩০৬)

উসামা ইবন যায়িদ বলেন ঃ সা'দ ইবন 'উবাদা অসুস্থ হলে রাসূল (সা) তাঁকে দেখার জন্য বের হলেন। আমাকেও বাহনের পিছনে বসিয়ে নিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই তার মুযাহিম দুর্গের ছায়ায় নিজ গোত্রের আরও কিছু লোকের সাথে বসে ছিল। রাসূল (সা) মনে করলেন, কোন কথা না বলে তাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া শিষ্টাচারের পরিপন্থী। তাই তিনি বাহনের পিঠ থেকে নামলেন এবং সালাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাদের সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এতক্ষণ 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই চুপ করে ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা শেষ হলে সে বলল ঃ দেখুন, আপনার কথা সত্য হলে বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন। কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে যত পারেন শুনাবেন। এমন অবাঞ্ছিতভাবে কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে কাউকে বিরক্ত করবেন না। সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ তার কথা কক্ষণও মানবেন না। আপনি আসবেন! আপনি আমাদের মজলিসে, ঘরে ঘরে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে আসবেন। আমরা সেটাই পসন্দ করি। আপনার

আগমনের দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫৮৭, হায়াতুস সাহাবা–২/৫০৯)

একদিন আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদা শুরু করলেন। তাই দেখে স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন? স্ত্রী বললেন ঃ তোমাকে কাঁদতে দেখে আমি কাঁদছি। তখন তিনি সূরা মরিয়াম–এর ৭১ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, আমি এই আয়াতটি স্মরণ করে কাঁদছি। জানিনে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কিনা। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৪৫)

বিখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদা–র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবদুল্লাহর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।জাহিলী যুগে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। 'আবদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের পরও আবু দারদা মূর্তি উপাসক থেকে যান। তাঁর বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। একদিন আবু দারদা বাড়ী থেকে বের হলেন, আর ঠিক সেই সময় ভিন্ন পথ দিয়ে আবদুল্লাহ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু দারদা–র স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু দারদা কোথায়? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত একটি হাতুড়ী দিয়ে মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন। শব্দ শুনে আবু দারদার–র স্ত্রী ছুটে গেলেন। আবদুল্লাহ কাজ শেষ করে চলে গেলেন। এ দিকে আবু দারদা–র স্ত্রী ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আবু দারদা ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট সব কিছু শুনে প্রথমে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, যদি মূর্তির কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতো। এই উপলব্ধির পর তিনি আবদুল্লাহকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলামের ঘোষণা দেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৩২, ৩৩৩)

একবার কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত, একটি কবিতায় সাফওয়ান ইবন আল–মুয়াত্তাল ও তাঁর গোত্রের নিন্দা করেন। সাফওয়ান ক্ষেপে গিয়ে কবিকে মারপিট করে এবং তাঁকে দু'হাত গলার সাথে বেঁধে বনু আল–হারিসের পল্লীতে নিয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাকে ছাড়িয়ে দেন এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। তাদের দু'জনকেও রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের ঝগড়া মিটমাট করে দেন (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৫)

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহের কারণে রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসায় বলেছেন ঃ 'নি'মার রাজুলু আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা' – আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কতই না ভালো মানুষ। (আল–ইসাবা–২/৩০৬)

আবু তালহা আল–আনসারী (রা)

নাম যায়িদ, ডাকনাম আবু তালহা। এ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হিজরাতের ৩৬ বছর পূর্বে ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আল–আ'লাম–৩/৯৮) পিতা সাহল ইবন আল–আসওয়াদ ইবন হারাম। বনু জাজীলার সন্তান। মাতা 'উবাদাহ্ বিনতু মালিক। প্রাচীন জাহিলী যুগে ইয়াসরিবে আবু তালহার খান্দান বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁর পিতৃ ও মাতৃ বংশের মধ্যেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। বর্তমান মসজিদে নববী সংলগ্ন পশ্চিম দিকে তাঁর খান্দানের বসতি ছিল। তিনি তাঁর সময়ে খান্দানের রয়িস বা নেতা ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪২, আল–ইসতীয়াব–৪/১১৩, তাহজীবুল আসমা–১/৪৪৫)

ইসলাম–পূর্ব জীবনে সাধারণ আরববাসীর মত মূর্তি পূজারী ছিলেন। তাঁর মদ পানের আসরটিও ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। পানের আসরে নিয়মিত আড্ডা জমতো। সেই জাহিলী যুগে তিনি ইয়াসরিবের হাতেগোনা গুটি কয়েক সাহসী তীরন্দাযদের মধ্যে গণ্য হতেন। (বুখারী–২/৬৬৪, আল–আ'লাম–৩/৯৮)

আবু তালহা যখন কুড়ি/বাইশ বছরের যুবক তখন মক্কায় হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। প্রথম কয়েক বছর ইয়াসরিবে এর কোন প্রভাব তেমন একটা না পড়লেও পরের বছরগুলিতে ধীরে ধীরে পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কা থেকে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সেখানে পাঠান ইসলাম প্রচারের জন্য। তাঁরই নিকট মদীনার এক মহিয়সী মহিলা উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন। এই মহিলার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে আবু তালহা মূর্তি পূজা ত্যাগ করে মুসলিম হন এবং তাঁকে বিয়ে করেন।

আবু তালহা কখন ইসলাম গ্রহণ করেন, বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে সে সম্পর্কে দুইটি ধারণা পাওয়া যায়। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে সর্বশেষ 'আকাবায় তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করেন। এই বাই'য়াতে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে রাসূল (সা) যে বারো জন নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন তাঁদের একজন ছিলেন আবু তালহা। অন্যটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে প্রথম ধারণাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ একথাই বর্ণনা করেছেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম–২/১১৯, শাজারাতুজ জাহাব–১/৪০, উসুদুল গাবা–৫/২৩৪)

আবু তালহার ইসলাম গ্রহণ এবং উম্মু সুলাইমের সাথে বিয়ের ঘটনার মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের সম্মানিতা মা হলেন হযরত উম্মু সুলাইম। আনাসের পিতা মালিক ছিল তাঁর ইসলাম–পূর্ব জীবনের স্বামী। উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করলে দুঃখ ও ক্ষোভে মালিক স্ত্রী–পুত্র ফেলে

শামে চলে যায় এবং সেখানে মারা যায়। তারপর আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এই বিয়ে সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা এখানে আমরা তুলে ধরছি।

আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'কোন মুশরিককে বিয়ে করা আমার উচিত হবে না। আচ্ছা আবু তালহা, তুমি কি দেখনা তোমাদের এইসব ইলাহ, যার তোমরা 'ইবাদাত করে থাক, তা তো অমুকের ওখানে তৈরী! আগুন লাগালে তা জ্বলে যায়।' কথাগুলি শুনে আবু তালহা উঠে চলে গেলেন। তবে অন্তরে একটা ভাবনা দেখা দিল। কিছুতেই ঘুম এলো না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। উম্মু সুলাইম বলেছিলেন ঃ 'তোমার এই প্রস্তাবে তো আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সমস্যা হলো, তুমি যে একজন কাফির ব্যক্তি, আর আমি একজন মুসলিম নারী। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে তো কোন সমস্যাই নেই। তখন তোমার ইসলামই হবে আমার মোহর। তাছাড়া অন্য কিছুই আমি চাইনা।' আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু সুলাইমকে বিয়ে করেন। সাবিত বলতেন ঃ উম্মু সুলাইমের মোহরের চেয়ে উত্তম মোহরের কথা আমরা আর শুনিনি। তাঁর সেই মোহর ছিল ইসলাম। ইবন 'আসাকির বলেন, তাবারানী, আবু নু'ঈম ও ইবন দুরাসতাওয়াইহ উপরোক্ত কথা বর্ণনা করেছেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৫) 'উরওয়া, মূসা ইবন 'উকবা, আল্লামা জাহবী, ইবনুল 'ইমাদ আল–হাম্বলী, ইবনুল আসীর প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। কারণ, আবু তালহা আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন ও নাকীব মনোনীত হন।

ইবন 'আসাকির বলেন ঃ উম্মুসুলাইমের সাথে আবু তালহার বিয়ের যেসব বর্ণনা এসেছে তাতে ধারণা জন্মে যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নাদর ইবন আনাস থেকে বর্ণিত হাফেজ ও বায়হাকীর একটি বর্ণনা উদ্ধার করেছেন। নাদর বলেন ঃ আনাসের পিতা মালিক একদিন তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলাইমকে বললো ঃ এ ব্যক্তি [রাসূল (সা)] তো দেখছি মদ হারাম করেছেন। তারপর সে স্ত্রী ও সন্তান ফেলে শামে চলে যায় এবং সেখানে মারা যায়।

অতঃপর আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'শোন আবু তালহা, তোমার মত ব্যক্তিকে ফেরানো যায় না। তবে তুমি কাফির, আর আমি মুসলিম। সমস্যাটি এখানেই। এ বিয়ে হতে পারে না।' আবু তালহা বললেন ঃ 'তুমি সোনা–রূপো চাও?' উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'না, আমি তা চাইনা। আমি শুধু তোমার ইসলাম চাই।' আবু তালহা বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমাকে কে সাহায্য করবে?' বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা)।'

আবু তালহা চললেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। তিনি তখন সাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন। আবু তালহাকে আসতে দেখে বললেন ঃ আবু তালহা আসছে। ইসলামের দীপ্তি তার কপালে দেখা যাচ্ছে। আবু তালহা এসে উম্মু সুলাইম যা বলেছিলেন সেই কথাগুলি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। এভাবে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু সুলাইমকে বিয়ে করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৫, হায়াতুস সাহাবা–১/১৯৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে মককার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্কের প্রচলন করেন। আবু তালহার দ্বীনী ভাই কে হয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও নানা জনের নানা কথা আছে। প্রখ্যাত কুরাইশ মুহাজির আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহর (রা) সাথে তাঁর

ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সীরাত লেখকের মত। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এই আবু 'উবায়দাহ্ 'আমীনুল উম্মাহ' খিতাবসহ জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। ইবন 'আসাকির বলেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহা ও বিলালের হাত ধরে তাঁদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৯) ইবন সা'দ এ সম্পর্কে 'আসিম ইবন 'উমারের একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। রাসূল (সা) আবু তালহা ও আরকাম ইবন আল–আরকাম আল–মাখযূমীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করেন। (তাবাকাত–৩/৫০৫)

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধ ও অভিযানে আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রায়ই এই চরণটি আওড়াতেন ঃ 'আমি আবু তালহা, আমার নাম যায়িদ। প্রতিদিন আমার অস্ত্রে থাকে একটি শিকার।' (তাহজীবুল আসমা–১/৪৪৫, তারীখে ইবন আসাকির–৫/৪)

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদর। আবু তালহা অতি উৎসাহের সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে বদরী সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বদরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গিয়েছিল। একবার নয়, তিনবার। আর এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন।' (সূরা আল–আনফাল–১১) (তারীখে ইবন আসাকির–৬/৬) উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময় ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়।

উহুদ যুদ্ধে তিনি আল্লাহর নবীর জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন তীরন্দায বাহিনীর সদস্য। (আনসাবুল আশরাফ–১/১২৫) প্রচন্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। তখন আবু তালহাসহ মুষ্টিমেয় কিছু সৈনিক নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। এদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিজের পেছনে আড়াল করে রেখে শত্রুদের দিকে তীর ছুড়ছিলেন। একটি তীর ছুড়লে রাসূল (সা) একটু মাথা উঁচু করে দেখছিলেন, তা কোথায় গিয়ে পড়ছে। আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) বুকে হাত দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলছিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বসুন। এভাবে থাকুন। তাহলে আপনার গায়ে কোন তীর লাগবে না। তিনি একটু মাথা উঁচু করলেই আবু তালহা খুব দ্রুত তাঁকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছিলেন। সেদিন তিনি রাসূলকে (সা) আরও বলেছিলেন, আমার এ বুক আপনার বুকের সামনেই থাকবে। এক পর্যায়ে তিনি রাসূলকে (সা) বলেন ঃ আমি শক্তিশালী সাহসী মানুষ। আপনার যা প্রয়োজন আমাকেই বলুন। তিনি শত্রুদের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুড়ছিলেন আর গুন গুন করে কবিতার একটি পংক্তি আওড়াচ্ছিলেন ঃ

'আমার জীবন হোক আপনার জীবনের প্রতি উৎসর্গ, আমার মুখমন্ডল হোক আপনার মুখমন্ডলের ঢাল।' আবু তালহা ছিলেন বলবান বীর পুরুষ। এই উহুদ যুদ্ধে তিনি দুই অথবা তিনখানি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন।

আক্রমণের প্রচন্ডতায় তাঁর হাত দুইখানি অবশ হয়ে পড়ছিল। তবুও তিনি একবারও একটু উহ্ শব্দ উচ্চারণ করেননি। কারণ, তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হিফাজত

ও নিরাপত্তা। (উসুদুল গাবা–৫/২৩৪, তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৭, তাবাকাত–৩/৫০৭, বুখারী–কিতাবুল মাগাযী)

হযরত আবু তালহা খাইবার যুদ্ধে যোগদান করেন। এই যুদ্ধের সময় তাঁর ও রাসূলুল্লাহ (সা) উভয়ের উট খুবই নিকটে পাশাপাশি ছিল এবং রাসূল (সা) গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করার জন্য ঘোষক হিসেবে তাঁকেই মনোনীত করেন। (মুসনাদে আহমাদ–৩/১২১)

এই অভিযান থেকে ফেরার সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও হযরত সাফিয়্যা ছিলেন এক উটের ওপর। মদীনার কাছাকাছি এসে উটটি হোঁচট খায় এবং আরোহীদ্বয় ছিটকে মাটিতে পড়ে যান। আবু তালহা দ্রুত নিজের উট থেকে লাফিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আল্লাহ আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন। আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন? বললেন ঃ না। তবে মহিলার খবর লও। আবু তালহা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে হযরত সাফিয়্যার নিকটে যান এবং উটের হাওদা ঠিক করে আবার তাঁকে বসিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমাদ–৩/১৮০)

হুনাইন যুদ্ধেও তিনি দারুণ বাহাদুরী দেখান। এই যুদ্ধে তিনি একাই বিশ মতান্তরে একুশজন কাফিরকে হত্যা করেন। রাসূল (সা) ঘোষণা করেছিলেন কেউ কোন কাফিরকে হত্যা করলে সে হবে নিহত ব্যক্তির সকল জিনিসের মালিক। এ দিন আবু তালহা একুশ ব্যক্তির সাজ–সরঞ্জামের অধিকারী হন। হিজরী অষ্টম সনে সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর–২/১১৯, তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৭, উসুদুল গাবা–৫/২৩৫)

এই যুদ্ধের সময় তিনি হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মু সুলাইমের হাতে একটি খঞ্জর, আপনি কি তা দেখেছেন? রাসূল (সা) বললেন, উম্মু সুলাইম, এই খঞ্জর দিয়ে কি করবে? বললেন ঃ মুশরিকরা কেউ আমার নিকটে এলে এটা দিয়ে তাঁর পেট ফেঁড়ে ফেলবো। একথা শুনে রাসূল (সা) হাসতে লাগলেন। সীরাতু ইবন হিশাম–২/৪৪৬, ৪৪৭, হায়াতুস সাহাবা–১/৫৯৭)

বিদায় হজ্জে আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। মিনায় রাসূল (সা) মাথা 'হলক' (চুল ছেঁচে ফেলা) করছিলেন। তিনি মাথার ডান দিকের কর্তিত চুল একটি/দুইটি করে পাশে বসা সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কিন্তু মাথার বাম পাশের চুলগুলির সবই আবু তালহাকে দান করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৭) ইমাম মুসলিমও একথা বর্ণনা করেছেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের কাছাকাছি সময় মদীনায় সাধারণতঃ দুই ব্যক্তি কবর খুঁড়তেন। মুহাজিরদের মধ্যে আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ। তিনি খুঁড়তেন মককাবাসীদের মত। আর আনসারদের মধ্যে আবু তালহা। তিনি খুঁড়তেন মদীনাবাসীদের মত। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে বসে দাফন–কাফনের বিষয় পরামর্শ শুরু করলেন। প্রশ্ন দেখা দিল, কে এবং কোন পদ্ধতিতে কবর তৈরী করবে? উপরোক্ত দুই ব্যক্তি তখন এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। হযরত 'আববাস (রা) একই সময়ে দুইজনের নিকট লোক পাঠালেন, তাঁদেরকে ডেকে আনার জন্য। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের মধ্যে যিনি আগে পৌছবেন তিনিই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। তাঁদের

ডাকার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়ে হযরত 'আববাস (রা) সহ উপস্থিত সাহাবীরা দু'আ করতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনার নবীর জন্য এই দুই জনের একজনকে নির্বাচন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ব্যক্তি আবু তালহার খোঁজে গিয়েছিল, তাঁকে সংগে করে ফিরে আসে। অতঃপর আবু তালহা মদীনাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) কবর তৈরী করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫৭৩, ৫৭৪, আসাহ আস-সীয়ার-৫৮৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর বহু সাহাবী মদীনা ছেড়ে শামে আবাসন গড়ে তোলেন। আবু তালহাও তথাকার অধিবাসীদের একজন। তবে যখনই কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পিষ্ট হতেন, তখনই এই মাসাধিক কালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মাযারে হাজির হতেন এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। (তারীখে ইবন আসাকির-৬/৪)

হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত কাল আবু তালহা মোটামুটি শামে (সিরিয়া) কাটান। হযরত ফারূকে 'আজমের খিলাফত কালের বেশীর ভাগ সময় সেখানেই ছিলেন। হযরত উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরের সময় তিনি শামে ছিলেন। আনাস থেকে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব শাম সফরে গেছেন। আবু তালহা ও আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে বললেন ঃ আপনার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বাছা বাছা সাহাবীরা আছেন। অথচ আমরা পিছনে রেখে এসেছি এক প্রজ্জ্বলিত আগুন। (তাঁরা মহামারি আকারে প্লেগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।) আপনি এ যাত্রা শামে প্রবেশ না করে মদীনায় ফিরে যান। 'উমার ফিরে গেলেন। পরের বছর তিনি এই স্থগিত সফর শেষ করেন।' (তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৪)

হযরত 'উমারের (রা) অন্তিম সময়ে আবু তালহা মদীনায় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রতি খলীফা 'উমারের (রা) প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন পরবর্তী খলীফা পদের জন্য ছয়জন সর্বজনমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করলেন। তারপর আবু তালহাকে ডেকে বললেন ঃ আপনাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার মৃত্যুর পর আপনি ৫০ জন আনসারকে সংগে নিয়ে এই ছয় ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যদি তাঁদের চারজন এক দিকে যায় আর দুই জন বিরোধিতা করে তাহলে ঐ দুইজনের গর্দান উড়িয়ে দিবেন। আর তাঁরা সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে যে দলে 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ থাকবে না সে দলকে হত্যা করবেন। তিন দিনের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে তাদের সকলের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। আমার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত আপনিই হবেন অন্তরবর্তীকালীন খলীফা। (কানযুল 'উম্মাল-৩/১৫৬, ১৫৭, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৪)

হযরত মিসওয়ার ইবন মাখরামার গৃহে ঐ ছয় ব্যক্তির বৈঠক বসলো। আবু তালহা সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে বাড়ীর দরযায় দাঁড়িয়ে গেলেন। বনু 'হাশিম প্রথম থেকেই এই পরামর্শের বিরোধী ছিল। কারণ, তারা ছিল 'আলীকে (রা) খলীফা বানানোর অভিলাষী। হযরত 'আববাস (রা) সেই সময় চুপে চুপে 'আলীকে (রা) বলেছিলেন, আপনি নিজের বিষয়টি ঐ লোকদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। আপনি নিজেই ফায়সালা করুন। 'আলী (রা) কিছু একটা জবাব দিয়েছিলেন। আবু তালহা পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের এ সংলাপ শুনেছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রতি

'আলীর দৃষ্টি পড়তেই তিনি কিছু একটা যেন চিন্তা করলেন। আবু তালহা তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন ঃ আবুল হাসান, ভয়ের কিছু নেই।

একদিন এই ছয় ব্যক্তির গোপন বৈঠক চলছে। আবু তালহাও তাঁর বাহিনী নিয়ে দরযায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় 'আমর ইবনুল 'আস ও মুগীরা ইবন শু'বা এসে দরযায় বসে পড়েন। আবু তালহা তাঁদেরকে তেমন কিছু বললেন না; তবে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তিনি ওঁদের দুইজনের ভাব-ভঙ্গিমায় স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কঙ্কর উঠিয়ে তাঁদের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এরা এসেছে মদীনায় একথা প্রচার করতে যে, আমরাও শূরার সদস্য ছিলাম। কঙ্কর নিক্ষেপ করায় 'আমর ও মুগীরা ক্ষুব্ধ হন এবং ঝগড়া শুরু করেন। আবু তালহা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ আমার আশংকা হচ্ছে, আপনারা এমন অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে আসল বিষয়টি ছেড়ে না দেন। সেই সত্তার নামে শপথ, যিনি 'উমারকে মৃত্যু দান করেছেন, আমি তিনদিনের বেশী একটুও সময় দেব না। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটি শেষ হওয়ার পর আবু তালহা মন্তব্য করেন ঃ খিলাফতের দায়িত্ব লাভের জন্য এই ছয় ব্যক্তি প্রতিযোগিতা করবে, এমন আশংকার চেয়ে আমার বেশী ভয় ছিল তাঁরা এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকে কিনা। কারণ, 'উমারের মৃত্যুর পর প্রতিটি গৃহে দ্বীন ও দুনিয়ার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৭৩)

খলিফা নির্বাচনের পর আবু তালহা সম্পূর্ণ নির্জনে চলে যান এবং বাকী জীবন একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেন।

হযরত উম্মু সুলাইমের (রা) গর্ভে আবু তালহার একাধিক সন্তান হয়; কিন্তু তাদের কেউই বেশী দিন বাঁচেনি। তাঁর এক ছেলের নাম ছিল আবু 'উমাইর। ছোট বেলায় তার ছিল একটি ছোট পাখী। পাখীটি মারা গেল। একদিন রাসূল (সা) তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে খুবই বিমর্ষ দেখতে পেলেন। তার এমন অবস্থার কারণ জানতে চাইলে লোকেরা রাসূলকে (সা) প্রকৃত ঘটনা খুলে বললে। রাসূল (সা) তাকে হাসানোর জন্য একটু কাব্য করে বললেন ঃ 'ইয়া আবা 'উমাইর, মা ফা'য়ালান নুগাইর'- ওহে আবু উমাইর তোমার ছোট পাখীটি কী করলো? (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০, আল-ইসতী'য়াব)

আবু তালহার অন্য একটি ছেলে কিছু দিন রোগ ভোগের পর মারা যায়। ছেলেটির অসুস্থতার মধ্যে আবু তালহা একদিন মসজিদে নববীতে যান এবং তখন সে মারা যায়। উম্মু সুলাইম ছেলের বাবার জন্য অপেক্ষা না করে তাকে দাফন করে দেন এবং বাড়ীতে লোকদের বলেন, তারা যেন ছেলের দাফন-কাফনের কথা আবু তালহাকে না বলে। এদিকে আবু তালহা মসজিদ থেকে আরও কয়েকজন মেহমানসহ বাড়ী ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে? ছেলের মা বললেন ঃ আগের চেয়ে ভালো। আবু তালহা মেহমানদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। খাবার এলো এবং সবাই এক সাথে বসে খেয়ে নিলেন। মেহমান বিদায় নিলে আবু তালহা ভিতর বাড়ীতে আসলেন। রাতে স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় কাটালেন এবং মিলিত হলেন। শেষ রাতে উম্মু সুলাইম ছেলের মৃত্যুর খবর সহ কাফন-দাফনের কথা প্রকাশ করে বললেন ঃ সে ছিল আমাদের কাছে আল্লাহর এক আমানত। তিনি সেই আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। এতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? আবু তালহা 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' উচ্চারণ করলেন তবে এভাবে খবরটি গোপন করাতে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন। পরদিন সকালে

আবু তালহা বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের গত রাতের বরকত দান করুন। সেই রাতেই উম্মু সুলাইম গর্ভবতী হন। গর্ভের এই সন্তান প্রসব করার পর উম্মু সুলাইম তাকে আনাসের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। রাসূল (সা) একটু খেজুর চিবিয়ে শিশুর গালে দেন এবং সে মুখ নেড়ে একটু চুষতে থাকে। তাই দেখে তিনি বললেন ঃ দেখ, আনসারদের খেজুরের প্রতি স্বভাবগত টান রয়েছে। তিনি এই শিশুর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহর (সা) এই পবিত্র লালার বদৌলতে উত্তরকালে এই ছেলে অন্যান্য আনসার নওজোয়ানদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এই 'আবদুল্লার মাধ্যমে আবু তালহার বংশধারা চলেছে। ইসহাক ও 'উবাইদুল্লাহ নামে তাঁর ছিল দুই ছেলে, আর ইয়াহইয়া নামে ইসহাকের এক ছেলে। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁদের যুগের অন্যতম হাদীস বিশারদ। (মুসনাদে আহমাদ–৩/২৫৭, তারীখ ইবন 'আসাকির–৬/৬, বুখারী ও মুসলিমেও বিভিন্নভাবে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)

হযরত আবু তালহার মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম নাওয়াবী বলেন ঃ 'তিনি হিজরী ৩২ অথবা ৩৪ সনে ৭০ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। তাঁর মদীনায় মৃত্যুর কথা অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেছেন। তবে আবু যুর'য়া আদ–দিমাশ্কী বলেছেন, তিনি শামে মারা গেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি সমুদ্র পথে অভিযানে বেরিয়ে মারা যান। আবু যুর'য়া আদ–দিমাশকী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর চল্লিশ বছর একাধারে রোযা রেখে জীবন কাটান। এই বর্ণনা উপরে উল্লেখিত মৃত্যুসনের পরিপন্থী। কারণ, তিনি যদি হিজরী ৩২ অথবা ৩৪ সনে মারা যান তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ৪০ বছর রোযা রেখে বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা বলেছেন তিনি মদীনায় মারা গেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–১/৪৪৫, ৪৪৬)

বসরাবাসীরা বলেন, তিনি শেষ জীবনে সমুদ্র পথে অভিযানে বেরিয়ে পথিমধ্যে মারা যান। এই মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫১। বিভিন্ন গ্রন্থে আবু তালহার এই জিহাদে যাওয়ার চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। একদিন সূরা 'তাওবাহ' তিলাওয়াত করছেন। যখন 'ইনফিরূ খিফাফান ওয়া সিকালান'– অভিযানে বের হয়ে পড়, ভারি অবস্থায় হোক অথবা হালকা অবস্থায় (আয়াত ৪১) – এ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁর মধ্যে জিহাদের প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তিনি পরিবারের লোকদের বললেন ঃ আল্লাহ যুবক–বৃদ্ধ সকলের ওপর জিহাদ ফরয করেছেন। আমি জিহাদে যেতে চাই, তোমরা আমার সফরের ব্যবস্থা কর। একথা দুইবার উচ্চারণ করেন। একেতো বার্দ্ধক্য, তাছাড়া ক্রমাগত সিয়াম পালন করতে করতে তিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আবু বকর ও 'উমারের যুগেও ধারাবাহিকভাবে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন। এখনও আপনার জিহাদের লোভ আছে? আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদে বেরিয়ে পড়ছি। শাহাদাতের অদম্য আবেগ যাঁকে ধাক্কাচ্ছে তাঁকে ঠেকাচ্ছে কে? বললেন ঃ আমি যা বলছি তাই কর। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সফরের ব্যবস্থা করা হয়। সত্তুর বছরের এই বৃদ্ধ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত ছিল। অভিযানটি ছিল সাগর পথে। আবু তালহা

জাহাজে চড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। তীব্র প্রতীক্ষা, কখন শত্রুসেনার মুখোমুখি হবেন। এমন সময় তাঁর ডাক এসে যায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাগর পথে কোথাও একটু ভূমির চিহ্ন দেখা গেল না। প্রবল বায়ু ও বিক্ষুব্ধ সাগর জাহাজটি অজানা লক্ষ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই মুমিন মুজাহিদের লাশ সাত দিন জাহাজের ডেকে পড়ে রইল। অবশেষে একটি অজানা দ্বীপ পাওয়া গেল এবং সেখানেই দাফন করা হলো। এত দিনেও লাশে পচন ধরেনি বা সামান্য বিকৃতি ঘটেনি। (তাবাকাত-৩/৫০৭, তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৭, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/১২০, উসুদুল গাবা-৫/২৩৫, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪২)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু তালহা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহে বিভিন্ন মাসয়ালা অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা থাকতো। দীর্ঘ দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, অথচ 'আমলের ফজীলাত বিষয়ক কোন বর্ণনা তাঁর থেকে পাওয়া যায় না। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৯২ টি (বিরানব্বই)। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম প্রত্যেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আববাস ও আনাস ইবন মালিকসহ সাহাবীদের একটি দল এবং বিশিষ্ট তাবে'ঈদের একটি দলও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনাও করেছেন। (তাহজীবুল আসমা-১/৪৪৫, তারিখে ইবন 'আসাকির-৬/৪)

হযরত আবু তালহার এক দল ছাত্র ও ভক্ত একবার তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আসলো। তারা দেখলো, দরযায় একটি ছবিযুক্ত পর্দা টাঙ্গানো। তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। একটু সাহস করে যায়িদ ইবন খালিদ বলেই ফেললেন ঃ গতকাল তো আপনি ছবি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি 'উবাইদুল্লাহ খাওলানীকে বললেন ঃ হাঁ, তা করেছিলাম। তবে এ কথাও তো বলেছিলাম, কাপড়ে যে ছবি থাকে তা এর আওতায় পড়বে না। (মুসনাদ-৪/২৮)

একদিন আবু তালহা আহার করছেন। সাথে উবাই ইবন কা'ব এবং আনাস ইবন মালিকও আছেন। আহার শেষে আনাস অজুর জন্য পানি চাইলেন। আবু তালহা ও 'উবাই দুই জনই বললেন ঃ গোশত খাওয়ার কারণে হয়তো অজুর কথা মনে হয়েছে? আনাস বললেন ঃ জী হাঁ। আবু তালহা বললেন ঃ তোমরা 'তায়্যিবাত'- পবিত্র বস্তুসমূহ খেয়ে অজু করছো অথচ রাসূল (সা) এমনটি করতেন না। (মুসনাদ-৪/৩)

আবু তালহা একদিন নফল রোযা রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বরফ পড়েছিল। তিনি কয়েকটি তুষার খন্ড হাতে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। 'আপনি তো রোযার মধ্যে খাচ্ছেন'- লোকেরা এ কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন ঃ এ একটা রবকত, এর কিছু অর্জন করা উচিত। এ কোন খাদ্যও নয়, পানীয়ও নয়।' (মুসনাদ-৩/২৭৯, তারিখু ইবন 'আসাকির-৬/১০)

হযরত আবু তালহার মধ্যে কাব্য-প্রীতি ও প্রতিভা ছিল। তিনি কবিতা রচনা করতেন, আবৃত্তিও করতেন। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় তিনি গুন গুন করে কবিতার পংক্তি আওড়াতেন। সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কিছু পংক্তি সংকলিত হয়েছে। (দ্রঃ আল-ইসাবা-৪/১১৩, তারিখু ইবন 'আসাকির-৬/৭ আল-ইসতীয়াব)

হযরত আবু তালহার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হর্চ্ছে রাসূল-বা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি

গভীর প্রেম ও ভালোবাসা। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের প্রচন্ড আক্রমণে যখন সাথীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তখনও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নিজের গোটাদেহ আঁড় করে দিয়ে তাঁকে হিফাজত করেছেন। প্রিয় নবীর গায়ে যেন আঁচড় লাগতে না পারে– এই আশায় তীর–বর্শার আঘাত নিজের বুকে ধারণ করেছেন। তাঁর প্রেমের গভীরতা এর দ্বারাই কিছুটা মাপা যায়। তিনি সাধারণতঃ সকল অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে থাকতেন এবং দুই জনের উটও প্রায় পাশাপাশি চলতো।

একবার মদীনায় শত্রুর আক্রমণের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহার 'মানদূর' নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সেই দিকেই যাত্রা করলেন। আবু তালহাও রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পিছনে পিছনে চললেন। কিন্তু তাঁর পৌছতে না পৌছতেই রাসূল (সা) আবার ফিরে আসলেন এবং পথে আবু তালহার সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি আবু তালহাকে বললেন ঃ সেখানে কিছু না। তোমার ঘোড়াটি খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি যে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল, খুব ছোট ছোট ব্যাপারেও তা প্রকাশ পেত। তাঁর বাড়ীতে কোন জিনিস এলে তার কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতেও পাঠিয়ে দিতেন। একবার হযরত আনাস একটি খরগোশ ধরে আনলেন। আবু তালহা খরগোশটি জবেহ করে তার একটি রান নবীগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। একবার আবু তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম এক থালা খেজুর পাঠালেন। রাসূল (সা) খেজুরগুলি আযওয়াজে মুতাহ্হারাত ও অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (মুসনাদ–৩/১২৫, ১৭১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) শেষ রোগ যন্ত্রণায়– যাতে তিনি ইন্তিকাল করেন, একদিন আবু তালহা গেলেন তাঁকে দেখতে। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তোমার কাওমকে (আনসার) আমার সালাম বলবে। কারণ, তারা যা বৈধ ও উচিত নয় তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে এবং ধৈর্য ধারণ করে। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪০১)

আবু তালহা বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম। তখন তাঁর চামড়া ও চেহারায় এমন এক অবস্থা দেখলাম যা এর পূর্বে আর কখনও দেখিনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন অবস্থায় আমি আপনাকে আর কক্ষণও দেখিনি। বললেন ঃ আবু তালহা ঃ এমন অবস্থা হবে না কেন। এইমাত্র জিবরীল বেরিয়ে গেলেন। তিনি আমার রবের পক্ষ থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে এই সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতের কেউ আপনার ওপর একবার দরুদ ও সালাম পেশ করলে আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ তার ওপর দশবার দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। (উসুদুল গাবা–৫/২৩৫) আহমাদ ও নাসাঈ অন্যভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, জিবরীল বললেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য ১০টি নেকী লিখবেন, তার ১০টি গুনাহ মাফ করবেন এবং তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৩)

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে একদিন তিনি খেজুর থেকে তৈরী 'ফাদীখ' নামক এক প্রকার মদ পান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে খবর দিল, মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। সাথে সাথে তিনি আনাসকে বললেন ঃ মদের এই কলসটি ভেঙ্গে ফেল। আনাস নির্দেশ পালন করলেন। (বুখারী–২/১০৭)

যখন সূরা আলে 'ইমরানের এই আয়াত–'তোমরা কোন কল্যাণই লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন সব জিনিস (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর যা তোমাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়'– নাযিল হলো তখন আনসারদের যার কাছে যে সব মূল্যবান জিনিস ছিল সবই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেল এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিল। আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর 'বীরাহ' নামক বিশাল ভূ–সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিলেন। এখানে তাঁর একটি কুয়ো ছিল। কুয়োটির পানি ছিল সুস্বাদু এবং রাসূল (সা) এর পানি খুব পছন্দ করতেন। আবু তালহার এই দানে রাসূল (সা) খুব খুশী হয়েছিলেন। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৪০, তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮, হায়াতুস সাহাবা–২/১৫৭)

আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর থেকে বর্ণিত। একদিন আবু তালহা তাঁর একটি বাগিচার দেয়ালের পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় একটি ছোট্ট পাখী– এদিক ওদিক উড়ে বেরোনোর পথ খুঁজতে থাকে; কিন্তু ঘন খেজুর গাছের জন্য বেরোনোর পথ পেল না। আবু তালহা নামাযে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এই তামাশা দেখলেন। এদিকে নামায কত রাকায়াত পড়েছেন তা আর স্মরণ করতে পারলেন না। ভাবলেন, এই সম্পদই আমাকে ফিতনায় (বিপর্যয়ে) ফেলেছে। নামায শেষ করে তিনি ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সবই আমি সাদাকা (দান) করে দিলাম। এই সম্পদ আপনি আল্লাহর পথে কাজে লাগান। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ এই সম্পদ তোমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। নির্দেশমত তিনি যাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেন তাঁদের মধ্যে হাসসান ইবন সাবিত ও উবাই ইবন কা'বও ছিলেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮, হায়াতুস সাহাবা–৩/৯৭, মুসনাদে আহমাদ–৩/১৪১)

একবার এক ব্যক্তি মদীনায় এলো, সেখানে থাকা–খাওয়ার কোন সংস্থান তার ছিল না। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন, যে এই লোকটিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তার ওপর সদয় হবেন। আবু তালহা সাথে সাথে বললেন ঃ আমিই নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ীতে ছোট ছেলে–মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না। আবু তালহা স্ত্রীকে বললেন ঃ এক কাজ কর, তুমি ভুলিয়ে–ভালিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াও। তারপর মেহমানের সামনে খাবার হাজির করে কোন এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে দাও। অন্ধকারে আমরা খাওয়ার ভান করে শুধু মুখ নাড়াচাড়া করবো, আর মেহমান একাই পেট ভরে খেয়ে নেবে। যেই কথা সেই কাজ। স্বামী–স্ত্রী মেহমানকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করালেন; কিন্তু ছেলে–মেয়ে সহ নিজেরা উপোস থাকলেন। সকালে আবু তালহা আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তিনি 'তাদের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দান করে' (সূরা হাশর–৯)

–এই আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শোনান। তারপর আবু তালহাকে বলেন, অতিথির সাথে তোমাদের রাতের আচরণ আল্লাহর খুব পছন্দ হয়েছে। (মুসলিম–২/১৯৮, হায়াতুস সাহাবা–২/১৬০, ১৬১)

নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল আবু তালহার বিশেষ গুণ। খ্যাতি ও প্রদর্শনী থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন। 'বীরাহা' সম্পত্তি দান করার সময় তিনি কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, একথা যদি গোপন রাখতে সক্ষম হতাম তাহলে কক্ষণও প্রকাশ করতাম না। (মুসনাদ–৩/১১৫)

আবু তালহা ছিলেন বলিষ্ঠ কন্ঠস্বরের অধিকারী। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলতেন, সৈন্যদের মধ্যে আবু তালহার একটি জোর আওয়ায একদল সৈনিক থেকেও উত্তম। অন্য বর্ণনা মতে 'এক হাজার মানুষের চেয়েও উত্তম।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ 'মুশরিকদের জন্য আবু তালহার একটি হুংকার একদল সৈন্যের চেয়েও ভয়ংকর।' (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/১১৯, তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৭, উসুদুল গাবা-৫/২৩৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহার পরিবারের জন্য দু'আ করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৯) হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর সারা বছরই আবু তালহা রোযা পালন করতেন। শুধু দুই 'ঈদ ছাড়া কখনও রোযা ত্যাগ করতেন না। কারণ, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় সব সময় জিহাদে ব্যস্ত থাকায় তখন রোযা রাখতে পারতেন না। (তাহজীবুল আসমা-১/২৪৬)

ইবন হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে আবু তালহার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এই বলে, তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম।

আবু মাস'উদ আল—বদরী (রা)

আবু মাস'উদ ডাক নাম, আর এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম 'উকবা এবং পিতার নাম 'আমর ইবন সা'লাবা। সর্বশেষ বাই'য়াতে 'আকাবায় যোগ দিয়ে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ওয়াকিদী বলেন ঃ আবু মাস'উদ 'আকাবায় অংশগ্রহণ করেন, তবে বদরে অনুপস্থিত ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন ঃ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। (আনসাবুল আশরাফ—১/২৪৫; সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৫৯; উসুদুল গাবা—৫/২৯৬) সীরাতের কোন কোন গ্রন্থে আবু মাস'উদ আল—আনসারী নামে উল্লেখিত ব্যক্তি, আর এই আবু মাস'উদ আল-বদরী মূলতঃ একই ব্যক্তি। ইবনুল আসীর তাঁর 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থে (৫/২৯৬) এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

উহুদ এবং উহুদ পরবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। তবে তাঁর বদর যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের অনেক মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, তিনি বদরে যোগ দেন এবং এ কারণেই তাঁকে বদরী বলা হয়। ইমাম বুখারী খুব দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি বদরে যোগ দিয়েছেন। আর এর স্বপক্ষে তিনি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে দলীল হিসেবে একাধিক হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যেমন, বাশীর ইবন আবী মাস'উদ বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে এসেছে ঃ মুগীরা আসরের নামায দেরী করে পড়লে আবু মাস'উদ 'উকবা ইবন 'আমর তার প্রতিবাদ করেন। এ আবু মাস'উদ হচ্ছে যায়িদ ইবন হাসানের নানা এবং তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু 'উতবা, ইবন সালাম এবং মুসলিম 'আল—কুনা' গ্রন্থে তাঁর বদরে যোগদানের কথা বলেছেন। ইবনুল বারকী বলেন ঃ ইবন ইসহাক তাঁকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। তাবারানী বলেন ঃ কূফাবাসীরা দাবী করেন, তিনি বদরে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু মদীনাবাসীরা তাঁকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেন না। ইবন সা'দ আল—ওয়াকিদী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবু মাস'উদ যে বদরে যোগ দেননি, এ ব্যাপারে আমাদের সংগী—সাথীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি বদরে বসবাস করেছিলেন, এ কারণে তাঁকে বদরী বলা হয়। (আল—ইসাবা—২/৪৯০, ৪৯১; সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৫৯; উসুদুল গাবা—৫/২৯৬)

নবুওয়াতের যুগ ও প্রথম তিন খলীফার সময় পর্যন্ত আবু মাস'উদ মদীনায় ছিলেন। জীবনের কোন এক পর্যায়ে কিছু দিনের জন্য বদরের পানির ধারে বসবাস করেছিলেন। হযরত 'আলীর খিলাফতকালে মদীনা ছেড়ে কূফায় চলে যান এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করেন। (আল—ইসাবা—৪/২৫২; আনসাবুল আশরাফ—১/২৪৫)

হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে বিরোধের সময় আবু মাস'উদের ভূমিকার বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দেখা যায়। একটি বর্ণনা মতে, তিনি ছিলেন হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) ঘনিষ্ঠজনদের একজন। হযরত মু'য়াবিয়া (রা) যখন সিফ্ফীন যুদ্ধে যান তখন তাঁকে কূফায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। তাঁর না ফেরা পর্যন্ত আবু মাস'উদ কূফার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। (আল—ইসাবা—২/৪৯১) পক্ষান্তরে অন্য একটি বর্ণনা মতে,

তিনি ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) সহচর। 'আলীর (রা) সময়ে তিনি কূফায় যান এবং 'আলী (রা) সিফ্ফীনে যাওয়ার সময় তাঁকে কূফার আমীরের দায়িত্ব দিয়ে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫; আল-আ'লাম-৪/২৪১) শেষের বর্ণনাটিই সঠিক। কারণ সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় কূফা ছিল হযরত 'আলীর (রা) অধীনে, মু'য়াবিয়ার (রা) অধীনে নয়।

হযরত আবু মাস'উদের মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, সিফ্ফীন যুদ্ধের পর তিনি কূফা থেকে জন্মভূমি মদীনায় ফিরে আসেন এবং সেখানে মারা যান। আবার অনেকে বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হয় কূফায়। (আল-ইসাবা-২/৪৯১; আল-আ'লাম-৪/২৪১)

তাঁর মৃত্যুর সন সম্পর্কেও মতভেদ আছে। হিজরী ৪১ ও ৪২ দু'টি তাঁর মৃত্যু সন বলে কথিত হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন, হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৬০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। (উসুদুল গাবা-৫/২৯৬) তবে এটা ঠিক যে হযরত মুগীরা ইবন শু'বার (রা) কূফার শাসন কর্তৃত্বের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তা ছিল হিজরী ৪০ সনের পরে। (আল-ইসাবা-২/৪৯১)

হযরত আবু মাস'উদের এক পুত্র ও এক কন্যার পরিচয় জানা যায়। পুত্রের নাম বাশীর এবং কন্যা ছিলেন হযরত ইমাম হাসানের (রা) সহধর্মিনী। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত যায়িদ ইবন হাসান। বাশীরের জন্ম হয় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বা তার কিছু পরে।

হযরত আবু মাস'উদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের তৃতীয় তবকা বা স্তরে তাঁকে গণ্য করা হয়। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত ১০২ (একশো দুইটি) হাদীস পাওয়া যায়। (আল-'আলাম-৪/২৪১) তাবে'ঈদের মধ্যে যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ঃ

বাশীর, আবদুল্লা ইবন ইয়াযীদ খুতামী, আবু ওয়ায়িল, 'আলকামা, কায়স ইবন আবী হাতেম, 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ নাখ'ঈ, ইয়াযীদ ইবন শুরাইক, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন যায়িদ ইবন 'আবদি রাব্বিহি-আনসারী প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনাচারের অনুসরণ এবং 'আমর বিল মা'রূফ ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে পালন করতেন। একবার তিনি তাঁর এক দাসকে মারছেন। এমন সময় পিছন থেকে আওয়ায ভেসে এলা ঃ 'আবু মাস'উদ! একটু ভেবে দেখ। যে আল্লাহ তোমাকে তার ওপর ক্ষমতাবান করেছেন, তিনি তাকেও তোমার ওপর ক্ষমতাবান করতে পারতেন।' আওয়াযটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা)। আবু মাস'উদ ভীষণ প্রভাবিত হন। সেই মুহূর্তে তিনি শপথ করেন, আগামীতে কোন দিন আর কোন দাসের গায়ে হাত তুলবেন না। আর সেই দাসটিকে তিনি আযাদ (মুক্ত) করে দেন। (মুসনাদ-৫/২৭৩,২৭৪)

আমর বিল মা'রূফের দায়িত্ব পালন থেকেও তিনি কক্ষণো উদাসীন ছিলেন না। আর এ ব্যাপারে ছোট-বড় কারো পরোয়া করতেন না। হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) তখন কূফার আমীর। একদিন তিনি একটু দেরীতে আসরের নামায পড়ালেন। সাথে সাথে আবু মাস'উদ প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন ঃ আপনার জানা আছে, রাসূল (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামায জিবরীলের বর্ণনা মত সময়ে আদায় করতেন, আর বলতেনঃ এভাবেই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারী-২/৫৭১)

তিনি নিজে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করতেন। একদিন তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে নামায আদায় করতেন? তারপর তিনি নামায আদায় করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। (মুসনাদ–৫/১২২)

নামাযের জামা'য়াতে গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো রাসূলের (সা) সুন্নাত। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা তা পুরোপুরি পালন করছে না, তখন বলতেনঃ এমনভাবে দাঁড়ানোর ফায়দা এ ছিলো যে, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এখন তোমরা দূরে দূরে দাঁড়াও, এ জন্যেই তো বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত আবু মাস'উদকে (রা) মুফতী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তবে তিনি মাঝে মধ্যে ফাতওয়া দিতেন। ইবন 'আবদিল বার তাঁর 'জামি'উল 'ইলম' গ্রন্থে (২/১৬৬) ইবন সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ খলীফা 'উমার একবার আবু মাস'উদকে বলেন ঃ আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি ফাতওয়া দান করে থাক? ফাতওয়ার উষ্ণতা তার জন্য ছেড়ে দাও যে তার শৈত্যের স্পর্শ লাভ করেছে। অর্থাৎ আমীরের জন্য। আর তুমি তো আমীর নও। (হায়াতুস সাহাবা–২/২৫৩) ■

আবু কাতাদাহ্ আল–আনসারী (রা)

হযরত আবু কাতাদাহ মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামা শাখার সন্তান। তাঁর আসল নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন 'আল হারিস'; আবার কেউ বলেছেন 'আমর'। আল–কালবী ও ইবন ইসহাকের মতে 'আন–নু'মান'। তবে 'আল–হারিস' অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইতিহাসে তিনি 'আবু কাতাদাহ্' এ ডাক নামেই খ্যাত। পিতা রাব'য়ী ইবন বালদামা এবং মাতা কাবশা বিনতু মুতাহ্হির। তিনিও খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামার সাওয়াদ ইবন গানাম শাখার মেয়ে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের ১৮ বছর পূর্বে ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা–৫/২৭৪, আল ইসাবা–৪/১৫৮; আল–আ'লাম–২/১৫৪) তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণে যে কা'ব ইবন মালিক আল–আনসারীর শাস্তি হয় এবং পরে আল্লাহ পাক যাঁকে ক্ষমা করেন, তিনি আবু কাতাদাহ্র চাচাতো ভাই। সে সময় তিনিও অন্য সকলের মত কা'বকে বয়কট করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৬৭)

শেষ 'আকাবার পরে কোন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে। অনেকে তাঁকে বদরী সাহাবী বলেছেন। তবে মুসা ইবন 'উকবা বা ইবন ইসহাক, এঁদের কেউই বদরী সাহাবীদের তালিকার মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করেননি। উহুদসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (আল–ইসাবা–৪/১৫৮; উসুদুল গাবা–৫/২৭৪)

৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে জীকারাদ বা গাবা অভিযান পরিচালিত হয়। সেই অভিযানে তিনি দারুন দুঃসাহসের পরিচয় দান করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উটগুলি জীকারাদ নামক একটি পল্লীতে চরতো। রাসূলুল্লাহর (সা) দাস রাবাহ্ ছিলেন সেই উটগুলির দায়িত্বে। গাতফান গোত্রের কিছু লোক রাখালদের হত্যা করে উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা ইবন আকওয়া এ সংবাদ পেয়ে আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মদীনার দিকে মুখ করে শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি 'ইয়া সাবাহাহ্!' বলে তিনবার চিৎকার দেন। অন্যদিকে রাবাহকে দ্রুত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গাতফানী লুটেরাদের পিছে ধাওয়া করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে সাহায্যের জন্য দ্রুত তিনজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের পিছনে তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়েন। সালামা ইবন আকওয়া মদীনার সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, আবু কাতাদাহ আল–আনসারী, আল–আখরাম আল–আসাদী এবং তাঁদের পিছনে মিকদাদ আল–কিন্দী বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন। এই অশ্বারোহীদের দেখে গাতফানীরা উট ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আল–আখরাম আল–আসাদীর মধ্যে তখন শাহাদাতের তীব্র বাসনা কাজ করছে। তিনি সালামার নিষেধ অমান্য করে গাতফানীদের পিছে ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে তাঁর ও 'আবদুর রহমান গাতফারীর মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হয় এবং আল–আখরাম শাহাদাত বরণ করেন। আবদুর রহমান আল–আখরামের ঘোড়াটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় আবু কাতাদাহ্ এসে উপস্থিত হন এবং তিনি বর্শার এক খোঁচায় আবদুর রহমানকে হত্যা করেন। (আল–কামিল ফী আত–

তারীখ–২/১৮৯–১৯১; আল–ইসাবা–৪/১৫৮; হায়াতুস সাহাবা–১/৫৬১; সাহীহ মুসলিম–২/১০১)

অন্য একটি বর্ণনা মতে এই জীকারাদ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ্ যাকে হত্যা করেন তার নাম হাবীব ইবন 'উয়াইনা ইবন হিস্ন। তিনি হাবীবকে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে শত্রুর পিছনে আরও এগিয়ে যান। পিছনের লোকেরা যখন দেখতে পেল, আবু কাতাদাহ্র চাদর দিয়ে একটি লাশ ঢাকা তখন তারা মনে করলো, নিশ্চয় এ আবু কাতাদাহ্র লাশ। সাথে সাথে তারা 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারণ করলো। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো; আবু কাতাদাহ্ নিহত হয়েছে। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন; আবু কাতাদাহ্ নয়; বরং আবু কাতাদাহ্র হাতে নিহত ব্যক্তির লাশ। সে একে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে তোমরা বুঝতে পার, এর ঘাতক সেই। এ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ্র ঘোড়াটির নাম ছিল 'হাযওয়া'। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৮৪)

আবু কাতাদাহ বলেন, জীকারাদের দিন অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার কেশ ও ত্বকে বরকত দাও। তার চেহারাকে কামিয়াব কর। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ আপনার চেহারাও কামিয়াব করুন! (উসুদুল গাবা–৫/২৭৫) এ দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ 'আবু কাতাদাহ্ আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী।' (আল–কামিল ফী আত–তারীখ–২/১৯১; আল–ইসাবা–৪/১৫৮)

হুদাইবিয়া সন্ধির সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবু কাতাদাহ্ও ছিলেন। এ সফরে ফেরার পথে একদিন রাসূলসহ (সা) তাঁর সফর সঙ্গীদের ফজরের নামায কাজা হয়ে যায়। সে কাজা নামায কখন কিভাবে রাসূল (সা) আদায় করেছিলেন তার একটা বিবরণ আবু কাতাদাহ্ বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৯)

হিজরী সপ্তম অথবা অষ্টম সনে রাসূল (সা) আবু কাতাদাহ্র নেতৃত্বে একটি বাহিনী 'ইদাম' –এর দিকে পাঠান। এই 'ইদাম' একটি স্থান বা একটি পাহাড়ের নাম এবং মদীনা থেকে শামের রাস্তায়। তাঁরা 'ইদাম' উপত্যকায় পৌছানোর পর তাঁদের পাশ দিয়ে 'আমের ইবন আল–আদবাত আল–আশজা'য়ী যাচ্ছিলেন। তিনি আবু কাতাদাহ্ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সালাম দিলেন। তা সত্ত্বেও পূর্ব শত্রুতার কারণে এ বাহিনীর সদস্য মুহাল্লিম ইবন জাসসামা ইবন কায়েস তাঁকে হত্যা করেন এবং তাঁর উট ও অন্যান্য জিনিস ছিনিয়ে নেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে যখন তাঁকে এ ঘটনা অবহিত করেন তখন সূরা আন নিসার ৯৪ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৮১; হায়াতুস সাহাবা–২/৩৮৯)

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নেবে কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে ইহ–জীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও'। কারণ, আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।' (সূরা আন নিসা–৯৪)

হিজরী ৮ম সনের শা'বান মাসে রাসূল (সা) নাজ্দের 'খাদরাহ্' নামক স্থানের দিকে পনেরো সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। আবু কাতাদাহ্ ছিলেন এই বাহিনীর আমীর। সেখানে

গাতফান গোত্রের বসতি ছিল। তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু এক লুটেরা গোত্র। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। একারণে সারা রাত চলতেন এবং দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে হঠাৎ তাঁরা গাতফান গোত্রে পৌঁছে যান। তারাও ছিল ভীষণ সাহসী। সাথে সাথে বহুলোক উপস্থিত হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু হলো। আবু কাতাদাহ্ সঙ্গীদের বললেন, যারা তোমাদের সাথে লড়বে শুধু তাদেরকেই হত্যা করবে। সবাইকে ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন নেই। এমন নীতি গ্রহণের ফলে দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মাত্র ১৫ দিন পর প্রচুর গণীমতের মাল সংগে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। গণীমতের মালের মধ্যে ছিল দু'শো উট, দু' হাজার ছাগল এবং বহু বন্দী। এই মালের এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকী সবই তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল (সা) রমজান মাসে ৮ জন লোকের একটি দল 'বাতানে আখাম'–এর দিকে পাঠান। এঁদেরও নেতা ছিলেন আবু কাতাদাহ্। 'বাতানে আখাম'–এর অবস্থান হচ্ছে জী–খাশাব ও জী–মারওয়ার মাঝামাঝি মদীনা থেকে মক্কার দিকে তিন মানযিল দূরে। রাসূল (সা) মক্কায় সেনা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মানুষ যাতে একথা মোটেই বুঝতে না পারে এ জন্য এই দলটিকে পাঠান। মূলতঃ মানুষের চিন্তা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একাজ করেন। জী–খাশাব পৌঁছার পর এ দলটি জানতে পেল যে, রাসূল (সা) মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁরা 'সুকাইয়্যা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহিনীর সাথে মিলিত হন। (তাবাকাতঃ মাগাযী অধ্যায়–৯১)

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে লড়াই এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানদের অনেক বড় বড় বীরও পিছু হঠতে বাধ্য হন। আবু কাতাদাহ্ এ যুদ্ধে দারুন বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এক স্থানে একজন মুসলমান ও একজন মুশরিক সৈনিকের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হচ্ছে। দ্বিতীয় একজন পিছন দিক থেকে মুসলিম সৈনিককে আক্রমণের পায়তারা করছে। ব্যাপারটি আবু কাতাদাহ্র নজরে পড়লো। তিনি চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে লোকটির কাঁধে তরবারির ঘা বসিয়ে দিলেন। লোকটির একটি হাত কেটে পড়ে গেল; কিন্তু অতর্কিতে সে দ্বিতীয় হাতটি দিয়ে আবু কাতাদাহ্র গলা পেঁচিয়ে ধরলো। লোকটি ছিল অতি শক্তিশালী। সে এত জোরে আবু কাতাদাহ্কে চাপ দিল যে, তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে লোকটির দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় সে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আবু কাতাদাহ্ লোকটির দেহে আরেকটি ঘা বসিয়ে দেন। লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবু কাতাদাহ্ যখন তার হত্যা কর্মে ব্যস্ত তখন মক্কার এক মুসলিম সৈনিক সেই পথে যাচ্ছিল। সে নিহত ব্যক্তির সকল সাজ–সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেল। এরপর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দারুন ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা ময়দান থেকে যে যেদিকে পারে, পালিয়ে যাচ্ছিল। আবু কাতাদাহ্ও এক দিকে যাচ্ছেন। পথে এক স্থানে হযরত 'উমারের (রা) সাথে দেখা। আবু কাতাদাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কী ব্যাপার? 'উমার (রা) বললেনঃ আল্লাহর যা ইচ্ছা। এর মধ্যে মুসলমানরা দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং রণক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।

আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ যুদ্ধ থেমে গেল। আমরাও বিশ্রাম নিচ্ছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা)

ঘোষণা করলেনঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিস লাভ করবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন সাজ-সরঞ্জামবিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। আমি যখন তার হত্যা কর্মে ব্যস্ত তখন কে একজন তাঁর জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তাকে চিনিনে। তখন মক্কার সেই ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্য বলেছে। নিহত ব্যক্তির জিনিস আমার কাছে আছে। সেগুলি আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁকে একটু রাজী করিয়ে দিন।

সাথে সাথে আবু বকর (রা) বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর কসম! রাসূল (সা) তাকে রাজী করাবেন না। একজন শেরে খোদা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে, আর তুমি তার প্রাপ্য জিনিস হাতানোর মতলবে আছ? নিহত ব্যক্তির জিনিস তাকে দিয়ে দাও। তখন রাসূল (সা) বললেনঃ আবু বকর সত্য বলেছে। তুমি তার লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়ে দাও। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ আমি সেই জিনিসগুলি নিয়ে বিক্রী করি এবং সে অর্থ দিয়ে দশটির মত খেজুর গাছ ক্রয় করি। ইসলাম গ্রহণের পর এই ছিল আমার প্রথম কোন সম্পদ ক্রয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৮, ৪৪৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৯০, ৯১; মুসনাদ-৫/৩০৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর খলীফাদের সময়ে আবু কাতাদাহ্র কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় নিজ গৃহে ঘেরাও অবস্থায়, তখন হজ্জ মওসুম। সে সময় একদিন আবু কাতাদাহ্ অন্য একজন লোককে সংগে করে খলীফা 'উসমানের (রা) নিকট গিয়ে হজ্জে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন। তখন তারা খলীফার নিকট জানতে চানঃ যদি এই বিদ্রোহীরা বিজয়ী হয় তাহলে তাঁরা কার সাথে থাকবেন? খলীফা বললেনঃ সংখ্যা গরিষ্ঠ জামা'য়াতের সাথে। তাঁরা আবার প্রশ্ন করেন ঃ যদি এই সংখ্যা গরিষ্ঠ জামা'য়াতই আপনার ওপর বিজয়ী হয় তখন কার সাথে থাকবো? সংখ্যা গরিষ্ঠ দল যারাই হোক না কেন তাদের সাথে থাকবে। (হায়াতুস সাহাবা-২/১২৬)

হযরত আলী (রা) তাঁকে একবার মক্কার আমীর নিয়োগ করেন। পরে তাঁর স্থলে কুছাম ইবন 'আব্বাসকে নিয়োগ করেন। হিজরী ৩৬ সনে উটের যুদ্ধ এবং এর পরের বছর সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) দু'টি যুদ্ধেই হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগ দেন। (আল-আ'লাম-২/১৫৪; আল-ইসাবা-৪/১৫৮) হিজরী ৩৮ সনে খারেজীরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। হযরত আলী (রা) যে বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, আবু কাতাদাহ্ ছিলেন তার পদাতিক দলের অফিসার।

হযরত আবু কাতাদাহ্র (রা) মৃত্যু সন নিয়ে দারুন মতভেদ আছে। কুফাবাসীদের মতে হিজরী ৩৮ সনে তিনি কুফায় মারা যান এবং হযরত আলী (রা) সাত তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইমাম শা'বী বলেন, সাত নয়, বরং ছয় তাকবীরের সাথে। হাসান ইবন 'উসমান বলেন, তিনি হিজরী-৪০ সনে মারা যান। ওয়াকিদী বলেন, হিজরী ৫৪ সনে ৭২ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। আবার কেউ বলেছেন, ৭২ নয়; বরং ৭০ বছর বয়সে। ইমাম বুখারী 'আল-আওসাত' গ্রন্থে যারা হিজরী ৫০ থেকে ৬০ সনের মধ্যে মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু কাতাদাহ্র নামটি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মারওয়ান যখন মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে মদীনার ওয়ালী তখন তিনি আবু কাতাদাহ্কে একবার দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান

এবং তিনি মারওয়ানের সাথে দেখা করেন। এর সমর্থনে আর একটি বর্ণনা দেখা যায়। মু'য়াবিয়া (রা) যখন মদীনায় আসেন তখন সবশ্রেণীর মানুষ তাঁর সাথে দেখা করে। তখন তিনি আবু কাতাদাহ্কে ডেকে বলেনঃ শুধু আপনারা–আনসাররা ছাড়া সব মানুষই আমার সাথে দেখা করেছে। এসব বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় তিনি হিজরী ৪০ সনের পরে মারা গেছেন। (দ্রঃ আল–ইসাবা৪/১৫৯; আল–আ'লাম–২/১৫৪; উসুদুল গাবা–৫/২৭৫)

হযরত আবু কাতাদাহ্র (রা) দৈহিক আকার–আকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ঘাড় পর্যন্ত চুল রাখতেন যাকে 'হামিয়্যা' বলা হয়। চুলে মাঝে মাঝে চিরুনী করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার তাঁর চুলের অযত্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখে বলেন, এগুলি একটু ঠিক কর। মানুষের উচিত চুল রাখলে তার যত্ন নেওয়া। অন্যথায় সে রাখায় ফায়দা কি?

তাঁর ছিল চার ছেলে ঃ আবদুল্লাহ, মা'বাদ, আবদুর রহমান ও সাবিত। শেষের জন ছিলেন দাসীর গর্ভজাত। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সালাফা বিনতু বারা' ইবন মা'রূর ইবন সাখার। সুলামা খান্দানের এক অভিজাত ঘরের মেয়ে। তিনি নিজেও একজন 'সাহাবিয়্যা' (মহিলা সাহাবী) এবং তাঁর পিতা বারা' ইবন মা'রূর ইবন সাখারও ছিলেন একজন খ্যাতিমান সাহাবী।

হযরত আবু কাতদাহ্ কুরআন–হাদীসের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ছিলেন দারুন সতর্ক। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'কিজব 'আলার রাসূলে'– বা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপের হাদীস শোনার পর থেকে হাদীসের ব্যাপারে দারুন সতর্কতা আবলম্বন করেন। (মুসনাদ–৫/২৯২)

একদিন তাবেঈদের একটি মজলিসে হাদীসের চর্চা হচ্ছিল। প্রত্যেকেই বলছিলেন, 'রাসূল (সা) এমন বলেছেন, রাসূল (সা) এমন বলেছেন'। আবু কাতাদাহ্ তাঁদের এসব আলোচনা শুনে বললেন; হতভাগার দল, তোমাদের মুখ থেকে এসব কী বের হচ্ছে? রাসূল (সা) মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের জাহান্নামের শাস্তির কথা বলেছেন। (মুসনাদ–৫/৩১০)

এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০ (একশত সত্তর)। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ সাহাবাগণ আছেন, তেমনি আছেন শ্রেষ্ঠ তাবে'ঈগণও। যেমন ঃ আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ নাফে, (তাঁর আযাদকৃতদাস), সা'ঈদ ইবন কা'ব ইবন মালিক, কাবশা বিনতু কা'ব ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ, 'আতা ইবন ইয়াসার, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আউফ, 'উমার ইবন সুলাইম যারকী, 'আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব প্রমুখ। উল্লেখিত ব্যক্তিগণের সকলেই হাদীস শাস্ত্রের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

হযরত আবু কাতাদাহ্র মধ্যে ইসলামী উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্বের চরম বিকাশ ঘটেছিল। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এক আনসারী ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলো জানাযার জন্য। রাসূল (সা) প্রথমে জানতে চাইলেন, তর ওপর কোন ঋণ আছে কিনা। লোকেরা বললো তার দু'দীনার ঋণ আছে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, সে কোন সম্পদ রেখে গেছে কিনা। লোকেরা বললো, না, সে কিছুই রেখে যায়নি। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা তার নামায পড়। হযরত আবু কাতাদাহ্ আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি যদি তার ঋণ পরিশোধ

করে দেই, আপনি কি নামায পড়াবেন? বললেনঃ হাঁ। আবু কাতাদাহ্ লোকটির ঋণ পরিশোধ করে রাসূলকে (সা) খবর দিলেন। রাসূল (সা) এসে জানাযার নামায পড়ান। (মুসনাদ–৫/২৯,২০৩)

একজন মুসলমান তাঁর কাছে কিছু ঋণী ছিল। যখন তিনি তাগাদায় যেতেন তখন সে লুকিয়ে থাকতো। একদিন তিনি লোকটির বাড়ীতে গেলেন এবং তার ছেলের কাছে খবর পেলেন, সে খাবার খাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন ঃ তুমি বেরিয়ে এসো, আজ আমি জেনে ফেলেছি। আজ লুকিয়ে কাজ হবে না। সে বেরিয়ে এলে আবু কাতাদাহ্ তার এভাবে লুকানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললোঃ আসল কথা হলো, আমি খুবই গরীব। আমার কাছে কিছুই নেই। তার ওপর আছে পরিবার–পরিজনের বোঝা। আবু কাতাদাহ্ বললেন ঃ সত্যিই কি তোমার এমন দুরবস্থা? সে বললোঃ হাঁ। আবু কাতাদাহ্‌র চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনি তার ঋণ মাফ করে দিলেন। (মুসনাদ–৫/৩০৮)

হযরত আবু বকরের (সা) খিলাফতকালে রিদ্দার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে খলীফা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে পাঠালেন মালিক ইবন নুওয়াইরা ইয়ারবু'য়ীর বিরুদ্ধে। মালিক ইবন নুওয়াইরা ইসলাম কুবল করেন। তা সত্ত্বেও যে কোন কারণেই হোক খালিদ তাঁকে হত্যা করেন। খালিদের একাজে আবু কাতাদাহ্ এতই ক্ষুব্ধ হন যে, খলীফার নিকট আবেদন করেন; আমি খালিদের অধীনে থাকতে রাজী নই। সে একজন মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছে।

অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি মানুষকে সঠিক আকীদা বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। একবার তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় একটা উল্কা ছুটে আসতে থাকে। মানুষ সে দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এটা বেশী দেখা নিষেধ (মুসনাদ–৫/২৯৯)

হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, পানি কোথায় আছে তা খুঁজে বের কর অন্যথায় সকালে ঘুম থেকে পিপাসিত অবস্থায় উঠতে হবে। লোকেরা পানির তালাশে বেরিয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থেকে গেলেন। রাসূল (সা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ঘুম কাতর অবস্থায় তিনি যখন এক দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন তখন আবু কাতাদাহ্ এগিয়ে গিয়ে নিজের হাত দিয়ে সে দিকে ঠেস দিচ্ছিলেন। একবার তো রাসূল (সা) পড়ে যাবারই উপক্রম হলেন। আবু কাতাদাহ্ দ্রুত হাত দিয়ে ঠেকালেন। রাসূল (সা) চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে? বললেনঃ আবু কাতাদাহ্। রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ কখন থেকে আমার সাথে আছ? বললেনঃ সন্ধ্যা থেকে। তখন রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এই বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি আবু কাতাদাহ্‌কে হিফাজত করুন যেমন সে সারা রাত আমার হিফাজত করেছে। (মুসনাদ–৫/২৯৮; হায়াতুস সাহাবা–৩/৩৪৭; আল–ইসাবা–৪/১৫৯)

একবার হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেন। আবু নু'য়ায়িম 'আদ–দালায়িল' গ্রন্থে (১৪৪) ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলাম। এক সময় যাত্রা বিরতিকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের সাথে কি পানি আছে? বললামঃ হাঁ। আমার কাছে একটি পাত্রে

কিছু পানি আছে। বললেনঃ নিয়ে এসো। আমি পানির পাত্রটি নিয়ে এলাম। তিনি বললেনঃ এর থেকে কিছু পানি নিয়ে তোমরা সবাই অজু কর। অজুর পর সেই পাত্রে এক ঢোক মত পানি থাকলো। রাসূল (সা) বললেনঃ আবু কাতাদাহ্, তুমি এ পানিটুকু হিফাজতে রেখে দাও। খুব শিগগিরই এর একটি খবর হবে। আস্তে আস্তে দুপুরের প্রচন্ড গরম শুরু হলো। রাসূল (সা) সঙ্গীদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা সবাই বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিপাসায় তো আমাদের জীবন যায় যায় অবস্থা। তিনি বললেনঃ না, তোমরা মরবে না। এই বলে তিনি আবু কাতাদাহ্কে ডেকে পানির পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ আমি পাত্রটি নিয়ে এলাম। রাসূল (সা) বললেনঃ আমার পিয়ালাটি নিয়ে এসো। পিয়ালা আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে একটু করে পানি পিয়ালায় ঢেলে মানুষকে পান করাতে লাগলেন। পানি পানের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) চারপাশে ভীড় জমে গেল। দারুন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাসূল (সা) বললেনঃ তোমরা ভদ্রভাবে শান্ত থাক, সবাই পান করতে পারবে। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ একমাত্র রাসূল (সা) ও আমি ছাড়া সকলের পান শেষ হলে তিনি বললেনঃ আবু কাতদাহ্, এবার তুমি পান কর। আমি বললাম! আপনি আগে পান করুন। তিনি বললেনঃ সম্প্রদায়ের যিনি সাকী বা পানি পান করান, তিনি সবার শেষে পান করেন। অতঃপর আমি পান করলাম এবং সবার শেষে রাসূল (সা) পান করলেন। সবার পান করার পরেও পাত্রে ঠিক যতটুকু পানি ছিল তাই থেকে গেল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সে দিন তিন শো লোক ছিল। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোক সংখ্যা ছিল সাতশো। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬২০, ৬২১)

তিনি স্বভাবগতভাবেই ছিলেন কোমল। জীবের প্রতি ছিল তাঁর দারুন দয়া। একবার ছেলের বাড়ী গেলেন। ছেলের বউ অজুর জন্য পানি রেখেছিল। একটি বিড়াল তাতে মুখ দিয়ে পান করতে শুরু করলো। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) বিড়ালটি না তাড়িয়ে পাত্রটি তার দিকে আরো একটু কাত করে দিলেন, যাতে সে ভালো করে পান করতে পারে। পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের বউ এ দৃশ্য দেখছিল। তিনি ছেলে-বউকে বললেন ঃ এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিড়ালের এঁটে না পাক নয়। কারণ, এরা ঘরের মধ্যে বিচরণকারী জীব। (মুসনাদ-৫/৩০৩)

শিকার করা ছিল তাঁর বিশেষ শখ। একবার হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে যাচ্ছিলেন। পথে যাত্রা বিরতিকালে কয়েকজন সংগী নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। স্থানটি ছিল পাহাড়ী এলাকা। খুব দ্রুত পাহাড়ে উঠার অভ্যাস ছিল তাঁর। তিনি সংগীদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। সেখানে একটি জন্তু দেখতে পেলেন। আবু কাতাদাহ্ একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে সংগীদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা বলতো এটা কি জন্তু? তাঁরা বললেনঃ আমরা তো ঠিক বলতে পারছিনা। তিনি বললেনঃ এটা একটা বন্য গাধা। আবু কাতাদাহ্ পাহাড়ে উঠার সময় তাঁর চাবুকটি ভুলে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি সংগীদের চাবুকটি নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়। একারণে তাঁরা শিকারে কোন রকম সহযোগিতা করলেন না। শেষে তিনি নিজেই বর্শা নিয়ে জন্তুটির পিছু ধাওয়া করে হত্যা করেন। তারপর সেটি ওঠানোর জন্য সংগীদের সাহায্য চান; কেউ তাঁকে সাহায্য করলেন না। অবশেষে তিনি একাই সেটা উঠিয়ে আনেন এবং গোশত তৈরী করে রান্না করেন। কিন্তু সংগীরা খেতে দ্বিধাবোধ করেন।

কেউ কেউ সেই গোশ্ত খেলেন, আবার অনেকে খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু কাতাদাহ্ বললেন, আচ্ছা আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে বলছি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করে ঘটনাটি খুলে বললেন। রাসূল (সা) শুনে বললেনঃ ওটা খেতে অসুবিধা কি? ওটা তো আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো। গোশত সামনে আনা হলে রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেনঃ তোমরা খাও। (ফাতহুল বারী–৯/৫২৮)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। একারণে তাঁর বন্ধুদের একটা দল ছিল। হুদাইবিয়ার সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী ছিলেন। তিনি ইয়ার–বন্ধুদের সাথে হাসি–তামাশা ও কৌতুক করতে করতে পথ চলছিলেন। আবু মুহাম্মাদও ছিলেন তাঁর বান্ধব মজলিসের একজন সদস্য। (মুসনাদ–৫/২৯৫;৩০১)

হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) একবার একটি 'আদনী' (আদনে তৈরী) চাদর গায়ে জড়িয়ে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) দরবারে যান। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইবন মাস'য়াদাহ্ বসা ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবু কাতাদাহ্র গায়ের চাদরটি আবুদুল্লাহর গায়ে খসে পড়ে। অত্যন্ত রাগের সাথে আবদুল্লাহ সেটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। আবু কাতাদাহ্ প্রশ্ন করেনঃ আমীরুল মুমিনীন! লোকটি কে? বললেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মাস'য়াদাহ্। আবু কাতাদাহ্ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তার পিতার বুক বর্শা দিয়ে প্রতিরোধ করেছি– যে দিন সে মদীনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করেছিল। একথা শুনে 'আবদুল্লাহ চুপ থাকে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৪৯) উল্লেখ্য যে, আবু কাতাদাহ্ জীকারাদ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেই গাতফানী লুটেরাদের মধ্যে এই 'আবদুল্লাহর পিতাও ছিল। ■

আবূ সা'ঈদ আল-খুদারী (রা)

নাম সা'দ, ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। খুদরাহ বংশের সন্তান হওয়ার কারণে খুদারী বা খুদরী বলা হয়। তাঁর পিতা মালিক ইবন সিনান উহুদের অন্যতম শহীদ। এ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত হলে তিনি রাসূলের (সা) পবিত্র খুন চুষে গিলে ফেলেন। রাসূল (সা) তখন মন্তব্য করেন ঃ 'আমার রক্ত যার রক্তে মিশেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮০, তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৪) তাঁর মা উনায়সা বিনতু আবী হারিসা বনূ 'আদী ইবন নাজ্জারের কন্যা। দাদা সিনান ছিলেন মহল্লার রয়িস। তিনি ছিলেন একটি কিল্লার অধিপতি ও ইসলাম পূর্ব যুগের একজন বিচারক।

তাঁর মার প্রথম স্বামী ছিল আউস গোত্রের 'আম্মান নামক এক ব্যক্তি। সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি মালিক ইবন সিনানকে দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান আবূ সা'ঈদ হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-৪/৮৮, আল-আ'লাম-৩/১৩৮) প্রখ্যাত বদরী সাহাবী কাতাদাহ ইবন নু'মান (রা)- উহুদ যুদ্ধে যাঁর চোখ আহত হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর বরকতে আবার ভালো হয়ে যায়- আবূ সা'ঈদের বৈপিত্রীয় ভাই। হিজরী ২৩ সনে এই কাতাদাহ মারা গেলে আবূ সা'ঈদ তাঁকে কবরে নামিয়ে দাফন করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪২, উসুদুল গাবা- ৫/২১১)

বাই'য়াতে আকাবা থেকেই মোটামুটি মদীনায় ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। মদীনাবাসীদের অনেকেই তখন ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় মালিক ইবন সিনান ইসলাম কবুল করেন। স্বামীর সাথে স্ত্রীও মুসলমান হন। সুতরাং আবূ সা'ঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে ওঠেন।

হিজরাতের প্রথম বছরেই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আবূ সা'ঈদ এই নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে মোট বারোটি যুদ্ধে যোগ দেন। (তাহজীবুল আসমা-২/২৩৭, আল-আ'লাম-৩/১৩৮) অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। উহুদ যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধের পূর্বে পিতার সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি- এই বলে ফিরিয়ে দেন। পিতা মালিক তখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাত ধরে বলেন, ছেলের বয়স কম হলে কি হবে, তার হাত দু'টি পুরুষের মত সবল। তবুও রাসূল (সা) তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। (আল-ইসাবা-২/৩৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩০)

এই উহুদ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র মুখমন্ডল আহত হয়ে রক্ত রঞ্জিত হয়। মালিক ইবন সিনান সেই রক্ত পান করেন। রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ 'যদি কারও এমন ব্যক্তিকে দেখার ইচ্ছা হয় যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশেছে, সে যেন মালিক ইবন সিনানকে দেখে। এরপর বীরের মত যুদ্ধ করে মালিক শাহাদাত বরণ করেন।

আবূ সা'ঈদের পিতা কোন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন না। এ কারণে পিতার মৃত্যুতে তিনি পর্বত পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হলেন। দারিদ্র ও অনাহারে সময় সময় পেটে পাথর বেঁধে কাটাতেন। একদিন তিনি প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে আছেন। তখন তাঁর স্ত্রী (মতান্তরে মা অথবা দাসী) তাঁকে বললেন ঃ নবীর (সা) কাছে যাও, তাঁর কাছে কিছু চাও। অমুক এসে সাহায্য চেয়েছিল, তাকে তিনি দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহও তাকে চাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর যে নিজেকে গনী বা ধনী মনে করে আল্লাহও তাকে ধনবান করে দেন। আর যে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে সে ঐ ব্যক্তির থেকেও আমার বেশী প্রিয় যে আমার কাছে চায়।' একথা শুনে আমি আর কিছু চাইলাম না। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের রিযকে বরকত বা সমৃদ্ধি দান করতে লাগলো। অবশেষে, আনসারদের মধ্যে কোন বাড়ী আমাদের চেয়ে বেশী বিত্তশালী ছিল বলে আমি জানতাম না। (মুসনাদ-৩/৪৪৯; হায়াতুস সাহাবা-২/২৫৭)

খন্দক ও বনী মুসতালিকের যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। তবে 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থের একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ 'আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ খন্দকের দিন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে নিয়ে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর হাড় খুব শক্ত।' এরপরও তিনি আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে ফিরিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধে যোগ দিই।' ওয়াকিদী বলেন ঃ 'তখন আবূ সা'ঈদের বয়স পনেরো বছর।' (উসুদুল গাবা-৫/২১১, আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৪)

ইমাম আহমাদ আবূ সা'ঈদ খুদারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো গলায় এসে ঠেকেছে। এমন কোন দু'আ কি আছে যা আমরা পাঠ করতে পারি? বললেন ঃ হাঁ। বল ঃ আল্লাহুম্মা উসতুর 'আওরাতিনা ওয়া আমিন রাও'য়াতিনা- হে আল্লাহ আমাদের গোপন বিষয় গোপন রাখ এবং আমাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দান কর।' (হায়াতুস সাহাবা- ১/৪৮৮)

তিনি 'বাই'য়াতুশ শাজারা' বা 'বাই'য়াতুর রিদওয়ানে' অংশগ্রহণ করেন। (শাজারাতুজ জাহাব-১/৮১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) হিজরী ৮ম সনের সফর মাসে 'আবদুল্লাহ ইবন গালিব লায়সীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য ফিদাক যায়। তিনিও এই বাহিনীতে ছিলেন। আবদুল্লাহ সৈন্যদের তাকীদ দেন, তারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাহিনীর সদস্যদের পরস্পরের সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁকেও একজন বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন।

হিজরী ৯ম সনের রাবী'উস সানী মাসে 'আরকামা ইবন মুখাররকে ছোট একটি বাহিনীসহ একটি অভিযানে পাঠানো হয়। আবূ সা'ঈদ ছিলেন এ বাহিনীর অন্যতম সদস্য। (মুসনাদ-৩/২৭০; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭)

উপরোক্ত যুদ্ধগুলি ছাড়াও মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক, আওতাস প্রভৃতি অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত মোট ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাবুক যুদ্ধে মুসলমানদের চরম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হুনাইন যুদ্ধে লব্ধ

গনীমাতের বেশীর ভাগ যখন রাসূল (সা) মক্কাবাসী নওমুসলিমদের খুশী (তালীফে কুলুব) করার জন্য দান করেন তখন মদীনার আনসারদের অনেকে একটু ক্ষুণ্ণ হন। এ সম্পর্কিত ঘটনা আবূ সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৩৯৭–৩৯৮; ৩/৬২৫) তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে গিয়েছি রমজান মাসে। আমাদের কেউ সাওম পালন করতো, আবার কেউ করতো না। তবে একে অপরকে কোন রকম হিংসা করতো না। তারা প্রত্যেকেই জানতো যে, যে ব্যক্তি নিজেকে সক্ষম মনে করবে সে সাওম পালন করবে, আর এটাই তার জন্য উত্তম। আর যে নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম মনে করবে সে সাওম পালন করবে না। আর এটাই তার জন্য উত্তম।' (হায়াতুস সাহাবা– ১/৪৭৯)

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদেরকে একটি ছোটখাট অভিযানে পাঠালেন। বাহিনীর সর্বমোট সদস্য তিরিশজন এবং নেতা আবূ সা'ঈদ। যাত্রা পথে তাঁরা একটি স্থানে তাঁবু স্থাপন করে যাত্রা বিরতি করেন। নিকটেই ছিল একটি জনপদ। তাঁরা সেই জনপদের লোকদের বললেন, আমরা আপনাদের অতিথি। কিন্তু তারা অতিথিদের সেবা করতে পরিষ্কার অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে সেইদিন উক্ত জনপদের প্রধানকে বিচ্ছুতে কামড়ায়। নানা জনে নানা রকম চিকিৎসা চালালো; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাদেরকে কেউ পরামর্শ দিল, তোমরা এই অতিথিদের কাছে যাও, তাদের মধ্যে কারও হয়তো কোন চিকিৎসা জানা থাকতে পারে। পরামর্শমত তারা এসে বিষয়টি জানালো। আবূ সা'ঈদ বললেন, 'আমি ঝাড়–ফুঁক জানি, তবে পারিশ্রমিক হিসেবে তিরিশটি ছাগল দিতে হবে। তারা রাজি হয়ে গেল। আবূ সা'ঈদ তাদের সাথে গেলেন এবং সূরা মুহাম্মাদ পাঠ করে দংশিত স্থানে একটু থু থু লাগিয়ে দিলেন। তাতেই লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম তিরিশটি ছাগল নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল, এভাবে ছাগলগুলি নেওয়া ঠিক কিনা। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) জানানো হবে। মদীনায় পৌঁছেই তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘটনাটি খুলে বলেন। সবকিছু শুনে তিনি একটু মুচকি হাসি দেন। তারপর বলেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, এই সূরা ঝাড়–ফুঁকের কাজ দেয়? তোমরা ঠিকই করেছ। বকরীগুলি তোমরা ভাগ করে নেবে এবং আমাকেও একটি অংশ দিতে ভুল করবে না। (সহীহুল বুখারী– ১/২৫১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। খলীফা হযরত 'উমার ও হযরত 'উসমানের (রা) যুগে ফাতওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যিয়াদ ইবন মীনা'র সূত্রে ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন ঃ ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আবূ সা'ঈদ খুদারী, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ আসহাবে রাসূল 'উসমানের মৃত্যুর সময় থেকে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত মদীনায় ফাতওয়া দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৫৫)

হযরত আলীর (রা) যুগে খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। তখন তিনি বলতেন, তর্কীদের চেয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমি বেশী প্রয়োজন মনে করি। (মুসনাদ–৩/৩৩, ৫৬) হযরত ইমাম হুসাইন যখন মদীনা ছেড়ে কুফায় যাওয়া স্থির করেন, তখন আরও অনেক সাহাবীর মত আবূ সা'ঈদও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। (সুয়ূতী ঃ তারীখুল খুলাফা)

হিজরী ৫৯ সনে হযরত উম্মু সালামা (রা) ইনতিকাল করলে আবূ সা'ঈদ তাঁর জানাযায়

শরীক ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৩২) হিজরী ৬১ সনে হিজাযবাসীরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের (রা) হাতে বাই'য়াত করে। এই বাই'য়াতকারীদের মধ্যে হযরত আবূ সা'ঈদও ছিলেন।

হিজরী ৬৩ সনে দারুল হিজরাহ্ মদীনার অধিবাসীরা ইয়াযীদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে গাসীলুল মালায়িকা হযরত হানজালার ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহর হাতে বাই'য়াত করে তাঁকে নিজেদের আমীর বলে ঘোষণা দেয়। ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে মদীনাবাসীদের পরাভূত করে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইয়াযীদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। বিজয়ী ইয়াযীদ বাহিনী সেই সময় মদীনায় হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংসের তান্ডবলীলা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহর (সা) হারাম বা সম্মানিত শহর মদীনার এমন অসম্মান ও অবমাননা সেই সময় জীবিত সাহাবীরা দেখে দারুন মর্মাহত হন। আবূ সা'ঈদও এমন দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর খোঁজে একজন পৌঁছে যায় এবং তাঁকে হত্যার জন্য তরবারি উঠায়। তিনি প্রথমতঃ তাকে ভয় দেখানোর জন্য তরবারি তুলে ধরেন। কিন্তু সৈন্যটি আরও এগিয়ে এলে তিনি তরবারি মাটিতে রেখে দিয়ে সূরা আল–মায়িদার ২৮ নং আয়াতটি পাঠ করেনঃ

'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও তবুও আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার হাত বাড়াবো না। কারণ, আমি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে ভয় করি।'

সৈনিকটি থেমে যায়। সে প্রশ্ন করে, আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো আপনি কে? বললেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ আল খুদারী। আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী? বললেন! হাঁ। সৈনিকটি গুহা ছেড়ে চলে গেল। (আল–ইসাবা–৩/৫৫) আবূ সা'ঈদ গুহা থেকে বাড়ী আসলেন। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ চললো এবং বন্দী করা হলো। অবশেষে প্রচন্ড চাপের মুখে ইয়াযীদের প্রতি বাই'য়াত করতে বাধ্য হলেন।

একথা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) অবগত হয়ে তাঁর কাছে যান এবং বলেন ঃ শুনেছি আপনি নাকি দুই আমীরের বাই'য়াত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন? বললেন ঃ হাঁ। প্রথমে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের এবং বন্দী হওয়ার পরে ইয়াযীদের প্রতি বাই'য়াত করেছি। ইবন 'উমার বললেন ঃ আমি এমনই আশংকা করেছিলাম। আবূ সা'ঈদ বললেন ঃ কিন্তু আমার করার কি ছিল? কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, মানুষের প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যা কোন না কোন আমীরের অধীনে অতিরাহিত হওয়া উচিত। একথা শুনে ইবন 'উমার বললেন, যাই হোক না কেন, আমি দুই আমীরের প্রতি বাই'য়াত পছন্দ করিনে। (মুসনাদ–৩/২৯, ৩০)

বেশী সংখ্যক বর্ণনা মতে তিনি হিজরী ৭৪ সনে (খ্রীঃ ৬৯৩) শুক্রবার মদীনায় মারা যান এবং তাঁকে মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। অপর একটি বর্ণনা মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৬৪। মৃত্যুকালে অনেক বয়স হয়েছিল। বার্দ্ধক্যের দরুন হাত–পা কাঁপতো। অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞের ধারণা, তিনি ৭৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তবে আল্লামা জাহাবী লিখেছেন, তিনি ৮৬ বছর বয়সে মারা যান এবং এটাই সঠিক। (দ্রঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৩৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–২/২৩৭, আল–আ'লাম–৩/১৩৮, শাজারাতুজ জাহাব–১/৮১, উসুদুল গাবা–৫/২১১)

হযরত আবূ সা'ঈদের ছিল দুই স্ত্রী। একজনের নাম যয়নাব বিনতু কা'ব ইবন আজযাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। দ্বিতীয়জন উম্মু 'আবদিল্লাহ বিনতু 'আবদিল্লাহ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সন্তানদের নাম ঃ আবদুর রহমান, হামযাহ্ ও সা'ঈদ।

হযরত আবূ সা'ঈদ ছিলেন আহলুস্ সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। কোন ক্বারীর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনে আনসারদের কয়েকটি হালকায়ে দারস ছিল। সেখানে আনসারদের 'আলিম ব্যক্তিরা দারস দিতেন। আবূ সা'ঈদের ছাত্র জীবনের যুগটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগ। সেই সময় মানুষ ঠিক মত শরীর ঢাকার মত কাপড়ও সংগ্রহ করতে পারতো না। হালকায়ে দারসে একজন আর একজনের আড়ালে আবডালে চুপে চুপে বসে যেত। একদিন এমন একটি হালকায়ে দারসে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে ক্বারীর কিরাত থেমে গেল। তিনি সবাইকে গোল হয়ে বসতে বলে নিজেও তাদের সাথে বসে গেলেন। সেই হালকায় সে দিন যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আবূ সা'ঈদকে রাসূল (সা) চিনতেন। (মুসনাদ-৩/৬৩, হায়াতুস সাহাবা-৩/২০৪)

হাদীস ও ফিকাহর জ্ঞান তিনি সরাসরি রাসূল (সা) ও অন্য সাহাবীদের নিকট থেকে অর্জন করেন। চার খলীফা ও যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট থেকে তিনি হাদীস শোনেন। অসংখ্য হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১১৭০টি। যাঁরা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি এমন একজন হাফেজে হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ৪৩টি মতান্তরে ৪৬টি মুত্তাফিক 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন।)এবং বুখারী ও মুসলিম প্রত্যেকেই এককভাবে যথাক্রমে ১৬টি ও ৫২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সকল বিখ্যাত সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শোনেন ও বর্ণনা করেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

যায়িদ ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, আনাস ইবন মালিক, ইবন 'উমার, ইবন যুবাইর, জাবির, আবূ কাতাদাহ, ইবন 'আমর, মাহমূদ ইবন লাবীদ, আবুত তুফায়েল, আবূ উমামা ইবন সাহল, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, তারিক ইবন শিহাব, 'আতা, মুজাহিদ, আবূ 'উসমান আন-নাহদী, 'উবায়দ ইবন 'উমায়র, 'আয়্যাদ ইবন আবী সারাহ, বুসর ইবন সা'ঈদ, আবূ নুদবাহ্, ইবন সীরীন প্রমুখ। (দ্রঃ আল-ইসাবা-২/৩৫, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/২৩৭, আল-আ'লাম-৩/১৩৮)

তাঁর হালকায়ে দারস সব সময় ছাত্রে পরিপূর্ণ থাকতো। কেউ কোন প্রশ্ন করতে চাইলে অনেক প্রতীক্ষার পর সুযোগ পেত। (মুসনাদ-৩/৩৫) দারসের সময় ছাড়াও যে কোন সময় লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা জানতে পারতো। প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন। একবার ইবন 'আব্বাস ছেলে 'আলী ও দাস 'আকরামাকে বললেন, যাও তো আবূ সা'ঈদের নিকট থেকে হাদীস শুনে এস। তারা যখন পৌছলেন, আবূ সা'ঈদ তখন বাগিচায়, তিনি তাদের সাথে বসেন এবং হাদীস শোনান। (মুসনাদ-৩/৯০, ৯১)

হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে কিভাবে তিনি সে হাদীস শুনেছিলেন সে অবস্থারও বর্ণনা দিতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি হাদীস শোনেন। এই লোকটি আবূ সা'ঈদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে। ইবন 'উমার ঐ লোকটিকে সংগে করে আবূ সা'ঈদের নিকট যান এবং প্রশ্ন করেনঃ এই ব্যক্তি কি অমুক হাদীসটি আপনার নিকট থেকে শুনেছে? আর আপনি কি তা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন ঃ আমার দু'চোখ দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে। (মুসনাদ-৩/৪)

একবার কুয'য়া নামক একজন ছাত্রের নিকট একটি হাদীস খুব ভালো লাগে। তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, হাদীসটি কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন? এমন প্রশ্নে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ তাহলে কি না শুনেই আমি বর্ণনা করছি? হাঁ, আমি শুনেছি। (মুসনাদ-৩/৯১)

যে সকল হাদীস রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শোনা শব্দাবলীর ওপর আস্থা না হতো সেগুলি বর্ণনার ব্যাপারে দারুন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন একবার একটি হাদীস বর্ণনা করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) নামটি উচ্চারণ করলেন না। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলো, এটা কি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত? বললেন ঃ আমিও জানি।

আবূ সা'ঈদ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপদেশ মত তাঁর ছাত্রদের আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানাতেন। ইমাম তিরমিযী আবূ হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ সা'ঈদের কাছে গেলে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অসীয়াতের (উপদেশ) প্রতি স্বাগতম। নবী (সা) বলেছেন ঃ মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে। কিছু লোক নানা স্থান থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তোমরা তাদের ভালো উপদেশ দেবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদেরকে শিক্ষা দেবে এবং বলবে মারহাবা, মারহাবা, নিকটে এস।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/২০২, কানযুল 'উম্মাল-৫/২৪৩)

আবূ সা'ঈদ আরও বর্ণনা করেন। 'রাসূল (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তাদের (ছাত্রদের) মজলিসে বসার স্থান করে দিই, তাদের হাদীস শিখাই।' কারণ, তোমরাই তো আমাদের পরবর্তী প্রতিনিধি, আমাদের পরবর্তী মুহাদ্দিস। তিনি তাঁর ছাত্রদের আরও বলতেন ঃ তুমি কোন বিষয় না বুঝলে তা বুঝার জন্য বার বার প্রশ্ন করবে। কারণ, তুমি বুঝে আমার মজলিস থেকে উঠে যাও- এটা তোমার না বুঝে উঠে যাওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২০৩, কানযুল 'উম্মাল-৫/২৪৩)

তিনি ছাত্রদের হাদীস লিখে দিতেন না। তাবরানী আবূ নাদরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদকে বললাম, আপনি আমাদেরকে হাদীস লিখে দিন। তিনি বললেন ঃ আমরা কক্ষণও লিখে দেবনা এবং কক্ষণও হাদীসকে কুরআন বানাবো না। তোমরা বরং আমাদের নিকট থেকে এমনভাবে গ্রহণ কর যেমন আমরা রাসুলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২১৭)

হানজালা ইবন আবী সুফইয়ান আল-জুমাহী তাঁর শায়খদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন! আবূ সা'ঈদ আল-খুদারী অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) ঘটনাবলীর অধিকতর সমঝদার ব্যক্তি আর কেউ নেই। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/২৩৭)

অত্যন্ত সত্যভাষী ছিলেন তিনি। বলতেন ঃ আমি রাসূলকে (সা) সত্য ভাষণের প্রতি জোর তাকীদ দিতে শুনেছি। হায়, যদি তা না শুনতাম! (মুসনাদ-৩/৫) একবার সত্য ভাষণের হাদীসটির আলোচনা উঠলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তারপর বলেন ঃ হাদীসটি তো অবশ্যই শুনেছি; কিন্তু তার ওপর 'আমল মোটেও হচ্ছেনা। (মুসনাদ-৩/৬১, ৭১)

হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) শাসনকালে অনেক বিদ'য়াতের প্রচলন হতে থাকে। তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মু'য়াবিয়ার (রা) কাছে যান এবং এক এক করে সকল বিদ'য়াতের কথা

তাঁর কর্ণগোচর করেন। (মুসনাদ–৩/৮৪) একবার আমীর মু'য়াবিয়ার সাথে তাঁর আনসারদের সম্পর্কে কথা হয়। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের কষ্টে ধৈর্য ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমীর মু'য়াবিয়া বললেন ঃ তাহলে তোমরা ধৈর্য ধর। (মুসনাদ–৩/৮৯)

একবার উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ানের দরবারে বসে সাহাবীদের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনালেন। মারওয়ান বিশ্বাস করতে চাইলেন না। উক্ত বৈঠকে হযরত যায়িদ ইবন সাবিত ও রাফে 'ইবন খাদীজও উপস্থিত ছিলেন। আবূ সা'ঈদ প্রথমে তাদের দুইজনকে স্বাক্ষী মানলেন। তারপর বললেন ঃ তাঁরাই বা কেন বলবে? একজনের তো সাদাকার দায়িত্ব থেকে অপসারণের ভয় আছে, আর অন্যজনের আপনার একটু ইশারাতেই গোত্রের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়। এমন স্পষ্ট কথা শুনে মারওয়ান তাঁকে কোড়া দিয়ে মারার জন্য উদ্যত হয়। তখন ঐ ব্যক্তিদ্বয় তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেন। (মুসনাদ–৩/২৩)

এমনিভাবে এক 'ঈদের দিনে মারওয়ান মিম্বার বের করেন এবং নামাযের পূর্বে খুতবা দেন। এক ব্যক্তি উঠে প্রতিবাদ করে বলে, এ দু'টি কাজই সুন্নাতের পরিপন্থী বিদ'য়াত। মারওয়ান বললেন ঃ পূর্বের পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। সেখানে আবূ সা'ঈদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, যা কিছুই হোক না কেন, লোকটি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি হযরত রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করতে দেখে তাহলে তার উচিত শক্তি প্রয়োগে তা প্রতিরোধ করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে উচিত মুখে প্রতিবাদ করা, আর তাও সম্ভব না হলে কমপক্ষে অন্তরে তা ঘৃণা করা উচিত। (মুসনাদ–৩/১০)

আমর বিল মারুফের(সৎকাজের আদেশ) আবেগ এত তীব্র ছিল যে, একবার মারওয়ান হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁদের সামনে দিয়ে একটি লাশ অতিক্রম করলো। এই লাশের সাথে আবূ সা'ঈদও ছিলেন। মারওয়ান লাশ দেখেও উঠলেন না। তখন আবূ সা'ঈদ তাঁকে বললেন ঃ আমীর, জানাযার জন্য ওঠো। কারণ, রাসূল (সা) উঠতেন। একথা শুনে মারওয়ান দাঁড়িয়ে যান। (মুসনাদ–৩/৪৭, ৯৭) ইবন সা'দের মতে এই জানাযাটি ছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা)। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪২৮)

হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর যখন মদীনার গভর্ণর তখন একবার 'ঈদুল ফিতরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, নামায এবং খুতবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) কর্মপন্থা কি ছিল? আবূ সা'ঈদ বললেন ঃ রাসূল (সা) খুতবার আগে নামায পড়াতেন। মুস'য়াব তাঁর কথামত কাজ করেন। (মুসনাদ–৩/৪)

একবার শাহর ইবন হাওশাব 'তূর' পাহাড় ভ্রমণের ইচ্ছা করেন। তিনি আবূ সা'ঈদের সাথে দেখা করতে আসেন। আবূ সা'ঈদ তাঁকে বলেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন পবিত্র ভূমির প্রতি সফর নিষেধ করা হয়েছে।

ইবন আবী সা'সার জঙ্গল খুব পছন্দ ছিল। আবূ সা'ঈদ তাঁকে বললেন ঃ তুমি সেখানে এমন জোরে আযান দেবে যেন গোটা জঙ্গলে তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। (মুসনাদ–৩/৯৫, ৪/৯৩)

তাঁর বোন কোন কিছু পানাহার ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে সাওম পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের সাওম পালনে নিষেধ করতেন। আবূ সা'ঈদও সব সময় তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন।

তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের অনুসারী। হযরত আবূ হুরাইরাহ এক মসজিদে নামায পড়াতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা কোন কারণে আসতে পারলেন না। তাঁর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ নামায পড়ালেন। তাঁর নামাযের পদ্ধতির সাথে লোকেরা কিছুটা দ্বিমত পোষণ করলো। তিনি মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামায আদায় করতে দেখেছি ঠিক সেইভাবে পড়িয়েছি। এখন তোমরা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে তাতে আমার কিছু যায় আসেনা।

তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। একবার তাঁর পায়ে ব্যথা হলো। তিনি পায়ের ওপর পা রেখে শুয়ে ছিলেন। তাঁর ভাই এসে হঠাৎ সেই পায়ে হাত দিয়ে একটি থাবা মারেন। তাতে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। তিনি অত্যন্ত নরমভাবে বললেন, আমাকে ব্যথা দিলে? তুমি তো জানতে আমার পায়ে ব্যথা। ভাই বললেন ঃ হাঁ, জানতাম। তবে এভাবে শুতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

সরলতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট। একবার একটি জানাযার নামাযের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। সবার শেষে একটু দেরীতে তিনি পৌঁছলেন। লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিল। তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য স্থান খালি করে দেয়। তিনি বললেন ঃ এ উচিত নয়। মানুষের উচিত ফাঁকা জায়গায় বসা। একথা বলে তিনি একটি ফাঁকা স্থানে বসে পড়েন।

আবূ সালামা নামে তার এক ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন তাবে'ঈ। তাঁর সাথে ছিল চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একবার আবূ সালামা তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আবূ সালামা বললেন, একটু বাগিচা পর্যন্ত চলুন। আপনার সাথে কিছু কথা আছে। তিনি আবূ সালামার সাথে চললেন।

তিনি ইয়াতীমদের প্রতিপালন করতেন। লায়স ও সুলায়মান ইবন 'আমর তাঁরই পালিত। তিনি হাতে একটি ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। হালকা-পাতলা ছড়ি তাঁর পছন্দ ছিল। খেজুরের ডাল সোজা করে তিনি ছড়ি বানাতেন। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসারী। (মুসনাদ-৩/৬৫)

আনাস বলেন ঃ আনসারদের ২০ জন যুবক সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায় নিয়োজিত থাকতো। যে কোন প্রয়োজনে রাসূল (সা) তাদের কাউকে পাঠাতেন। আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বলেন, চার অথবা পাঁচজন সাহাবী তো কক্ষণও রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দরযা থেকে উঠতো না। আবূ সা'ঈদ বলেন, আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে থাকতাম। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৭)

একবার এক ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে তাঁকে দা'ওয়াত করা হয়। তিনি উপস্থিত হয়ে দেখেন, নানা পদের খাবার প্রস্তুত। বাড়ীর লোকদের বললেন, তোমরা কি জাননা, রাসূল (সা) যে দিন দুপুরে খেতেন সে দিন রাতে উপোস যেতেন এবং সকালে নাস্তা করলে দুপুরে খেতেন না? (হায়াতুস সাহাবা-২/৩০৮)

সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস পিতা 'আমর ইবনুল 'আসের সাথে হযরত 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে রনাঙ্গণে যান। এ কারণে হযরত হাসান ইবন 'আলী বহুদিন যাবত তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ রাখেন। হযরত আবূ সা'ঈদ (রা) এ কথা জানতে পেরে 'আবদুল্লাহকে সংগে নিয়ে হাসানের নিকট যান এবং তাঁদের দু'জনের মনোমালিন্য দূর করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩৪)

মু'য়াজ ইবন জাবাল (রা)

নাম মু'য়াজ, ডাকনাম আবু আবদির রহমান এবং লকব বা উপাধি 'ইমামুল ফুকাহা, কানযুল 'উলামা ও রাব্বানিয়্যুল কুলূব।' মদীনার খাযরাজ গোত্রের উদায় ইবন সা'দ শাখার সন্তান। অনেকে তাঁকে সালামা ইবন সা'দ শাখার সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন বনু কুদা'য়া গোত্রের সন্তান, উদায় ইবন সা'দ গোত্রের নন। এ গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিজেদের গোত্রের লোক বলে দাবী করতো। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭, আল-ইসাবা-৪/৪২৭, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৪), উসুদুল গাবা-৪/৩৭৬) হিজরাতের ২০ বছর পূর্বে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনায়) জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-৮/১৬৬)

তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ সা'দ ইবন আলীর ছিল দুই ছেলে। তাদের নাম সালামা ও উদায়। সালামার বংশকে বলা হয় বনু সালামা। এই বংশে আবু কাতাদাহ, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, কা'ব ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম-এর মত বিখ্যাত সাহাবী জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়াও আরও বহু বিশিষ্ট বক্তির এই বংশের সাথে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সালামার ভাই উদায়-এর বংশে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের সময় শুধু এক মু'য়াজ-ই জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে তাঁর মৃত্যুর সাথে এই বংশধারা চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যায়।

ইমাম সাম'য়ানী 'কিতাবুল আনসাব' গ্রন্থে হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাহিরকে এই উদায়-এর বংশের লোক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এই খান্দানের দুই ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের একজন মু'য়াজ ইবন জাবাল এবং দ্বিতীয় জন তাঁরই ছেলে 'আবদুর রহমান। আর তাঁরা উভয়ে শামের 'আমওয়াসের মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। (উসুদুল গাবা- ৪/৩৭৬)

বনু উদায়-এর বাসস্থান তাদের চাচাতো গোষ্ঠী বনু সালামের পাশে মসজিদুল কিবলাতাইন-এর ধারে কাছেই ছিল। হযরত মু'য়াজের বাড়ীটিও ছিল এখানে।

হযরত মু'য়াজের পিতা জাবাল ইবন আমর এবং মাতা হিন্দা বিনতু সাহল আল-জুহাইনিয়্যা। বদরী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল জাদ্দ (রা) তাঁর বৈপিত্রীয় ভাই। (তাবাকাত-৩/৫৭১, ৫৮৩) মু'য়াজের ছেলের নাম ছিল আবদুর রহমান। এ জন্য তাঁকে আবু 'আবদির রহমান বলে ডাকা হতো। (তাবাকাত-৩/৫৮৩)

মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ঈ-ই-ইসলাম হযরত মুস'য়াব ইবন উমাইরের (রা) হাতে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মু'য়াজ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৬) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মুস'য়াব ইবন 'উমাইর মক্কায় চললেন। মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমান ও মুশরিকদের একটি দলও হজ্জের উদ্দেশ্যে তাঁর সংগী হলো। হযরত মুয়াজও ছিলেন এই কাফিলার একজন সদস্য। মক্কার আকাবায় তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) দীদার লাভ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন।

এটা ছিল আকাবার তৃতীয় বা শেষ বাইয়াত। এই দলটি মক্কা থেকে ফিরে আসার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

অল্প বয়স্ক মু'য়াজ যখন মক্কা থেকে ফিরলেন, ঈমানী আবেগে তাঁর অন্তর তখন ভরপুর। এখন কারও বাড়ী মূর্তি থাকাটা তাঁর নিকট অসহনীয়। মদীনায় ফিরে তিনি এবং তাঁর মত আরও কিছু যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক মদীনাকে প্রতীমামুক্ত করবেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হযরত 'আমর ইবনুল জামূহ প্রতীমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন মদীনার বনু সালামা গোত্রের অতি সম্মানিত সরদার। অন্য নেতাদের মত তাঁরও ছিল একটি অতি প্রিয় কাঠের প্রতীমা। প্রতীমাটির নাম ছিল মানাত। এই প্রতীমাটির প্রতি ছিল 'আমরের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি অতি যত্নসহকারে সুগন্ধি মাখিয়ে রেশমী কাপড় দিয়ে সেটি সব সময় ঢেকে রাখতেন।

মক্কা থেকে ফেরা এই তরুণরা রাতের অন্ধকারে একদিন চুপে চুপে মূর্তিটি তুলে নিয়ে বনু সালামা গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার গর্তে ফেলে দেয়। ইবন ইসহাক এই উৎসাহী তরুণদের তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ও সালামা ইবন গানামা। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯৯)

সকালে ঘুম থেকে উঠে 'আমর ইবন জামূহ যথাস্থানে প্রতীমাটি না পেয়ে খোঁজা-খুঁজি শুরু করলেন। এক সময় ময়লা-আবর্জনার স্তূপে প্রতীমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন ঃ তোমাদের সর্বনাশ হোক! গত রাতে আমাদের ইলাহ'র সাথে কারা এমন আচরণ করলো? তিনি প্রতীমাটি সেখান থেকে তুলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। প্রতীমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে মানাত, আমি যদি জানতাম, কারা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে!

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা ঘটলো। সকালে 'আমর খুঁজতে খুঁজতে অন্য একটি গর্ত থেকে প্রতীমাটি উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে আগের মত রেখে দেন। পরের রাতে একই ঘটনা ঘটলো। তিনিও আগের মত সেটি কুড়িয়ে এনে একই স্থানে রেখে দিলেন। তবে এ দিন তিনি প্রতীমাটির কাঁধে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কে বা কারা এমন আচরণ করছে, আমি জানিনে। তবে তুমি তাদের দেখেছো। হে মানাত, তোমার মধ্যে যদি কোন ক্ষমতা থাকে তুমি তাদের থেকে আত্মরক্ষা কর। এই থাকলো তোমার সাথে তরবারি।"

রাত হলো। তরুণরা আজও এলো। তারা প্রতীমার কাঁধ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে সেটি বাঁধলো। তারপর প্রতীমাসহ কুকুরটি একটি নোংরা গর্তে ফেলে চলে গেল। 'আমর সকালে খুঁজতে বেরিয়ে মূর্তিটির এমন দশা দেখে তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইনটি এমন ঃ

'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ হতে তাহলে এমনভাবে কুকুর ও তুমি এক সাথে গর্তে পড়ে থাকতে না।' (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৩-৫৪)

এভাবে 'আমর ইবন জামূহ মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। (দ্রঃ সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৭/১২২-১২৬, হায়াতুস সাহাবা-১/২৩০, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫২, ৪৫৩, ৬৯৯)

হযরত মু'য়াজের ইসলাম গ্রহণের অল্পকাল পরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায়

হিজরাত করেন। ইবন সা'দ বলেন ঃ রাসূলে কারীম (সা) মু'য়াজ ও আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা) জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে মু'য়াজের দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন ইসহাকের এ বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন ঃ এটা কেমন করে হতে পারে? দ্বীনী মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্কের বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর বদর যুদ্ধের পূর্বে। বদর যুদ্ধের পর মীরাসের আয়াত নাযিল হলে মুওয়াখাতের রীতি রহিত হয়ে যায়। আর জা'ফর ইবন আবী তালিব এর অনেক আগে মক্কা থেকে হাবশায় হিজরাত করেন। রাসূল (সা) যখন মদীনায় এ মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্বের রীতি চালু করেন জা'ফর তখন হাবশায় এবং এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর তিনি মদীনায় আসেন। সুতরাং জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে হযরত মু'য়াজের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের এমন ধারণা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি। (দ্রঃ তাবাকাত-৩/৫৮৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৯৮, আল-আলাম-৮/১৬৬, সীরাতু ইবন হিশাত-১/৫০৫)

ইবন সা'দ বলেন ঃ মু'য়াজ বিশ অথবা একুশ বছর বয়সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (তাবাকাত-৩/৫৮৪, আল-আলাম-৮/১৬৬)

হযরত মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করেন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে যে ছয় ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। (আল-আ'লাম-৮/১৬৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বনু সালামার মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হলে হযরত মু'য়াজ এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। একদিন তিনি 'ঈশার নামাযে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন। পিছনে মুকতাদীদের মধ্যে ছিলেন কর্মক্লান্ত এক ক্ষেত মজুর। হযরত মু'য়াজের নামায শেষ করার আগেই তিনি নামায ছেড়ে চলে যান। নামায শেষে মু'য়াজ বিষয়টি জানতে পেরে মন্তব্য করেন ঃ সে একজন মুনাফিক (কপট মুসলমান)। লোকটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মু'য়াজের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা) মু'য়াজকে ডেকে বললেন ঃ মুয়াজ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তারপর তিনি বলেন ঃ ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে। কারণ, তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও ব্যস্ত লোকও থাকে। তাদের সবার কথা তোমার স্মরণে থাকা উচিত। (বুখারী-১/৯৮)

হিজরী নবম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাবুক অভিযান শেষ করে সবে মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এমন সময় রমজান মাসে ইয়ামনের হিময়ার গোত্রের শাসকের দূত মদীনায় খবর নিয়ে আসে যে, ইয়ামনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে রাসূল (সা) সেখানকার আমীর হিসাবে মু'য়াজ ইবন জাবালকে মনোনীত করেন।

আমীর মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত মু'য়াজের সকল সহায় সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন ঃ চেহারা-সুরৎ, স্বভাব-চরিত্র ও দানশীলতার দিক দিয়ে মু'য়াজ ছিলেন সর্বোত্তম লোকদের অন্যতম। দরায হস্তের কারণে তিনি প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাওনাদাররা তাগাদা দিতে শুরু করলে কিছুদিন তিনি বাড়ীতে লুকিয়ে থাকেন। তারা তাদের পাওনা আদায় করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করলো। রাসূল (সা) মু'য়াজকে ডাকলেন। পাওনাদার হাজির হলো। তাঁরা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ,

মু'য়াজের নিকট থেকে আমাদের পাওনা আদায় করে দিন। রাসূল (সা) মু'য়াজের দুর্দশা দেখে পাওনাদারদের বললেন ঃ যে তার পাওনা মাফ করে দেবে আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথার পর কিছু পাওনাদার তাদের দাবী ছেড়ে দেয়। তবে অনেকে দাবী ছাড়তে নারাজি প্রকাশ করে। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ মু'য়াজ, তুমি ধৈর্য ধর। তারপর তিনি মু'য়াজের সকল সম্পদ পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তাতেও তার সব ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন তিনি পাওনাদারদের বললেন ঃ এর অতিরিক্ত তোমরা পাবেনা, এই গুলিই নিয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে হযরত মু'য়াজ রিক্ত হস্তে বনু সালামার দিকে ফিরে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি বললো ঃ আবু আবদির রহমান, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু সাহায্য চাইলে না কেন? আজ তো তুমি একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছ। মু'য়াজ বললেন ঃ চাওয়া আমার স্বভাব নয়। মু'য়াজের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) স্মরণ ছিল। একদিন পর তিনি মু'য়াজকে ডাকলেন এবং তাঁকে ইয়ামনে আমীর হিসাবে নিযুক্তির কথা জানিয়ে বললেন ঃ আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২১, তাবাকাত–৩/৫৮৪)

যদিও হযরত মু'য়াজের আমীর হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল, তবুও তাঁকে ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে একটি পরীক্ষা নেওয়া উচিত মনে করলেন। তিনি মু'য়াজকে ডেকে প্রশ্ন করলেন ঃ

– আচ্ছা, তুমি ফায়সালা করবে কিভাবে?

– কুরআনের দ্বারা।

– যদি এমন কোন বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে না পাও, তখন কি করবে?

– আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দ্বারা ফায়সালা করবো।

– যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখিন হও যার সমাধান কুরআন অথবা সুন্নাতে পাচ্ছ না, তখন কি করবে?

– আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।

হযরত মু'য়াজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর জবাবে রাসূল (সা) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের রাসূলকে (দূত) এমন জিনিসের তাওফীক বা ক্ষমতা দান করেছেন যা তাঁর রাসূলের পছন্দ। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবার পার্শ্বটীকা–৪/৪৫৮, তাবাকাত–২/১৪৭–১৪৮)

মু'য়াজের পরীক্ষা শেষ করে রাসূল (সা) ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। তাতে হযরত মু'য়াজের স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (আল–আ'লাম–৮/১৬৬) তিনি লেখেন ঃ 'ইন্নি বা'য়াসতু লাকুম খায়রা আহলী–'– আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম। তিনি আরও লিখলেন, তোমরা মু'য়াজ ও অন্য লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাদাকা ও জিযিয়ার অর্থ তার নিকট জমা করবে। আমি মু'য়াজ ইবন জাবালকে ইয়ামনে বসবাসরত সকলের ওপর আমীর নিয়োগ করছি। তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয় যে সে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মু'য়াজ গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে। সেখানে আরও লোক ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন। মু'য়াজ উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূল (সা) পায়ে হেঁটে চলছিলেন।

দুই জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ মু'য়াজ তোমার দায়িত্ব অনেক। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। এরপর তুমি মদীনায় ফিরে আমার স্থলে আমার কবর ও মসজিদ যিয়ারত করবে।' সাথে সাথে মু'য়াজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কেঁদো না। কান্না শয়তানী কাজ। যাও আল্লাহ তোমাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন।' একথা বলে রাসূল (সা) মু'য়াজকে ছেড়ে দেন। মু'য়াজ অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ মুত্তাকীরাই (খোদাভীরু) আমার নিকটতম মানুষ- তা তারা যে কেউ হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩৬)

হযরত মু'য়াজ ইয়ামনে মাত্র দুই বছর ছিলেন। হিজরী নবম সনে 'আমীরের দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামনে যান এবং হিজরী একাদশ সনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মু'য়াজ ইয়ামন যাওয়ার কিছুদিন পর রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হন। তিনি আমীরে হজ্জের দায়িত্ব দিয়ে 'উমারকে মক্কায় পাঠালেন। এদিকে হযরত মু'য়াজও হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে সরাসরি তাঁর লাটবহর সহ মক্কায় পৌঁছলেন। মিনায় দুইজনের সাক্ষাৎ, কুশল বিনিময় ও কোলাকুলি হলো। মু'য়াজের সাথে তাঁর অনেকগুলি দাস ও লাটবহর দেখে 'উমার জিজ্ঞেস করলেন ঃ

- আবু 'আবদির রহমান, এসব কি?
- এগুলি আমার। আমি অর্জন করেছি।
- কিভাবে অর্জন করলে?
- লোকেরা আমাকে হাদিয়া দিয়েছে।
- তুমি আবু বকরকে এসব কথা জানাবে এবং সবকিছুই তাঁর হাতে তুলে দেবে। যদি তিনি তোমাকে কিছু দান করেন, তুমি তা গ্রহণ করবে।
- আমি তোমার কথা মানবো না। মানুষ আমাকে দান করেছে, আর আমি তা আবু বকরের হাতে তুলে দেব?

হযরত 'উমার (রা) মদীনায় ফিরে খলীফাকে পরামর্শ দিলেন, মু'য়াজের জীবন ধারণের মত কিছু অর্থ তাঁকে দিয়ে অবশিষ্ট সবকিছু বাইতুল মালে জমা করা হোক। আবু বকর জবাব দিলেন ঃ তাঁকে 'আমীর নিয়োগ করেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। সে যদি নিজেই জমা দিতে ইচ্ছা করে এবং আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি গ্রহণ করবো। অন্যথায় এক কপর্দকও গ্রহণ করবো না। হযরত 'উমার খলীফার জবাব পেয়ে আবার মু'য়াজের কাছে যান এবং পুনরায় তাঁকে জমা দেওয়ার তাকিদ দেন। এবার মু'য়াজ বলেন ঃ আমাকে রাসূল (সা) ইয়ামনে শুধু এই জন্য পাঠান যে, আমি যেন সেখানে থেকে নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারি। আমি কিছুই দেব না। হযরত 'উমার নীরবে উঠে চলে আসলেন। তবে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

হযরত মু'য়াজ তো 'উমারকে ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য সাহায্যে তিনি 'উমারের সাথে একমত পোষণ করেন। মু'য়াজ রাতে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা 'উমারের নিকট গিয়ে বললেন ঃ আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর আপনি আমাকে টেনে ধরে রেখেছেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে মু'য়াজ পানিতে ডুবে যাচ্ছেন এবং 'উমার তাঁকে উদ্ধার করছেন। তারপর মু'য়াজ সকল দাস-দাসী সংগে করে খলীফা আবু বকরের

নিকট হাজির হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, আমার কাছে যা কিছু আছে সবই এনে হাজির করছি। আবুবকর (রা) বললেন ঃ আমি তোমার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, সবই তোমাকে হিবা বা দান করলাম। কারণ, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছিঃ 'আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পূরণ করে দেবেন।' অন্য একটি বর্ণনা মতে আবু বকর তাঁর নিকট থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করে তাঁর অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করেন এবং বাকী সম্পদ সবই তাঁকে দান করেন। হযরত 'উমার তখন মু'য়াজকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এখন সবই তোমার কাছে রাখ। এখন তুমি অনুমতি প্রাপ্ত।

হযরত মু'য়াজ দাসদের সংগে করে বাড়ী ফিরলেন। তাদের সাথে জামায়াতে নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কার জন্য নামায আদায় করলে? তারা বললো ঃ আল্লাহর জন্য। মু'য়াজ বললেন ঃ তাহলে তোমরা মুক্ত, তোমরা তাঁরই জন্য। (তাবাকাত-৩/৫৮৬-৫৮৮, হায়াতুস সাহাবা-১৫২-১৫৪,)

রাসূলুল্লাহ (সা) মু'য়াজকে ইয়ামনে পাঠালেন। একদিকে তিনি ইয়ামনের গভর্ণর, অন্যদিকে সেখানকার তাবলীগ ও দ্বীনী তা'লীমের দায়িত্বশীলও। বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও দ্বীনী দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি লোকদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলামী বিধি-বিধানের প্রশিক্ষণ দিতেন।

তিনি ইয়ামনে থাকাকালীন একবার হাওলান গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এলো। তার ছিল বারোটি ছেলে। তবে সবচেয়ে ছোট ছেলেটিও তখন শ্মশ্রু মন্ডিত। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় মহিলার বয়স কত হতে পারে। স্বামীকে একা বাড়ীতে রেখে বারোটি ছেলের সকলকে সংগে করে সে এসেছে। দুই ছেলে তার দুইটি বাহু ধরে চলতে সাহায্য করেছে। মহিলা মু'য়াজকে প্রশ্ন করলো ঃ

- আপনাকে কে পাঠিয়েছে?
- রাসূলুল্লাহ(সা)।
- আপনি তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্বাচিত প্রতিনিধি? আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।
- করুন।
- স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বা অধিকার কতটুকু?
- যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে তার আনুগত্য করবে।
- আল্লাহর কসম, আপনি একটু ঠিক ঠিক বলবেন।
- আপনি এতটুকুতে সন্তুষ্ট নন?
- ছেলেদের বাবা বৃদ্ধ হয়েছে, আমি তাঁর হক কিভাবে আদায় করবো?
- আপনি তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। যদি কুষ্ঠ রোগে তার দেহ পঁচে ফেটে যায়, রক্ত ও পুঁজ ঝরতে থাকে, আর আপনি তাতে মুখ লাগিয়ে চুষে নেন, তবুও তার হক পুরোপুরি আদায় হবে না। (মুসনাদ-৫/২৩৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৯০-৯১, সীয়ারে আনসার-২/১৬৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) গোটা ইয়ামনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন; সান'য়া, কিন্দাহ, হাদরামাউত, জানাদ, খুবাইদ। ইয়ামনের রাজধানী ছিল জানাদ, আর এখানেই থাকতেন হযরত মু'য়াজ। তিনিই জানাদের জামে' মসজিদটির নির্মাতা। (শাজারাতুজ জাহাব-১/৩০) অবশিষ্ট চারটি স্থানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ শাসক নিযুক্ত হন ঃ

সান'য়া– হযরত খালিদ ইবন সা'ঈদ, কিন্দাহ– হযরত মুহাজির ইবন আবী উমাইয়্যা, হাদরামাউত– হযরত যিয়াদ ইবন লাবীদ এবং খুবাইদ ও উপকূলীয় এলাকায়– হযরত আবু মূসা আল–আশয়ারী (রা)। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকায় সাদাকা, জিযিয়া ইত্যাদি আদায় করে হযরত মু'য়াজের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। রাজকোষের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন হযরত মু'য়াজ। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৩০)

হযরত মু'য়াজ বিভিন্ন সময়ে তাঁর অধীনস্থ শাসকদের এলাকাসমূহ ঘুরে ঘুরে তাঁদের বিচার ও সিদ্ধান্তসমূহ দেখাশুনা করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেও মুকাদ্দামার শুনানী করতেন। একবার হযরত আবু মূসার অঞ্চলে গিয়ে এভাবে একটি মুকাদ্দামার ফায়সালা করেন। এসব সফরে তিনি তাঁবুতে অবস্থান করতেন। আবু মূসার এখানেও তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। তিনি ও আবু মূসা দুই জনই পাশাপাশি তাঁবুতে অবস্থান করেন। (বুখারী–২/৬৩৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মু'য়াজকে ইয়ামনে পাঠান তখন তাঁকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দান করেন। তাতে গনীমাত, খুমুস, সাদাকাত, জিযিয়াসহ বিভিন্ন বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হযরত মু'য়াজ সব সময় তারই আলোকে কাজ করতেন।

একবার এক ব্যক্তি একপাল গরু নিয়ে এলো। গরুগুলি সংখ্যায় ছিল তিরিশটি। রাসূল (সা) তাঁকে তিরিশটি গরুতে একটি বাছুর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণে হযরত মু'য়াজ বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে না জেনে কিছুই গ্রহণ করবো না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (সা) আমাকে কিছুই বলেননি। এ দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়ালীগণ দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের মত অত্যাচারী ছিলেন না। রক্ষক ও রক্ষিতের মাঝে যে সম্পর্ক ইসলাম ঘোষণা করেছিল, তারা সব সময় তা স্মরণে রাখতেন। আর রক্ষকের ওপর শরীয়াত যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছে তারা তা কঠোর ভাবে অনুসরণ করতেন।

বিচার ও সিদ্ধান্তের সময়ও জনগণের অধিকার যাতে খর্ব না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের আদালত সমূহে সর্বদা সত্য ও সততার বিজয় ছিল। এক ইয়াহুদী মারা গেল। একমাত্র ভাই রেখে গেল উত্তরাধিকারী। সেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বিষয়টি হযরত মু'য়াজের 'আদালতে উত্থাপিত হলো। তিনি ভাইকে উত্তরাধিকার দান করেন। (মুসনাদ–৫/২৩০)

হযরত মু'য়াজ ছিলেন জীবনের প্রথম থেকে অতি বুদ্ধিমান। রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফায়েজে নববীর বরকতে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ মডেলের রূপ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে এত মুহাব্বত করতেন যে, অধিকাংশ সময় তাঁকে নিজের বাহনের পিছনে বসার সুযোগ দিয়ে নানা রকম ইলম ও মা'রেফাত শিক্ষা দিতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বাহনের পিছনে বসেছিলেন। রাসূল (সা) ডাকলেন ঃ মু'য়াজ। তিনি জবাব দিলেন ঃ লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ও সা'দাইকা– হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) আবার ডাকলেন ঃ মু'য়াজ। তিনিও অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সাথে জবাব দিলেন। এভাবে রাসূল (সা) তিনবার ডাকলেন, আর মু'য়াজও প্রতিবার সাড়া দিলেন। তারপর রাসূল (সা) বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা–ই–তাওহীদ পাঠ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।' মু'য়াজ আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানুষের কাছে এই সুসংবাদ কি পৌঁছে দেব? তিনি বললেন ঃ না। কারণ, মানুষ আমল ছেড়ে দেবে। (বুখারী–১/২৪)

হযরত মু'য়াজের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোন প্রশ্ন না করলে রাসূল (সা) বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

একবার মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খচ্চরের ওপর সাওয়ার ছিলেন। রাসূল (সা) চাবুক দিয়ে খচ্চরের পিঠে মৃদু আঘাত করে বলেন ঃ 'তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি?' মু'য়াজ বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকবে।' কিছুদূর যাওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলতে পার, আল্লাহর নিকট বান্দার হক বা অধিকার কি? মু'য়াজ বললেন ঃ এ ব্যাপারে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। বললেন ঃ 'তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

এভাবে হযরত মু'য়াজ সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূলাল্লাহর (সা) নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন। একবার তো দরযায় অপেক্ষমান দেখতে পেয়ে রাসূল (সা) তাঁকে একটি জিনিস শিখিয়ে দিলেন। আর একবার বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরযার কথা বলে দেব? বললেন ঃ হাঁ। ইরশাদ হল ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে। (মুসনাদ–৫/২৩৮)

একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। একদিন সকালে যখন সৈন্যরা লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসা। তিনি আবদার জানালেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি একটা কঠিন বিষয় জানতে চেয়েছ। তবে আল্লাহ যাকে তাওফীক বা সামর্থ দান করেন তার জন্য সহজ। শিরক করবে না, ইবাদাত করবে, নামায আদায় করবে, যাকাত দান করবে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং হজ্জ আদায় করবে।' তিনি আরও বলেন ঃ 'কল্যাণের কয়েকটি দ্বার আছে। আমি তোমাকে বলছি, শোন ঃ সাওম– যা ঢালের কাজ করে, সাদাকা– যা পাপের আগুনকে পানির মত নিবিয়ে দেয় এবং যে নামায রাতের বিভিন্ন অংশে আদায় করা হয়। এরপর তিনি নীচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযূক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।' (সূরা সাজদা–১৬)

তিনি আরও বলেন ঃ 'ইসলামের মাথা, খুঁটি ও চূড়ার কথা বলছি। মাথা ও খুঁটি হচ্ছে নামায এবং চূড়া হচ্ছে জিহাদ।' তারপর বললেন ঃ 'এইসব জিনিসের মূল হচ্ছে একটি মাত্র জিনিস। আর তা হলো 'জিহবা'। তিনি নিজের 'জিহবা' বের করে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলেন, একে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।' মু'য়াজ প্রশ্ন করলেন ঃ এই যে আমরা যা কিছু বলি, তার সব কিছুরই কি জবাবদিহি করতে হবে? বললেন ঃ 'মু'য়াজ! তোমার মার সর্বনাশ হোক! অনেকে শুধু এর জন্যই জাহান্নামে যাবে।' (মুসনাদ–৫/২৩১)

একবার তো রাসূল (সা) মু'য়াজকে দশটি বিষয়ের অসীয়াত করলেন। ১· শিরক করবে না। তার জন্য কেউ যদি তোমাকে হত্যা করে অথবা আগুনে পুড়িয়েও মারে, তবুও না। ২· মাতা–পিতাকে কষ্ট দেবে না। তারা যদি তোমাকে তোমার সন্তান–সন্ততি ও বিষয়–সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবুও। ৩· ফরজ নামায ইচ্ছাকৃতভাবে কক্ষণও তরক করবে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে আল্লাহ তার জিম্মাদারী থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন। ৪· মদ

পান করবে না। কারণ, এ কাজটি সকল অশ্লীলতার মূল। ৫· পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ বৈধ হয়ে যায়। ৬· জিহাদের ময়দান থেকে পালাবে না। যদি সকল সৈন্য রক্ত রঞ্জিত ও ধুলিমলিন হয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তবুও না। ৭· মহামারি আকারে কোন রোগ–ব্যাধি দেখা দিলে অটল থাকবে। ৮· নিজের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ৯· তাদেরকে সর্বদা আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। ১০· তাদেরকে খাওফে খোদা (আল্লাহর ভয়) শিক্ষা দেবে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার মু'য়াজকে পাঁচটি জিনিসের তাকিদ দিয়ে বলেছিলেন ঃ যে এই 'আমলগুলি করে আল্লাহ তার জামিন হয়ে যান। ১· অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, ২· জানাযার সাথে চলা, ৩. জিহাদে বের হওয়া, ৪. শাসককে ভীতি প্রদর্শন অথবা সম্মান দেখানোর জন্য যাওয়া, ৫. ঘরে চুপচাপ বসে থাকা– যেখানে সে নিরাপদ থাকে এবং মানুষও তার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

রাসূল (সা) তাঁকে নৈতিক শিক্ষা দেন এভাবে ঃ 'মু'য়াজ! একটি মন্দ কাজ করার পর একটি নেক কাজ কর। নেক কাজ মন্দ কাজটি বিলীন করে দেয়। আর মানুষের সামনে সর্বোত্তম নৈতিকতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

তিনি মু'য়াজকে এ কথাও শিক্ষা দেন ঃ মাজলুম বা অত্যাচারিতের বদ দু'আ থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সেই বদ দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। (বুখারী)

রাসূল (সা) যখন তাঁকে ইয়ামানের আমীর করে পাঠান তখন বলেছিলেন ঃ 'মু'য়াজ! ভোগ–বিলাসিতা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, আল্লাহর বান্দা কক্ষণও আরামপ্রিয় ও বিলাসী হতে পারে না।' (মুসনাদ–৫/২৪৩) রাসূল (সা) তাঁকে সামাজিক জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে ঃ 'মানুষের নেকড়ে হচ্ছে শয়তান। নেকড়ে যেমন দলছুট বকরীকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তানও এমন মানুষের ওপর প্রভুত্ব লাভ করে যে জামা'য়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সাবধান! সাবধান! কক্ষণও বিচ্ছিন্ন থাকবে না। সর্বদা জামা'য়াতের সাথে থাকবে। (মুসনাদ–৫/২৪৩)

ইসলামের তাবলীগ ও দা'ওয়াত সম্পর্কে রাসূল (সা) তাকে বলেন ঃ'মু'য়াজ! তুমি যদি কেবলমাত্র একজন মুশরিককেও মুসলমান বানাতে পার তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম কাজ।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

এমন পবিত্র চিন্তা ও মহোত্তম শিক্ষা লাভ করেছিলেন হযরত মু'য়াজ। একারণে মহান সাহাবী হযরত ইবন মাসউদ তাঁকে শুধু একজন ব্যক্তি নয় বরং একটি উম্মাতই মনে করতেন। তিনি বলেন ঃ 'মু'য়াজ ছিলেন সরল–সোজা একটি আল্লাহ অনুগত উম্মাত। তিনি কখনও মুশরিকদের কেউ ছিলেননা।' ফারওয়া আল–আশজা'ঈ তাঁকে বললেন ঃ 'এমন কথা তো আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ) সম্পর্কেই বলেছেন।' ইবন মাস'উদ আবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফারওয়া আল–আশজা'ঈ বলেন ঃ 'আমি ইবন মাস'উদকে তাঁর কথার ওপর অটল থাকতে দেখে চুপ থাকলাম। তারপর তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি জান 'উম্মাত' মানে কি, বা 'কানিত' কাকে বলে? বললাম ঃ আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'উম্মাত' হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মঙ্গলকে জানেন এবং যার ইকতিদা ও অনুসরণ করা যায়। আর 'কানিত' বলে আল্লাহর অনুগত ব্যক্তিকে। এই অর্থে মু'য়াজ ছিলো যথার্থই মঙ্গল বা কল্যাণের শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সা) অনুগত ব্যক্তি। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবা–৪/৩৬১, তাহজীবুল আসমা–২/১০০)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালেই মজলিসে শূরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপ লাভ করে। তবে প্রথম খলীফার যুগেই তার একটি কাঠামো তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে মু'য়াজও ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যখন মজলিসে শূরার নিয়মিত অধিবেশন বসতো তখনও মু'য়াজ সদস্য ছিলেন। (কানযুল 'উম্মাল-১৩৪)

হযরত 'উমারের খিলাফতকালে শামের ওয়ালী ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান খলীফাকে লিখলেন কিছু কুরআনের মু'য়াল্লিম পাঠানোর জন্য। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে যাঁরা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন এমন পাঁচ ব্যক্তিকে খলিফা ডাকলেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদা ইবনুস সামিত, আবু আইউব আল-আনসারী, উবাই ইবন কা'ব ও আবুদ দারদা। খলীফা তাঁদেরকে বললেন ঃ শামবাসী ভাইয়েরা এমন কিছু লোক পাঠানোর অনুরোধ করেছে যাঁরা তাদেরকে কুরআনের তা'লীম ও দ্বীনের তারবিয়াত দান করবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের পাঁচ জনের যে কোন তিনজন আমাকে সাহায্য করুন। আপনারা ইচ্ছা করলে লটারীর মাধ্যমেও তিন জনের নাম নির্বাচন করতে পারেন। অন্যথায় আমিই তিন জনকে বেছে নিব। তাঁরা বললেন ঃ লটারী কেন? আবু আইউব একজন বৃদ্ধ মানুষ, আর উবাইতো অসুস্থ। বাকী থাকলাম আমরা তিন জন। 'উমার (রা) তাদেরকে হিমস, দিমাশ্‌কও ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মু'য়াজ গেলেন ফিলিস্তিনে। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৭/১৩২-১৩৪)

বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা) যুগেই হযরত মু'য়াজ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য শামে চলে যান। হযরত 'উমার (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি সিরিয়ার এক ফ্রন্টে যুদ্ধরত। সেখান থেকে তিনি ও আবু 'উবাইদা সমতা ও ন্যায় বিচারের উপদেশ দান করে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/১৩১) খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে ইসলামী বিজয়ের প্রবল প্লাবন শামের ওপর দিয়েই বয়ে চলে। হযরত মু'য়াজও একজন সৈনিক হিসাবে রণক্ষেত্রে চরম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে হযরত মু'য়াজের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় বহুবিধ যোগ্যতা। তিনি হন একাধারে শরী'য়াতের মুফতী, মজলিসে শূরার সদস্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক, প্রদেশের ওয়ালী, দূত, সাহসী সেনাপতি, বিজয়ী যোদ্ধা ও যাকাত উসূলকারী ইত্যাদি।

দৌত্যগিরির দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর অর্পিত হলো তিনি অতি দক্ষতার সাথে তা পালন করলেন। শামের 'ফাহল' নামক স্থানে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছিল, এমন সময় প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনী সন্ধির প্রস্তাব দিল। সেনাপতি আবু 'উবাইদা আলোচনার জন্য মু'য়াজকে নির্বাচন করলেন। মু'য়াজ চললেন রোমান সেনা ছাউনীতে। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, দরবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে। একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে যার অভ্যন্তরে সোনালী কারুকাজ করা গালিচা বিছানো। হযরত মু'য়াজ ভিতরে না ঢুকে থমকে বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন খৃষ্টান সৈনিক এগিয়ে এসে বললো ঃ আমি ঘোড়াটি ধরছি, আপনি ভিতরে যান। মু'য়াজ বললেন ঃ আমি এমন শয্যায় বসিনা যা দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত করে তৈরী করা হয়েছে। একথা বলে তিনি মাটির ওপর বসে পড়লেন। খৃষ্টানরা দুঃখ প্রকাশ করে বললো ঃ আমরা আপনাকে সম্মান করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আপনি তা অবহেলা করলেন। হযরত মু'য়াজ হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমার এমন সম্মানের প্রয়োজন নেই। যদি মাটিতে বসা দাসদের অভ্যাস হয় তা হলে আমার চেয়ে আল্লাহর বড় দাস আর কে আছে? রোমানরা

হযরত মু'য়াজের এমন স্বাধীন ও বেপরোয়া আচরণে হতবাক হয়ে গেল। এমনকি তাদের একজন জিজ্ঞেস করেই বসলো, মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়েও বড় কেউ কি আছে? তিনি জবাব দিলেনঃ 'মায়াজ'আল্লাহ! (আল্লাহর পানাহ্ চাই) আমি হচ্ছি তাদের এক নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।' লোকটি চুপ হয়ে গেল।

হযরত মু'য়াজ কিছুক্ষণ পর দোভাষীকে বললেন; রোমানদের বল, তারা কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমরা বসবো, নইলে চলে যাব। আলোচনা শুরু হলো। রোমানরা বলল ঃ

– আমাদের দেশ আক্রমণ করা হয়েছে কেন? অথচ হাবশা আরবের অতি নিকটে, পারস্যের সম্রাট মারা গেছেন এবং সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব এক মহিলার হাতে। আপনারা ঐ সকল দেশ ছেড়ে আমাদের দিকে ধাবিত হলেন কেন? অন্যদিকে আমাদের সম্রাট দুনিয়ার সকল সম্রাটদের সম্রাট এবং সংখ্যায় আমরা আসমানের তারকারাজি ও দুনিয়ার বালুকারাশির সমান।

মু'য়াজ বললেন ঃ আমরা তোমাদেরকে যা বলতে চাই তার সারকথা হলো, তোমরা ইসলাম কবুল করে আমাদের কিবলার দিকে নামায আদায় কর, মদ পান ছেড়ে দাও, শুকরের মাংস পরিহার কর। তোমরা যদি এইসব কাজ কর তাহলে আমরা তোমাদের ভাই। আর যদি একান্তই ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও তাহলে জিযিয়া দাও। তাও যদি না মান তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। যদি আসমানের তারকারাজি ও যমীনের বালুকারাশির পরিমাণ তোমাদের সংখ্যা হয় তাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই।

আর হ্যাঁ, তোমাদের এ জন্য গর্ব যে, তোমাদের শাহানশাহ্ তোমাদের জান–মালের মালিক মুখতার। কিন্তু আমরা যাঁকে বাদশাহ বানিয়েছি কোন ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিতে পারেন না। তিনি ব্যভিচার করলে তাঁকে দুররা লাগানো হবে, চুরি করলে হাত কাটা হবে। তিনি গোপনে বসেন না, নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না। ধন–সম্পদেও আমাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

রোমানরা মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলো। তাঁর মুখে ইসলামী শিক্ষা ও সাম্যের কথা শুনে তারা হতবাক হয়ে গেল। তারা প্রস্তাব দিল ঃ 'আমরা আপনাদেরকে 'বালকা'–এর সম্পূর্ণ এলাকা এবং 'দূন'– এর যে অংশ আপনাদের অঞ্চলের সাথে মিশেছে, ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা আমাদের এই দেশ ছেড়ে পারস্যের দিকে চলে যান।'

এটা কোন কেনা–বেচার বিষয় ছিল না। তাই হযরত মু'য়াজ নেতিবাচক জবাব দিয়ে সেখান থেকে উঠে আসেন। (সীয়ারে আনসার–২/১৬৯ –১৭১) যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হলো। এ যুদ্ধে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। হযরত আবু 'উবাইদা তাঁকে 'মায়মানা' (দক্ষিণ ভাগ)–এর কমান্ডিং অফিসার নিয়োগ করেন।

হিজরী ১৫ সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও তাঁকে 'মায়মানা'–র দায়িত্ব দেওয়া হয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে মুসলমানদের 'মায়মানা' মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হযরত মু'য়াজ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততার পরিচয় দেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে হুংকার দিয়ে বলেন ঃ আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। কোন সাহসী বীর যদি ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে, সে এই ঘোড়া নিতে পারে। রণক্ষেত্রে তাঁর পুত্রও ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, আমিই এ ঘোড়ার হক আদায় করবো। তারপর বাপ–বেটা দু'জন রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যান এবং এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন যে, বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী আবার দৃঢ় অবস্থান ফিরে পায়।

হযরত ফারুকে আ'জমের খিলাফতকালে সিরিয়ায় যুদ্ধরত গোটা মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু 'উবাইদা। হিজরী ১৮ সনে সিরিয়ায় মহামারি আকারে প্লেগ বা 'তা'উন' দেখা দেয়। ইতিহাসে এই মহামারি 'আমওয়াসের 'তা'উন' নামে প্রসিদ্ধ। 'আমওয়াস হচ্ছে রামলা ও বাইতুল মাকদাসের মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম। সেনাপতি হযরত আবু 'উবাইদা সহ বহু মুসলিম সৈনিক এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হযরত আবু 'উবাইদা মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'য়াজকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত মু'য়াজ আবু 'উবাইদার জানাযার নামায পড়ান এবং অন্যদের সাথে কবরে নেমে তাঁকে কবরে শায়িত করেন। এ সময় তিনি সকলের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। আবু 'উবাইদার ইনতিকালের পর তিনি কিছু দিনের জন্য সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৮, আল-ইসতীয়াব; আল ইসাবা-৪/৩৫৭,৩৫৯)

মহামারি মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হযরত 'আমর ইবনুল আস বললেন ঃ আমাদের উচিত এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। এ রোগ নয়, এ যেন আগুন। তাঁর এ কথায় হযরত মু'য়াজ দারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে একটি ভাষণ দেন। ভাষণের মধ্যে তিনি 'আমরের নিন্দাও করেন। তারপর বলেন, এই মহামারি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বালা-মুসীবত নয়; বরং তাঁর রহমত ও নবীর দু'আ। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিলাম, মুসলমানরা শামে হিজরাত করবে। শাম ইসলামী পতাকাতলে আসবে। সেখানে একটি রোগ দেখা দেবে যা ফোঁড়ার মত হয়ে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করবে। কেউ তাতে মারা গেলে শহীদ হবে। তাঁর সকল 'আমল পাক হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, যদি আমি একথা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনে থাকি তাহলে এই রহমত আমার ঘরেও পাঠাও এবং আমাকেও তার যথেষ্ট অংশ দান কর।' (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৭, হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮১, ৫৮২)

ভাষণ শেষ করে তিনি পুত্র আবদুর রহমানের নিকট গেলেন। তখন তাঁর দু'আ কবুল হয়ে গেছে। দেখেন, পুত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পুত্র পিতাকে দেখে কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ 'আল-হাক্কু মির রাব্বিকা ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন-' এই মৃত্যু যা সত্য, আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সুতরাং কক্ষণও আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে হবেন না। যেমন পুত্র তেমনই পিতা। পিতা জবাব দিলেন ঃ 'সাতাজিদুনী ইনশা আল্লাহু মিনাস সাবিরীন'- ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবে। হযরত আবদুর রহমান মারা গেলেন। পুত্রের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দুই স্ত্রীও একই রোগে মারা যান। এখন হযরত মু'য়াজ একাকী। নির্দিষ্ট সময়ে তিনিও আল্লাহর এই রহমাতের অংশীদার হন। তাঁর ডান হাতের শাহাদাত আংগুলে একটি ফোঁড়া বের হয়। তিনি অত্যন্ত খুশী ছিলেন। বলছিলেন, দুনিয়ার সকল সম্পদ এর তুলনায় মূল্যহীন। প্রচন্ড ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। যখনই চেতনা ফিরে পাচ্ছিলেন, বলছিলেন, 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে আমার ব্যথায় ব্যথিত কর। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি তা তুমি ভালোই জান।'

হযরত মু'য়াজ যে রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খুব অস্থিরভাবে সেই রাতটি কাটান। বার বার শুধু জিজ্ঞেস করেন ঃ দেখতো সকাল হলো কিনা? লোকেরা জবাব দেন ঃ এখনও হয়নি। যখন বলা হলো, হ্যাঁ, সকাল হয়েছে, তিনি বললেন ঃ এমন রাত থেকে আল্লাহর পানাহ চাই যার প্রভাত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। স্বাগতম মৃত্যু, স্বাগতম! তুমি সেই বন্ধুর কাছে এসেছ যে একেবারে রিক্ত ও নিঃস্ব। ইয়া ইলাহী, আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তা তুমি জান। আজ তোমার কাছে আমার বড় আশা। আমি কখনও দুনিয়া এবং দীর্ঘ জীবন এই জন্য

কামনা করিনি যে তা বৃক্ষ রোপণ ও নদী খননে ব্যয় করবো; বরং যদি কামনা করে থাকি তবে তা এ জন্য যাতে প্রচন্ড গরমে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি, উদারতা ও দানশীলতার প্রসার ঘটাতে এবং জিকিরের মজলিসসমূহে আলেমদের সাথে বসতে পারি। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৬২, তাহজীব আল আসমা–১/৩০) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে ঃ আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, উঁচু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার না আছে মরণ ভয়, আর না আছে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ। তবে তার দুইটি মুষ্টি আছে আমার জানা নেই আমি তার কোন মুষ্টিতে থাকবো। এই ভয়েই আমি কাঁদছি। এই অবস্থায় তাঁর পবিত্র রূহ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮, সীয়ারে আনসার–২/১৭৪, ১৭৫)

হযরত মু'য়াজের মৃত্যুসন এবং মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাকদাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীসান' নামক স্থানে মারা যান। এরই নিকটবর্তী একটি স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত 'ঈসাকে (আ) আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। (আল–আ'লাম–৮/১৬৬, উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১)

হযরত মু'য়াজের গায়ের রং ছিল সাদা, চেহারা উজ্জ্বল, দৈহিক কাঠামো দীর্ঘাকৃতির, চোখ কালো ও বড়, চুল খুব ঘন এবং সামনের দাঁত ধবধবে সাদা। কথা বলার সময় যেন মুক্তো ঝরতো। কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মিষ্টি–মধুর। দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছিলেন সাহাবা সমাজের মধ্যমনি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) বলেন ঃ মু'য়াজ ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। আবু নু'ঈম বলেন ঃ বিচক্ষণতা, লজ্জাশীলতা, ও বদান্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আনসারদের সর্বোত্তম যুবক। ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ। (আল–ইসাবা–৪/৪২৭, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৯, উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭)

হযরত মু'য়াজ ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। আল–মাদায়িনী, ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। তবে বিশ্বস্ত বর্ণনা সমূহে জানা যায় তাঁর এক পুত্র, মতান্তরে দুই পুত্র ছিল। তাদের একজনের নাম আবদুর রহমান এবং অন্যজনের নাম জানা যায় না। এই আবদুর রহমান ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮ সনে 'আমওয়াসের' মহামারিতে পিতার আগে মারা যান। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবা–৪/৩৫৬)

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মু'য়াজ ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চারজনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন, মু'য়াজ তাঁদের অন্যতম। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে। এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি কুরআন হিফ্জ করেছিলেন। খাযরাজীরা বলতো ঃ আমাদের চার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে কুরআন সংগ্রহ করেছে যা অন্যরা করেনি। তাঁদের একজন মু'য়াজ। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৪, হায়াতুস সাহাবা–১/৩৯৫)

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ থেকে আমরণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য সব সময় মদীনা থেকে দূরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস

বর্ণনার ধারবাহিকতা তিনি চালু রাখেন। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায়ও এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। (মুসনাদ-৫/২৩৩)

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) ও আরও কিছু লোক তাঁর পাশে ছিলেন। অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আজ পর্যন্ত এই জন্য গোপন রেখেছিলাম যে তা শুনলে মানুষ হয়তো 'আমল ছেড়ে দিবে। তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। (মুসনাদ-৫/৩৩৬)

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মু'য়াজের নামটি তৃতীয় তবকায় গণনা করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৫৭ টি। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি, তিনটি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (আল-আ'লাম-৮/১৬৬, তাহজীবুল আসমা-২/৯৮)

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। উঁচু মর্যাদার সাহাবীদের বড় একটি দল তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ 'উমার, আবু কাতাদাহ আল-আনসারী, আবু মূসা আল-আশ'য়ারী, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, আনাস ইবন মালিক, আবু উমামা আল-বাহিলী, আবু লায়লা আল-আনসারী, আবু তুফাইল ও আরও অনেকে। (আল-ইসাবা-৪/৪২৭, তাহজীবুল আসমা-২/৯৮)

বিশিষ্ট তাবে'ঈ ছাত্রদের মধ্যে ইবন 'আদী, ইবন আবী-আউফা আল-আশয়ারী, আবদুর রহমান ইবন সুমরা লা'বাসী, জাবির ইবন আনাস, আবু সা'লাবা খুশানী, জাবির ইবন সুমরা, মালিক ইবন নীহামীর, আবদুর রহমান ইবন গানাম, আবু মুসলিম খাওলানী, আবদুল্লাহ ইবন সানাবিহী, আবু ওয়ায়িল মাসরূক, জুনাদাহ ইবন আবী উমাইয়্যা, আবু ইদরীস খাওলানী, আসলাম মাওলা 'উমার, আসওয়াদ ইবন হিলাল, আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ প্রমুখ সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৮, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৯)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন কালেই হযরত মু'য়াজ শ্রেষ্ঠ ফকীহদের মধ্যে পরিগণিত হন। খোদ রাসূলে কারীম (সা) তাঁর ফকীহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? তিনি বলেছেন ঃ 'আ'লামুহুম বিল হালালি ওয়াল হারামি মু'য়াজ ইবন জাবাল- তাদের মধ্যে মু'য়াজ ইবন জাবাল হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় 'আলিম।' (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৯) কা'ব ইবন মালিক বলেন ঃ রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) যুগে তিনি মদীনায় ফাতওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৫২) ইবনুল আসীর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মুহাজিরদের মধ্যে 'উমার, 'উসমান, আলী এবং আনসারদের মধ্যে মু'য়াজ, 'উবাই ইবন কা'ব ও যায়িদ ইবন সাবিত ফাতওয়া দিতেন। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৭, তাবাকাত-২/৩৫০)

হযরত 'উমার (রা) একবার মু'য়াজ সম্পর্কে বলেন ঃ 'লাওলা মু'য়াজ লাহালাকা 'উমার- মু'য়াজ না থাকলে 'উমার বিনাশ হতো।' এই মন্তব্য দ্বারা তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও গবেষণা শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সময় হযরত 'উমার তাঁর ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জাবিয়ায় প্রদত্ত খুতবায় বলেন ঃ কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মু'য়াজের কাছে যায়। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২০)

প্রশ্ন হতে পারে এই বিশাল জ্ঞান তিনি কিভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে বলা যায় তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া এমন

প্রতিভাবান ছাত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দানও এর কারণ। হযরত মু'য়াজ অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশেপাশে হাজির থাকতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) প্রত্যেকটি মজলিস ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক একটি বৈঠক। তিনি সব সময় এই মজলিসের সুযোগ গ্রহণ করতেন।

হযরত মু'য়াজ সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একাকী থাকতেন। রাসূল (সা) এই একাকীত্বের সুযোগে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। কখনও কোন মাসয়ালা জানার প্রয়োজন হলে তখনই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হতেন। তখন রাসূলকে (সা) না পেলে বহু দূর পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করতেন। একবার তিনি গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে। যেয়ে শুনলেন তিনি কোথাও বেরিয়ে গেছেন। তিনি মানুষের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা জিজ্ঞেস করতে করতে এগুতে লাগলেন। এক সময় দেখলেন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। মু'য়াজও রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ নামায আদায় করলেন। নামায শেষে মু'য়াজ বললেন ঃ আপনি আজ দীর্ঘ নামায আদায় করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এটা ছিল আশা ও ভীতির নামায। আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছিলাম। দুইটি দেওয়া হয়েছে এবং একটি দেওয়া হয়নি। তারপর তিনি সেই তিনটি প্রার্থনার কথা মু'য়াজকে বলেন। (মুসনাদ–৫/২৪০)

হযরত মু'য়াজ সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকতেন। সুযোগ পেলেই তিনি জানার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রশ্ন করতেন। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) মেযাজ ও মর্জির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাবূক যুদ্ধের পূর্বে লোকেরা সূর্যোদয়ের সময় বাহনের পিঠে ঘুমাচ্ছিল এবং উটগুলি এদিক সেদিক চরছিল। হযরত মু'য়াজ এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে এবং উটটিও চরছে। মু'য়াজের উটটি হোঁচট খেলো এবং তিনি লাগাম ধরে টান দিলেন। উটটি আরও ক্ষেপে গিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি পিছনের দিকে তাকিয়ে মু'য়াজকে দেখে ডাক দিলেন! মু'য়াজ! মু'য়াজ সাড়া দিলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ কাছে এস। মু'য়াজ এত নিকটে গেলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর উট একদম পাশাপাশি এসে গেল। তিনি বললেন, দেখ তো মানুষ কত দূরে? মু'য়াজ বললেন ঃ সবাই ঘুমিয়ে আছে আর পশুগুলি চরছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমিও ঘুমাচ্ছিলাম। মু'য়াজ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অনুমতি দিলে আমি আপনাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম যা আমাকে ভীষণ চিন্তিত ও পীড়িত করে তুলেছে। রাসূল (সা) বললেন, তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার।

হযরত মু'য়াজের স্বভাবেই ছিল জানার আগ্রহ। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একটি বিশেষ মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলো। রাসূল (সা) যে জবাব দিলেন তা একজন সাধারণ লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মু'য়াজ ততটুকু যথেষ্ট মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হুকুম কি বিশেষ এই ব্যক্তির জন্য, না সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য? রাসূল (সা) বললেন, না, এটা একটি সাধারণ হুকুম। (মুসনাদ–৫/২৪৪)

জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করে তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ ও মু'য়াল্লিমের আসনে সমাসীন হন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবনেই তিনি শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। হিজরী অষ্টম সনে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের ফিকাহ ও সুন্নাতের তা'লীম দানের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে সেখানে রেখে আসেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৬৫, সীরাতু ইবন হিশাম–২/৫০০, তাবাকাত–১/৯৯) তাছাড়া–হিজরী নবম সনে রাসূল (সা)

তাঁকে ইয়ামনে পাঠান। ইয়ামনের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে সেখানকার লোকদের শিক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেন।

মু'য়াজ যখন ফিলিস্তিনে তখন তাঁর শিক্ষাদানের গন্ডি ফিলিস্তিনের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। দিমাশ্‌ক, হিমস প্রভৃতি স্থানেও তাঁর হালকা-ই-দারস ছিল। এ সকল স্থানে তিনি ঘুরে ঘুরে দারস দিতেন। তাঁর দারসের পদ্ধতি ছিল, একটি বৈঠকে কিছু সাহাবী কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, আর হযরত মু'য়াজ চুপ করে বসে শুনতেন। আলোচকরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে তিনি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেন।

আবু ইদরীস আল-খাওলানী একবার জামে' দিমাশ্‌ক-এ গিয়ে দেখলেন, এক সুদর্শন যুবককে ঘিরে লোকেরা গোল হয়ে বসে আছে। কোন বিষয়ে তাদের মতভেদ হলে সেই যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আর তিনি সন্তোষজনক জবাব দিচ্ছেন। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, যুবকটি কে? বলা হলো- মু'য়াজ ইবন জাবাল।

আবু মুসলিম আল-খাওলানী একবার জামে' হিম্‌স-এ গিয়ে দেখলেন, বত্রিশ জন প্রবীণ সাহাবী গোল হয়ে বসে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বার্দ্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন যুবকও আছেন। কোন মাসয়ালায় তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে এই যুবক মিমাংসা করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারেন এই যুবক মু'য়াজ ইবন জাবাল। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২০, হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩১, ৬৩৮) শাহর ইবন হাওশাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাঁদের মধ্যে মু'য়াজ ইবন জাবাল উপস্থিত থাকলে সকলে তাঁর প্রতি সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলতেন, দুনিয়ায় 'আলিম মাত্র তিনজন। তাঁদের একজন শামে বসবাসরত। একথা দ্বারা তিনি মু'য়াজের দিকেই ইঙ্গিত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কি জান 'আলিম মতান্তরে 'আকিল কারা? লোকেরা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে বলতেন, 'আলিম হলেন মু'য়াজ ইবন জাবাল ও আবুদ দারদা।(তাবাকাত-২/৩৫০)

একজন মুজতাহিদের সবচেয়ে বড় গুণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। হযরত মু'য়াজ এমন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন যে খোদ রাসূল (সা) কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে যে পরীক্ষা গ্রহণ করেন সে সময় তিনি যে জবাব দেন তাতে রাসূল (সা) দারুণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মূলতঃ তাঁর এই জবাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক উৎস তিনটি ঃ ১. কিতাবুল্লাহ,২. সুন্নাহ ও ৩. কিয়াস।

ইসলামের প্রথম যুগে যারা একটু দেরীতে নামাযের জামা'য়াতে হাজির হতো এবং দুই এক রাকা'য়াত ছুটে যেত,তারা নামাযে দাঁড়ানো লোকদের কাছে ইশারায় জিজ্ঞেস করে জেনে নিত কত রাকা'য়াত হয়েছে। নামাযীরাও ইশারায় তা জানিয়ে দিত। দেরীতে আসা লোকটি প্রথমে তার ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে জামা'য়াতে শরীক হতো। এভাবে একদিন নামায হচ্ছে এবং প্রথম বৈঠক চলছে, এমন সময় মু'য়াজ আসলেন এবং প্রচলিত নিয়মের খিলাফ প্রথমে জামা'য়াতে শরীক হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) সালাম ফিরানোর পর মু'য়াজ উঠে ছুটে যাওয়া রাকা'য়াতগুলি আদায় করলেন। তাঁর এ কাজ দেখে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কাদ সান্না লাকুম ফা হাকাজা ফাসনা'য়'- মু'য়াজ তোমাদের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি বের করেছে, তোমরাও এমনটি করবে। (মুসনাদ-৫/২৩৩, ২৪৬) হযরত মু'য়াজের জন্য এটা অতি সম্মান ও

গৌরবের বিষয় যে, তাঁরই একটা 'আমল গোটা মুসলিম জাতির জন্য ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারী থাকবে।

একবার এক গর্ভবতী মহিলার স্বামী দুই বছর নিরুদ্দেশ থাকে। এর মধ্যে মহিলা গর্ভবতী হয়, মানুষের মনে সন্দেহ হলে তারা বিষয়টি খলীফা 'উমারের নিকট উত্থাপন করে। 'উমার (রা) মহিলাকে রজম করার (যিনার শাস্তি) নির্দেশ দেন। মু'য়াজ বললেন ঃ মহিলাকে রজম করার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু পেটের সন্তানের রজম করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? 'উমার মহিলাকে তখনকার মত ছেড়ে দিয়ে সন্তান প্রসবের পর রজমের নির্দেশ দেন।

মহিলা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সন্তানটি ছিল অবিকল তাঁর পিতার 'আদলের। তখন পিতা সন্তান দেখে শপথ করে দাবী করে এ তো আমারই সন্তান। এ কথা শুনে 'উমার (রা) মন্তব্য করেন ঃ 'মু'য়াজের মত সন্তান মহিলারা আর জন্ম দিতে পারবে না। মু'য়াজ না থাকলে 'উমার ধ্বংস হয়ে যেত।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'মু'য়াজের মত সন্তান জন্ম দিতে মহিলারা অক্ষম হয়ে গেছে।' সাহাবী সমাজের মধ্যে তাঁর বিশাল মর্যাদা সম্পর্কে এমনই একটা ধারণা বিদ্যমান ছিল।

খলীফা 'উমারের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে লোকেরা তাঁর নিকট পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের জন্য 'আরজ করলো। তখন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তার মধ্যে এ কথাটিও বলেন যে, 'আজ মু'য়াজ ইবন জাবাল বেঁচে থাকলে তাঁকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানিয়ে এসেছি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন মু'য়াজ সব 'আলিমদের থেকে এক অথবা দুই তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৮, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৯)

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানকে একবার অসীয়াত করেন ঃ 'মু'য়াজ ইবন জাবালের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমি তাঁর সকল অভিযান প্রত্যক্ষ করেছি। রাসূল (সা) একদিন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'য়াজ 'আলিমদের থেকে এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে। সে এবং আবু 'উবাইদার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তাতে তোমার মঙ্গল হবে না। (হায়াতুস সাহাবা-২/১১৮) অপর একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ কিয়ামতের দিন সকল 'আলিম মু'য়াজের পতাকাতলে উঠবে। (শাজারাত-১/৩০)

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) মু'য়াজকে পাঠালেন বনু কিলাব গোত্রে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টনের জন্য। মু'য়াজ সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। যাওয়ার সময় হাতে করে যে জিনিসগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন ফেরার সময় শুধু সেইগুলিই হাতে করে ফিরলেন। স্ত্রী কাছে এসে বললেন ঃ অন্যান্য শাসকরা ঘরে ফেরার সময় তাঁদের পরিবারের লোকদের জন্য নানা রকম উপঢৌকন নিয়ে আসে, দেখি তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? মু'য়াজ বললেন ঃ আমার সাথে সবসময় একজন পাহারাদার ছিল। সে সতর্কভাবে আমাকে পাহারা দিয়েছে। স্ত্রী বললেন ঃ তুমি ছিলে রাসূলুল্লাহর (সা) ও আবু বকরের পরম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আর 'উমার কিনা তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছে?

স্বামী-স্ত্রীর এ আলোচনা 'উমারের (রা) মেয়ে মহলের মাধ্যমে তাঁর কানে গেল। তিনি মু'য়াজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছি? মু'য়াজ

বললেন ঃ না, আপনি তা করবেন কেন? তবে আমার স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার জন্য এমন কথা না বলে উপায় ছিলনা। 'উমার একটু হেসে দিলেন। তারপর মু'য়াজের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, যাও, এইগুলি দিয়ে তোমার স্ত্রীকে খুশী কর। (সুওয়ারুম মিন্ হায়াতিস সাহাবা-৭/১৩১-১৩২)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। একারণে তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তি একবার নিলামে উঠে বিক্রী হয়েছিল। তাঁর এই দানশীলতায় ইসলামের যথেষ্টকল্যাণ সাধিত হয়েছে।

খলীফা 'উমার (রা) একদিন সংগীদের বললেন ঃ আচ্ছা বলতো তোমরা কে কি নেক আশা কর। একজন বললো, আমার বাসনা হলো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি দিরহাম পেতাম এবং সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারতাম। আরেকজন বললো ঃ আমি যদি এই ঘর ভর্তি সোনাদানা পেতাম এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। এভাবে একেক জন একেক রকম সৎ বাসনা প্রকাশ করলো। সবশেষে 'উমার (রা) বললেন ঃ আমার বাসনা কি জান? আমি যদি এই ঘর ভর্তি পরিমাণ আবু 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মু'য়াজ ইবন জাবাল ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত লোক পেতাম এবং তাদের সকলকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাতে পারতাম। তারপর তিনি বলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

তিনি চাকরকে ডেকে চারশত দীনার ভর্তি একটি থলি তার হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি আবু 'উবাইদাকে দিয়ে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতে বলে এস। আবু 'উবাইদা থলিটি হাতে নিয়ে খলীফার চাকর স্থান ত্যাগের পূর্বেই দীনারগুলি বিভিন্ন থলিতে ভরলেন এবং অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অনুরূপভাবে খলীফা আর একটি দীনার ভর্তি থলি পাঠালেন মু'য়াজ ইবন জাবালের কাছে। মু'য়াজও তক্ষুণি দাসীকে ডেকে দীনারগুলি বিভিন্ন লোকের মধ্যে বন্টন শুরু করলেন। থলিতে যখন মাত্র দুইটি দীনার বাকী তখন তাঁর স্ত্রী খবর পেলেন এবং দৌড়ে এসে বললেন, আমিও তো একজন মিসকীন, আমাকেও কিছু দাওনা। মু'য়াজ দীনার দুইটি সহ থলিটি স্ত্রীর দিকে ছুড়ে মেরে বলেন ঃ এই নাও। খলীফা চাকরের মুখে আবু 'উবাইদা ও মু'য়াজের এই আচরণের কথা শুনে দারুণ পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন ঃ তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের ভাই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৩১-২৩৩)

আল্লাহর প্রতি গভীর মুহাব্বত ও ভালোবাসা, তাঁর ইতা'য়াত ও আনুগত্য, 'ইবাদাত ও বন্দেগী এবং তাঁর ওপর তাওয়াককুল ও নির্ভরতা হচ্ছে একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট ও পরিচয়। হযরত মু'য়াজের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণরূপ লাভ করে। গভীর রাতে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! এখন সকল চক্ষু নিদ্রিত। কিন্তু তুমি চিরজাগ্রত, চিরঞ্জীব। হে আল্লাহ! জান্নাতের দিকে আমার যাত্রা বড় মন্থর এবং জাহান্নাম থেকে পলায়ন বড় দুর্বল। তুমি আমার জন্য তোমার কাছে একটি হিদায়াত নির্দিষ্ট রাখ যা কিয়ামতের দিন আমি লাভ করতে পারি।' (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৭) তিনি যে কত বড় আল্লাহনির্ভর লোক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আমওয়াসের মহামারির সময়। হযরত 'আমার ইবনুল 'আস যখন সৈন্যদের স্থান ত্যাগের পরামর্শ দেন তখন তাঁর পরামর্শকে তাওক্কুলের পরিপন্থী মনে করে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। শেষ পর্যন্ত তাওয়াক্কুলের ওপর অটল থেকেই সেই মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন।

একদিন হযরত 'উমার (রা) দেখলেন, মু'য়াজ কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন! তুমি কাঁদছো কেন? মু'য়াজ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ বিন্দুমাত্র 'রিয়া'ও এক ধরনের শিরক। আর আত্মগোপনকারী-মুত্তাকীরাই হচ্ছে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা।

তাঁরা অদৃশ্য হলে হারায় না এবং দৃশ্যমান হলে চেনা যায়না। তাঁরাই হলেন হিদায়াতের ইমাম ও ইলমের মশাল বা প্রদীপ। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৪)

তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার মু'য়াজ ইবন জাবাল আমাদের অঞ্চলে আসেন। আমাদের নেতারা বললো ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমরা পাথর ও ইট দিয়ে আপনার জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে দিতাম। মু'য়াজ বললেন ঃ কিয়ামতের দিন এই মসজিদ আমার পিঠে বহন করতে বলা হয় কিনা সে ব্যাপারে আমি শঙ্কিত। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২১)

ইসলামী সাম্য ও ন্যায় বিচারে তিনি ছিলেন এক বাস্তব নমুনা। ছোট খাট ব্যাপারেও তিনি ইনসাফ থেকে বিচ্যুৎ হতেন না। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। মু'য়াজের দুই স্ত্রী ছিল। তিনি তাদের মধ্যে সমতা বিধানের প্রতি ছিলেন দারুণ সতর্ক। যেদিন তিনি এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন অন্যের ঘরে অজু করা বা এক গ্লাস পানিও পান করতেন না। দুই স্ত্রীই 'আমওয়াসের মহামারিতে এক সাথে মারা যান। দুইজনকে একই কবরে দাফন করা হয়। কবর খোড়া হলে কাকে আগে কবরে রাখা হবে সে ব্যাপারেও লটারী করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬১২)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মু'য়াজের যে কত গভীর ভালোবাসা ছিল তার কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনায় পরিসফুট হয়েছে। কখনও তাঁকে না পেলে তিনি অস্থির হয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়ম ছিল সফরে রাত্রি যাপনের সময় মুহাজির সঙ্গীদের নিজের কাছেই রাখা। একবার তিনি কোন এক সফরে গেলেন। সাহাবীরাও সংগে ছিলেন। এক স্থানে রাত্রি যাপনের জন্য থামলেন। রাসূল (সা) মু'য়াজ সহ কতিপয় সাহাবীর একটি বৈঠক থেকে কিছু না বলে কোথাও চলে গেলেন। মু'য়াজ অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আবু মূসাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পথে রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর শুনে এগিয়ে গেলেন। রাসূল (সা) তাঁদের দেখে প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা? তাঁরা বললেন ঃ আপনাকে না পেয়ে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। (মুসনাদ–৫/২৩২)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা। একবার তিনি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলকে (সা) বললেন ঃ আমরা ইয়ামানে একজন অন্যজনকে সিজদাহ করতে দেখেছি। আমরা কি আপনাকে সিজদাহ করতে পারিনে? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি যদি কোন মানুষের জন্য সিজদাহর বিধানই রাখতাম তাহলে মহিলাদেরকে বলতাম তাদের নিজ নিজ স্বামীদেরকে সিজদাহ করতে। (মুসনাদ–৫/২২৭)

একবার মুনাফিক কায়েস ইবন মুতাতিয়্যা একটি মজলিসে উপস্থিত হলো। সেই মজলিসে হযরত সালমান আল–ফারেসী, সুহাইব আর রূমী ও বিলাল আল–হাবশী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করে কায়েস বললো, এই আউস ও খাযরাজ না হয় এই ব্যক্তিকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য করলো; কিন্তু এই সব লোক সাহায্য করছে কেন? একথা বলার সাথে সাথে মু'য়াজ ইবন জাবাল লাফ দিয়ে উঠে তার বুকের ও গলার কাপড় মুট করে ধরে টানতে টানতে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি লোকদের মসজিদে সমবেত হওয়ার আহবান জানাতে বললেন। জনগণ মসজিদে সমবেত হলে তিনি ঐক্য ও সংহতির ওপর এক ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ হলে মু'য়াজ বলেন, কিন্তু এই মুনাফিকের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ তাঁকে জাহান্নামের জন্য ছেড়ে দাও। মু'য়াজ ছেড়ে দিলেন। পরবর্তীকালে এই কায়েস মুরতাদ হয়ে

ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং এ অবস্থায় মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪৭৬, ৪৭৭)

একবার হযরত মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন ঃ মু'য়াজ, তোমার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা। উত্তরে মু'য়াজ বললেন ঃ আমার মা–বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমিও অন্তর দিয়ে আপনাকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি কক্ষণও তা অবহেলা করবে না। তারপর তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন। হযরত মু'য়াজ আমরণ সেই দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদ–৫/২৪৫)

হিজরী ১৬ সনে খলীফা হযরত 'উমার যখন বাইতুল মাকদাস সফর করেন তখন সেখানে হযরত বিলাল ও মু'য়াজও ছিলেন। 'উমার আযান দেওয়ার জন্য বিলালকে অনুরোধ করলেন। বিলাল বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কারও অনুরোধে কক্ষণও আযান দেবনা। কিন্তু আজ আপনার অনুরোধ রক্ষা করবো। তিনি আযান দিতে শুরু করলেন। আযানের ধ্বনিতে সাহাবীদের মনে রাসূলে পাকের (সা) জীবনকালের স্মৃতি ভেসে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। হযরত মু'য়াজ তো কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন।

হয়রত মু'য়াবিয়া (রা) যখন শামের গভর্ণর তখন মু'য়াজ একবার সেখানে গিয়ে দেখলেন, লোকেরা 'বিতর' নামায আদায় করে না। তিনি মুয়াবিয়ার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। বিষয়টি তাঁরও জানা ছিল না। তাই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ বিতর কি ওয়াজিব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এভাবে আমর বিল মা'রূপের ব্যাপারে তিনি কারও পরোয়া করতেন না। (মুসনাদ–৫/২৪২)

তিনি ছিলেন সত্যবাদী। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একবার হযরত মু'য়াজ হযরত আনাসের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মু'য়াজকে একথা বলেছেন? জবাবে রাসূল (সা) তিনবার বললেন ঃ মু'য়াজ সত্য বলেছে! (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭)

তাঁর মরণ–সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে লোকেরা এই বলে বিলাপ শুরু করে দিল যে, ইল্‌ম উঠে যাচ্ছে। তারা মু'য়াজকে বললো, আপনি আমাদের বলে যান, আপনার মৃত্যুর পর আমরা কার নিকট যাব। তিনি বললেন ঃ আমাকে একটু উঠিয়ে বসাও। বসানো হলে বললেন ঃ শোন, ইলম ও ঈমান– এ দুইটি উঠার জিনিস নয়। যারা তালাশ করবে তারা লাভ করবে। কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা আবুদ দারদা, সালমান আল–ফারেসী, ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালাম– এই চার জনের নিকট থেকে ইলম হাসিল করবে। (মুসনাদ–৫/২৪৩)

সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখা যায় পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিলের ঘটনার সাথে হযরত মু'য়াজও প্রতক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। একবার হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালসহ আউস ও খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহুদীদের কয়েকজন আহবারের নিকট তাওরাতের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করেন। কিন্তু তারা সত্যকে গোপন করার উদ্দেশ্যে তা জানাতে অস্বীকার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ১৫৯ নং আয়াতটি নাযিল করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫৫১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তা সত্ত্বেও তারা রাসূলুল্লাহর (সা) কথা মানতে অস্বীকার করতে থাকে। তাদের এ অবস্থা দেখে হযরত মু'য়াজ সহ কতিপয় সাহাবী ইহুদীদেরকে বললেন ঃ ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম ! তোমরা অবশ্যই জান যে তিনি আল্লাহর রাসূল। আর একথা তো তোমরা তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই আমাদেরকে বলতে এবং তাঁর পরিচয়ও আমাদের কাছে তুলে ধরতে। একথার উত্তরে রাফে ইবন হুরায়মালা ও ওয়াহাব ইবন ইহুজা বললো ঃ না, আমরা কক্ষণও তোমাদেরকে এমন কথা বলিনি। মূসার কিতাবের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ নাযিল করেননি এবং আর কোন সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীও আল্লাহ পাঠাননি। তখন আল্লাহ পাক সূরা আল-মায়িদার ১৯ নং আয়াতটি নাযিল করে ইহুদীদের কথার প্রতিবাদ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৬৪)

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল সম্পর্কে এ ধরনের বহু খন্ড খন্ড তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা মুসলিম সমাজ চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

হানজালা ইবন আবী 'আমির (রা)

নাম হানজালা, লকব বা উপাধি 'গাসীলুল মালায়িকা' ও তাকী। মদীনার আউস গোত্রের 'আমর ইবন' আউফ শাখার সন্তান। পিতার নাম আবু 'আমির 'আমর, মতান্তরে 'আবদু 'আমর, মাতার নাম জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি খাযরাজ নেতা মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাইয়ের বোন ছিলেন। হানজালার জন্ম ও কৈশোর সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হানজালার পিতা আবূ 'আমির ছিলেন আউস গোত্রের একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সেই জাহিলী আরবে দ্বীনে হানীফের একজন বিশ্বাসী হিসেবে তিনি নবুওয়াত, রিসালাত, কিয়ামাত ইত্যাদি বিশ্বাস করতেন। এই ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে 'রুহবানিয়্যাত' (বৈরাগ্য)–এর দিকে নিয়ে যায় এবং সব রকম পার্থিব নেতৃত্ব ছেড়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জন করেন। জীবনের এক পর্যায়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। একারণে তিনি 'রাহিব' (বৈরাগী) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। (আল–ইসাবা–১/৩৬১)

এদিকে রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন এবং মককা থেকে মদীনায় হিজরাত করে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে আবূ 'আমির ও 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই উভয়ের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাই মুনাফিকী (দ্বিমুখী) নীতি অবলম্বন করে মদীনাতেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু আবূ 'আমির ততখানি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। তিনি মদীনা ছেড়ে মককায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণে আসেন। একারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে 'ফাসিক' নামে অভিহিত করেন।

যুদ্ধ শেষে তিনি মককায় ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। হিজরী অষ্টম সনে মুসলমানদের দ্বারা মককা বিজিত হলে আল্লাহর যমীন তাঁর জন্য আবার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি মককা ছেড়ে রোমান সম্রাট হিরাকলের দরবারে পৌছেন এবং সেখানেই হিজরী দশম সনে মারা যান।

এই তো ছিল আবূ 'আমিরের কুফরী বা অবিশ্বাসের চরম অবস্থা। অপর দিকে তাঁর ছেলে হযরত হানজালার ঈমানী মজবুতীর চরম অবস্থাও লক্ষ্যণীয়। তিনি ইসলাম কবুল করে আবেদন জানান ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নির্দেশ দিলে আমি আমার পিতা আবূ 'আমিরকে হত্যা করতাম। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেননি। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাইর ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার ব্যাপারেও অনুরূপ আবেদন জানিয়েছিলেন এবং রাসূল (সা) তাঁকেও একইভাবে নিবৃত্ত করেছিলেন।

হযরত হানজালা বদর যুদ্ধে যোগ দেন নি। এর কারণ জানা যায় না। তবে উহুদ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তাঁর ইসলামী জীবনের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

তিনি স্ত্রী উপগত হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় ঘোষকের কণ্ঠ কানে গেল ঃ 'এক্ষুনি জিহাদে বের হতে হবে।' জিহাদের ডাক শুনে 'তাহারাতের' (পবিত্রতা) গোসলের

কথা ভুলে গেলেন। সেই অশুচি অবস্থায় কোষমুক্ত তরবারি হাতে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ান ইবন হারবের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাকে কাবু করে তরবারির আঘাত করবেন, ঠিক সেই সময় নিকট থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ আল-লায়সী দেখে ফেলে এবং দ্রুত হানজালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির এক আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। অনেকে বলেছেন, আবূ সুফইয়ান ও শাদ্দাদ দু'জনে একযোগে তাঁকে হত্যা করেন। তবে 'রাওদুল আনূফ' গ্রন্থকার নাফে' ইবন আবী নু'ঈম- মাওলা জা'উনা ইবন শা'উবকে হানজালার ঘাতক বলে উল্লেখ করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৭৫,১২৩)

বদর যুদ্ধে আবূ সুফইয়ানের পুত্র 'হানজালা' মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাই উহুদে এই হানজালাকে হত্যার পর সে মন্তব্য করে ঃ 'হানজালার পরিবর্তে হানজালা।'

হযরত হানজালা (রা) নাপাক অবস্থায় শহীদ হন। শাহাদাতের পর ফিরিশতারা তাঁকে গোসল দেয়। তাই দেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের বললেন, তোমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর তো ব্যাপার কি? হিশাম ইবন 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) হানজালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হানজালার ব্যাপারটি কি? স্ত্রী বললেন ঃ হানজালা নাপাক ছিল। আমি তাঁর মাথার একাংশ মাত্র ধুইয়েছি, এমন সময় জিহাদের ডাক তাঁর কানে গেল। গোসল অসম্পূর্ণ রেখেই সেই অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ এই জন্য আমি ফিরিশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখেছি। (আল-ইসতীয়াবঃ আল-ইসাবার টীকা-১/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪৪) আর এখান থেকেই 'গাসীলুল মালায়িকা' (ফিরিশতাকুল কর্তৃক গোসলকৃত) লকব বা উপাধিতে ভূষিত হন।

হযরত হানজালা মৃত্যুর সময় 'আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে রেখে যান। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পর এই 'আবদুল্লাহর জন্ম হয় এবং রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র সাত/আট বছর। পরিণত বয়সে তিনি পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী বলে নিজেকে প্রমাণ করেন। উমাইয়্যা শাসক ইয়াযিদ ইবন মু'য়াবিয়ার কলঙ্কজনক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে তাঁর প্রতি কৃত 'বাই'য়াত' (আনুগত্যের অঙ্গীকার) প্রত্যাখ্যান করে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে। হযরত 'আবদুল্লাহ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মদীনাবাসীদের সাথে নিয়ে নিজেই সেনাপতি হিসেবে আক্রমণকারীদের বাধা দেন। অসংখ্য মদীনাবাসী শাহাদাত বরণ করেন। একের পর এক হযরত 'আবদুল্লাহর আট পুত্র ইয়াযীদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য হযরত 'আবদুল্লাহ স্বচক্ষে অবলোকন করেন। অবশেষে তিনি নিজেই অগ্রসর হন। উহুদে শাহাদাতপ্রাপ্ত পিতার রক্তরঞ্জিত পোশাক পরে তিনি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন। এ ছিল হিজরী ৬৩ সনের জিলহজ্জ মাসের ঘটনা।

হযরত হানজালার পিতা 'ফাসিক' ছিলেন। আর এই 'ফাসিক' পিতার সন্তান হানজালা 'তাকী' (আল্লাহ ভীরু) উপাধি লাভ করেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইবন 'আসাকির বর্ণনা করেছেন, খলীফা 'উমার যখন লোকদের ভাতার ব্যবস্থা করেন তখন হানজালার ছেলে 'আবদুল্লাহর জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ

করেন। হযরত তালহা তাঁর ভাইয়ের ছেলের হাত ধরে খলীফার নিকট নিয়ে গেলেন। খলীফা তাঁর জন্য কিছু কম অংক নির্ধারণ করলেন। তালহা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই আনসারীকে আমার ভাতীজার চেয়ে বেশি দিলেন? খলীফা বললেন ঃ হাঁ। কারণ, তাঁর পিতা হানজালাকে আমি উহুদে অসির নীচে এমনভাবে হারিয়ে যেতে দেখেছি যেমন একটি উট হারিয়ে যায়। (হায়াতুস সাহাবা-২/২১৮)

একবার আনসারদের দুই গোত্র- আউস ও খাযরাজ নিজেদের গৌরব ও সম্মানের কথা বর্ণনা করছিল। তারা নিজ নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম উচ্চারণ করল। আউস গোত্র সর্বপ্রথম উচ্চারণ করল হানজালা ইবন আবী আমিরের পুন্যময় নামটি। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আউস গোত্রের লোকেরা গর্ব করে বলল ঃ আমাদের আছে হানজালা- যাঁকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছেন; আসিম ইবন সাবিত- আল্লাহ যাঁর দেহ মৌমাছি ও ভীমরুলের দ্বারা মুশরিকদের হাত থেকে হিফাজত করেছিলেন; খুযায়মা ইবন সাবিত- যাঁর একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান; আর আছে সা'দ ইবন 'উবাদা- যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর 'আরশ কেঁপে উঠেছিল।

(দ্রঃ আল-ইসাবা-১/৩৬১, আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা- ১/২৮০-২৮২, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৭৫,১২৩) ■

উবাই ইবন কা'ব আল–আনসারী (রা)

নাম উবাই, ডাকনাম আবুল মুনজির ও আবুত তুফাইল। (আল–আ'লাম–১/৭৮; আল–ইসাবা–১/১৯) সায়্যিদুল কুররা, সায়্যিদুল আনসার প্রভৃতি তাঁর লকব বা উপাধি। মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতার নাম কা'ব ইবন কাইস, মাতার নাম সুহাইলা। তিনি বনী 'আদী ইবন নাজ্জারের কন্যা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ তালহা আল–আনসারীর ফুফু। সুতরাং উবাই, আবূ তালহার ফুফাতো ভাই। উবাইর আবুল মুনজির কুনিয়াতটি খোদ রাসূল (সা) দান করেন এবং দ্বিতীয় কুনিয়াতটি হযরত 'উমার (রা) তাঁর ছেলে তুফাইলের নাম অনুসারে আবুত তুফাইল রাখেন। তাঁর জন্মের সঠিক সন–তারিখ জানা যায় না।

হযরত উবাইয়ের প্রথম জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে হযরত আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায় এতটুকু জানা যায় যে, ইসলাম–পূর্ব জীবনে তিনি মদ পানে আসক্ত ছিলেন। হযরত আবু তালহার মদ পানের আড্ডার তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাঁকে মদীনার অন্যতম ইয়াহুদী ধর্মগুরু বলে গণ্য করা হতো। প্রাচীন আসমানী কিতাব সমূহেও তাঁর জ্ঞান ছিল। সে যুগে লেখা–পড়ার তেমন প্রচলন ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি লিখতে পড়তে জানতেন। এ কারণে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন এবং কুরআনের অন্যতম লেখকে পরিণত হন। (আল–আ'লাম–১/৭৮)

মদীনায় ইয়াহুদীদের যথেষ্ট ধর্মীয় প্রভাব ছিল। ইসলাম–পূর্ব জীবনে তিনি তাওরাতসহ অন্যান্য যে সকল ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছিলেন, মূলতঃ সেই জ্ঞানই তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনে। যে সকল মদীনাবাসী মক্কায় গিয়ে সর্বশেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন তিনিও তাঁদের একজন। আর এখান থেকেই তাঁর ইসলামী জীবনের সূচনা। (আল–ইসাবা–১/১৯)

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত সা'ঈদ ইবন যায়িদের সাথে উবাইয়ের মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৫০৫) বালাজুরীর মতে, তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৭১) রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর হযরত আবু আইউব আল–আনসারীর বাড়ীতে অতিথি হন। তবে একটি বর্ণনা মতে, তাঁর বাহন উটনীটি উবাই ইবন কা'বের বাড়ীতে থাকে। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৭)

হযরত উবাই বদর থেকে নিয়ে তায়িফ অভিযান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যোগদান করেন। (আল–ইসাবা–১/১৯; আল–আ'লাম–১/৭৮) কুরাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে প্রতিশোধ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব গোপনে বনী গিফার গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে একটি পত্র রাসূলুল্লাহর(সা)

নিকট পাঠান। সেই পত্রে তিনি কুরাইশদের সকল গতিবিধি রাসূলকে (সা) অবহিত করেন। লোকটি মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় পত্রখানি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হস্তান্তর করেন। রাসূল (সা) পত্রখানা সেখানে উবাই ইবন কা'বের দ্বারা পাঠ করিয়ে শোনেন এবং পত্রের বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৪) এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। হযরত রাসূল (সা) তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক পাঠান। চিকিৎসক তাঁর রগ কেটে সেই স্থানে সেঁক দেয়।

উহুদ যুদ্ধের শেষে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত-নিহতদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ একজন সা'দ ইবন রাবী'র খোঁজ নাও তো। একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় শহীদদের লাশের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে এই আনসারী সাহাবী হলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা-২/৯৫)

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে মককার কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ান, আবূ উসামা আল-জাশামীর মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল (সা) উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭০) তেমনিভাবে হিজরী ২য় সনের রজব মাসে রাসূল (সা) 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী নাখলা অভিমুখে পাঠান। যাত্রাকালে তিনি 'আবদুল্লাহর হাতে একটি সীলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন ঃ 'দুই রাত একাধারে চলার পর চিঠিটি খুলে পাঠ করবে এবং এর নির্দেশ মত কাজ করবে।' রাসূল (সা) এই চিঠিটি উবাইয়ের দ্বারা লেখান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭১)

হিজরী ৯ম সনে যাকাত ফরজ হলে রাসূল (সা) আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। তিনি উবাইকে বালী, 'আজরা এবং বনী সা'দ গোত্রে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠান। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদারী ও সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। একবার এক জনবসতিতে গেলেন যাকাত আদায় করতে। নিয়ম অনুযায়ী এক ব্যক্তি তার সকল গবাদিপশু উবাইয়ের সামনে হাজির করে, যাতে তিনি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। উবাই উটের পাল থেকে দুই বছরের একটি বাচ্চা গ্রহণ করেন। যাকাত দানকারী বললেন ঃ এতটুকু বাচ্চা নিয়ে কি হবে? এতো দুধও দেয় না, আরোহণেরও উপযোগী নয়। আপনি যদি নিতে চান এই মোটা তাজা উটনীটি নিন। উবাই বললেন ঃ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের বিপরীত আমি কিছুই করতে পারি না। মদীনা তো এখান থেকে খুব বেশী দূর না, তুমি আমার সাথে চলো, বিষয়টি আমরা রাসূলকে (সা) জানাই। তিনি যা বলবেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো। লোকটি রাজী হলো। সে তার উটনী নিয়ে উবাইয়ের সাথে মদীনায় উপস্থিত হলো। তাদের কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে উটনী দাও, গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন। লোকটি সন্তুষ্টচিত্তে উটনীটি দান করে বাড়ী ফিরে গেল। (মুসনাদ-৫/১৪২, কানযুল 'উম্মাল-৩/৩০৯, হায়াতুস সাহাবা-১/১৫১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবুবকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়। সাহাবা-ই-কিরামের যে দলটির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, উবাই ছিলেন তাঁদের নেতা।

তিনি কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন, আর অন্যরা লিখতেন। এই দলটির সকলেই ছিলেন উঁচু স্তরের 'আলিম। এই কারণে মাঝে মধ্যে কোন কোন আয়াত সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ক হতো। যখন সূরা আত–তাওবার ১২৭ নং আয়াতটি লেখা হয় তখন দলের অন্য সদস্যরা বললেন, এই আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। হযরত উবাই বললেন ঃ না। রাসূল (সা) এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে শিখিয়েছিলেন। সূরা আল্–তাওবার ১২৮ নং আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। (মুসনাদ–৫/১৩৪)

হযরত আবুবকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে অসংখ্য জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজের প্রবর্তন করেন। মজলিসে শূরা তার মধ্যে একটি। বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত হয়। খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে উবাই এই মজলিসের সদস্য ছিলেন। (কানযুল উম্মাল–৩/১৩)

হযরত 'উমারের খিলাফতকালের গোটা সময়টা তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে কাটান। বেশীর ভাগ সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। যখন মজলিসে শূরার অধিবেশন বসতো বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো খলীফা 'উমার (রা) তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের পুরো সময়টা তিনি 'ইফতার' পদে আসীন ছিলেন। এছাড়া অন্য কোন পদ তিনি লাভ করেননি। একবার 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে কোন এক স্থানের ওয়ালী (শাসক) নিযুক্ত করেন না কেন? 'উমার (রা) বললেন ঃ আমি আপনার দ্বীনকে দুনিয়ার দ্বারা কলুষিত হতে দেখতে চাই না। (কানযুল 'উম্মাল–৩/১২৩) হযরত 'উমার (রা) যখন তারাবীহর নামায জামা'য়াতের সাথে আদায়ের প্রচলন করেন তখন উবাইকে ইমাম মনোনীত করেন। (বুখারী ঃ কিতাবু সালাতিত তারাবীহ) 'উমার যেমন তাঁকে সম্মান করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁর কাছে ফাতওয়া চাইতেন।

খলীফা 'উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরে উবাই তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। খলীফার ঐতিহাসিক জাবিয়া ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন। বাইতুল মাকদাসের অধিবাসীদের সাথে হযরত 'উমার (রা) যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন তার লেখক ছিলেন হযরত উবাই। (আল–আ'লাম–১/৭৮; সিফাতুস সাফওয়া–১/১৮৮)

'উমারের পর হযরত 'উসমানের (রা) সময় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও উচ্চারণে বিভিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা 'উসমান (রা) শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি এই বিভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ কারীদের ডেকে পৃথকভাবে তাঁদের তিলাওয়াত শুনলেন। 'উবাই ইবন কা'ব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং মু'য়াজ ইবন জাবাল– প্রত্যেকেরই উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সকল মুসলমানকে একই উচ্চারণের কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।

সেই সময় কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে ১২ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনে দক্ষ ছিলেন। খলীফা 'উসমান এই ১২ জনের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। আর এই পরিষদের সভাপতির

দায়িত্ব দান করেন উবাই ইবন কা'বকে। তিনি শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন, যায়িদ ইবন সাবিত লিখতেন। আজ পৃথিবীতে যে কুরআন বিদ্যমান তা মূলতঃ হযরত উবাইয়ের পাঠের অনুলিপি। (কানযুল উম্মাল-১/২৮২, ২৮৩)

হযরত উবাইয়ের মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৩৯ সনের এক জুম'আর দিনে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত 'উসমান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনায় দাফন করা হয়। হাইসাম ইবন 'আদী ও অন্যদের মতে তিনি হিজরী ১৯ সনে মদীনায় মারা যান। আর ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ প্রমুখের মতে তাঁর মৃত্যু হয় হিজরী ২২ সনে। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭; শাজারাতুজ জাহাব-১/৩১) তবে বিভিন্ন বর্ণনা মাধ্যমে খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর শরীক হওয়ার কথা জানা যায়। অতএব হিজরী ৩৯ সনে তাঁর মৃত্যুর মতটি সঠিক বলে মনে হয়।

হযরত সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে যে সকল সন্তানদের নাম জানা যায় তারা হলেন ঃ ১. তুফাইল, ২. মুহাম্মাদ, ৩. রাবী', ৪. উম্মু 'উমার। প্রথমোক্ত দুইজন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীর ডাকনাম উম্মু তুফাইল। তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও দেখা যায়।

হযরত উবাইয়ের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির হালকা-পাতলা ধরনের। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর বর্ণের। বার্দ্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু খিযাব লাগাতেন না। (আল-ইসাবা-১/১৯; আল-আ'লাম-১/৭৮; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭) স্বভাব ছিল একটু সৌখিন প্রকৃতির। বাড়ীতে গদীর ওপর বসতেন। ঘরের দেওয়ালে আয়না লাগিয়েছিলেন এবং সেইদিকে মুখ করে নিয়মিত চিরুনী করতেন। একটু রুক্ষ প্রকৃতির ছিলেন। সাধারণতঃ স্বভাববিরোধী কোন কথা শুনলেই রেগে যেতেন। হযরত 'উমারের স্বভাবও ছিল একই রকম। এই কারণে মাঝে মাঝে তাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যেত। বিভিন্ন বর্ণনায় এমন বহু ঝগড়ার কথা জানা যায়।

একবার হযরত উবাই একব্যক্তিকে একটি আয়াত শেখালেন। হযরত 'উমার (রা) লোকটির মুখে আয়াতটির পাঠ শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ পাঠ কার কাছে শিখেছ? লোকটি উবাইয়ের নাম বললো। হযরত 'উমার লোকটিকে সংগে করে উবাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং আয়াতটি সম্পর্কে জানতে চান। 'উবাই বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে এভাবেই শিখেছি। হযরত 'উমার আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শিখেছেন? উবাই বললেন ঃ হাঁ। হযরত 'উমার (রা) প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন। এবার উবাই ক্ষেপে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতটি জিবরীলের (আ) মাধ্যমে মুহাম্মাদের (সা) অন্তকরণে নাযিল করেন। এই ব্যাপারে খাত্তাব ও তাঁর ছেলের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ কথা শুনে হযরত 'উমার (রা) কানে হাত দিয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যান। (কানযুল 'উম্মাল-১/২৮৭)

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত! উবাই ইবন কা'বের একটি আয়াতের তিলাওয়াতের সাথে

'উমার ইবন খাত্তাব দ্বিমত পোষণ করলেন। উবাই তাঁকে বললেন ঃ আপনি যখন বাকী'র বাজারে কেনা-বেচা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আমি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে আয়াতটি শুনেছি। 'উমার বললেন ঃ সত্যি কথা বলেছেন। কে সত্য বলে আমি শুধু তাই পরীক্ষা করতে চেয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ উবাই সূরা আল-মায়িদার ১০৭ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলে 'উমার বললেন ঃ মিথ্যা বলছেন। উবাই বললেন ঃ আপনি অধিকতর মিথ্যাবাদী। এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদী বললেন? উবাই বললেন ঃ আমি আমীরুল মুমিনীনকে তোমার থেকে বেশী সম্মান করি; কিন্তু তাঁকে আমি কিতাবুল্লাহর তাসদীক বা প্রত্যায়নের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী বলেছি। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে আমি তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করিনি। (কানযুল 'উম্মাল-১/২৮৫; হায়াতুস সাহাবা-১/৭৪)

হযরত আবূ দারদা (রা) একবার শামের অধিবাসীদের বিরাট একটি দলকে কুরআন শিখানোর জন্য মদীনায় নিয়ে আসেন। তারা হযরত উবাইয়ের নিকট কুরআন শিখেন। একদিন তাদেরই একজন হযরত 'উমারের সামনে কুরআন পাঠ করেন। 'উমার তার ভুল ধরেন। লোকটি বলে, আমাকে তো উবাই এভাবে শিখিয়েছেন। 'উমার তার সংগে একজন লোক দিয়ে বলেন ঃ যাও, উবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। তারা উবাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তিনি উটকে খাবার দিচ্ছেন। তারা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজে? তারা ঘটনাটি খুলে বললো। তিনি তাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা কি ক্ষ্যান্ত দিবে না? রাগের চোটে সেই উটের খাবার হাতে নিয়েই 'উমারের কাছে ছুটে যান। উমার তাঁর ও যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট থেকে আয়াতটি শোনেন। দুইজনের পাঠে কিছু তারতম্য ছিল। হযরত 'উমার যায়িদের পাঠ সমর্থন করেন। এতে উবাই ক্ষেপে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! 'উমার! আপনার ভালো জানা আছে, আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অন্দরে থাকতাম আর আপনারা তখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আজ আমার সাথে এমন আচরণ করছেন। আল্লাহর কসম! আপনি যদি বলেন, আমি ঘরেই বসে থাকবো। আমরণ কারও সাথে কথা বলবো না, কাউকে কুরআনও শিখাবো না। 'উমার বললেন ঃ না, এমন করবেন না। আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দান করেছেন, আপনি অতি আগ্রহের সাথে তা শিখাতে থাকুন। (কানযুল 'উম্মাল-১/২৮৫)

স্বভাবগতভাবেই হযরত উবাই ছিলেন একটু স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) মদীনার একটি গলি দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, পিছন থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, 'উমার। কাছে এসে ইবন 'আব্বাসকে বললেন ঃ তুমি আমার দাসকে সংগে নিয়ে উবাই ইবন কা'বের নিকট যাবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কি অমুক আয়াতটি এভাবে পড়েছেন? ইবন আববাস উবাইয়ের গৃহে পৌছুলেন এবং পরপরই 'উমারও সেখানে হাজির হলেন। অনুমতি নিয়ে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলেন। উবাই তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করে মাথার চুল ঠিক করছিলেন। 'উমারকে গদীর ওপর বসানো হলো। উবাইয়ের পিঠ ছিল 'উমারের দিকে এবং সেই অবস্থায়ই বসে থাকলেন, পিছনে তাকালেন না। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, স্বাগত! আমার সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে না অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছেন? 'উমার বললেন ঃ একটি কাজে এসেছি। অতঃপর

একটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন– এর উচ্চারণ তো খুব কঠিন। উবাই বললেন ঃ আমি কুরআন তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি, যিনি জিবরীলের নিকট থেকে শিখেছিলেন। এ তো খুব সহজ ও কোমল। 'উমার বললেন ঃ আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে একবার একটি বাগিচা নিয়ে খলীফা ও উবাইয়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো। উবাই কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলেন, আপনার খিলাফতকালে এমন কর্ম? 'উমার বললেন ঃ আমি তো এমনটি চাইনি। মুসলমানদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, আপনি বিচার চাইতে পারেন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। উবাই বিচারক মানলেন যায়িদ ইবন সাবিতকে (রা)। 'উমার রাজী হলেন। হযরত যায়িদের এজলাসে মুকাদ্দামার শুনানীর দিন ধার্য হলো। নির্ধারিত দিনে খলীফাতুল মুসলিমীন এজলাসে হাজির হলেন। তিনি উবাইয়ের দাবী অস্বীকার করলেন এবং উবাইকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনি ভুলে গেছেন, একটু চিন্তা করে মনে করার চেষ্টা করুন। উবাই বললেন ঃ এখন আমার কিছুই স্মরণে আসছেনা। তখন হযরত 'উমার ঘটনাটির পূর্ণ চিত্র উবাইয়ের সামনে তুলে ধরেন। বিচারক যায়িদ উবাইকে বললেন, আপনার কোন প্রমাণ আছে কি? তিনি বললেন, না। যায়িদ বললেন ঃ তাহলে আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম দিতে বাধ্য করবেন না। তখন হযরত 'উমার বললেন ঃ আমার ওপর কসম অপরিহার্য হলে কসম দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। (কানযুল 'উম্মাল– ৩/১৮১–১৮৪; হায়াতুস সাহাবা–১/৯৪)

একবার একব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললো, অমুক তার পিতার স্ত্রীর (সৎমা) সাথে সহবাস করে। উবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন ঃ আমি এমন ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিতাম। একথা শুনে রাসূল (সা) একটু মৃদু হেসে বললেন ঃ উবাই কতই না আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তবে আমি তাঁর চেয়েও বেশী আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশী আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। (হায়াতুস সাহাবা–১/৬৩৮)

হযরত উবাই ইবন কা'বের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞান চর্চার জন্য নিবেদিত ছিল। মদীনার আনসার–মুহাজিরগণ যখন ব্যবসা–বাণিজ্য ও কৃষিকাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকতো, হযরত উবাই তখন মসজিদে নববীতে কুরআন–হাদীসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন–পাঠনে সময় অতিবাহিত করতেন। আনসারদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন 'আলিম' কেউ ছিলেন না। আর কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফ্জ ও কিরআতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। খোদ রাসূলে কারীম (সা) মাঝে মাঝে তাঁর নিকট থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনতেন।

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া প্রাচীন আসমানী কিতাবের জ্ঞানেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাওরাত ও ইন্জীলের আলিম ছিলেন। অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূল (সা) সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ ছিল সে বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর এই পান্ডিত্যের কারণে হযরত ফারুকে আজম তাঁকে খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। এমন কি তিনি নিজেই বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান জানার জন্য সময়–অসময়ে তাঁর গৃহে যেতেন।

ইসলামের ইতিহাসে গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ মনীষার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আববাস (রা) 'হিবরুল উম্মাত' নামে খ্যাত। তিনিও হযরত উবাইয়ের হালকা–ই–দারসে উপস্থিত হওয়াকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। তাঁর এই ফজীলাত ও মর্যাদা ছিল নবীর

(সা) নিকট থেকে অর্জিত জ্ঞানের কারণেই। তিনি নবীর (সা) নিকট থেকে এত বেশী পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, অন্য কারও নিকট জ্ঞানের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একমাত্র আবুবকর (রা) ছাড়া তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

হযরত উবাই (রা) বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে কুরআন, তাফসীর, শানে নুযুল, নাসিখ–মানসুখ, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ছিলেন ইমাম ও মুজতাহিদ। একজন মুজতাহিদ বা গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করতেন। একদিন রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? বললেন ঃ আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা) দারুণ খুশী হলেন এবং বললেন ঃ উবাই, এই ইল্‌ম তোমাকে খুশী করুক।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি কুরআনের আয়াত নিয়ে কতখানি চিন্তা–ভাবনা করতেন। একবার এক ব্যক্তি উবাইকে বললো, আমাকে কিছু নসীহত বা উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন ঃ কুরআনকে পথের দিশারী মানবে, তার বিধি–নিষেধ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ওপর রাজী থাকবে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তোমাদের জন্য এই জিনিসটিই রেখে গেছেন। তাতে আছে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা এবং যা কিছু তোমাদের পরে হবে, সব কিছুই। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৭; হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৮)

উল্লেখিত মতামত দ্বারা উবাই মূলতঃ এই কথাগুলিই প্রকাশ করেছেন ঃ

১. কুরআন ইসলামের পূর্ণ জীবন বিধান।
২. কুরআন মুসলমানদের সর্বোত্তম জীবন বিধান।
৩. কুরআনের সকল কাহিনী ও বর্ণনা শিক্ষা ও উপদেশমূলক।
৪. এতে সকল জাতি–গোষ্ঠীর মোটামুটি আলোচনা এসেছে।

কোন ব্যক্তি যদি এইভাবে কুরআনকে দেখে তাহলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি যে কত বিস্তৃত, গভীর ও সূক্ষ্ম হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই হযরত উবাই কুরআনের সাথে অস্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলেন। রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর অহী লেখার সর্বপ্রথম গৌরব তিনিই অর্জন করেন। (আল–ইসাবা–১/১৭) তখন থেকেই তাঁর মধ্যে কুরআন হিফ্‌জ করার প্রবণতা দেখা দেয়। যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হতো তিনি হিফ্‌জ করে ফেলতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন হিফ্‌জ শেষ করেন। আনসারদের যে পাঁচ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ কুরআন হিফ্‌জ করেন তাদের মধ্যে উবাইয়ের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৯৫) মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা গর্ব করে বলতো ঃ আমাদের গোত্রের চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেনি। তাদের অন্যতম হলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা–১/৩৯৫)

হযরত উবাই পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনে হিফ্‌জ করেন। রাসূলও (সা) অত্যাধিক আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভীতির কারণে অনেক বিশিষ্ট সাহাবী অনেক সময় তাঁর কাছে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন; কিন্তু উবাই নিঃসংকোচে যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতেন। তাঁর এই আগ্রহের কারণে রাসূলও (সা) মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার আগেই তাঁকে

অনেক কথা বলে দিতেন। একবার তাঁকে বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন একটি সূরার কথা বলছি, তাওরাত ও ইনজীলে যার সমকক্ষ কোন কিছু নেই। এমন কি কুরআনেও এর মত দ্বিতীয়টি নেই। এতটুকু বলে তিনি অন্য কথায় চলে গেলেন। উবাই বলেন, আমার ধারণা ছিল তিনি বলে দিবেন; কিন্তু তা না বলে বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। আমিও পিছনে পিছনে চললাম। এক সময় তিনি আমার হাত মুট করে ধরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন আমি সেই সূরাটির নাম বলার জন্য 'আরজ করলাম। তিনি সূরাটির নাম আমাকে বলে দিলেন। (মুসনাদ-৫/১১৪)

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফজরের নামায পড়ালেন এবং একটি আয়াত ভুলে বাদ পড়ে গেল। হযরত উবাই মাঝখানে নামাযে শরীক হন। নামায শেষে রাসুল (সা) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি আমার কিরআতের প্রতি মনোযোগী ছিলে? লোকেরা কেউ কোন জবাব দিল না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, উবাই ইবন কা'ব আছ কি? হযরত উবাই ততোক্ষণে বাকী নামায শেষ করেছেন। তিনি বলে উঠলেন, আপনি অমুক আয়াতটি পাঠ করেননি। আয়াতটি কি 'মানসুখ' (রহিত) হয়েছে নাকি আপনি পড়তে ভুলে গেছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ মানসুখ হয়নি, আমি পড়তে ভুলে গেছি। আমি জানতাম তুমি ছাড়া আর কেউ হয়তো এইদিকে মনোযোগী হবে না। (মুসনাদ-৫/১২৩,১৪৪)

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন বিষয় হযরত উবাইয়ের বোধগম্য না হলে অন্য সাহবীদের মত চুপ থাকতেন না; বরং বিষয়টি নিয়ে রাসুলুল্লাহর (সা) সাথে আলোচনা করতেন এবং বুঝে আসার পরই উঠতেন। একবার মসজিদে নববীতে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) একটি আয়াত পাঠ করলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন হুজায়ল গোত্রের লোক, এ কারণে তাঁর উচ্চারণে একটু ভিন্নতা ছিল। হযরত উবাই তাঁর পাঠ শুনে প্রশ্ন করেন ঃ আপনি এই আয়াত কার কাছে শিখেছেন? আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আয়াতটির পাঠ এভাবে শিখেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন ঃ আমাকেও তো রাসূল (সা) শিখিয়েছেন। উবাই বলেন, সেই সময় আমার অন্তরে ভ্রান্ত ধারণার প্রবাহ বয়ে যেতে লাগলো। আমি ইবন মাস'উদকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে 'আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও তাঁর কুরআন পাঠে তারতম্য দেখা দিয়েছে। রাসূল (সা) আমার পাঠ শুনলেন এবং বললেন ঃ তুমি ঠিক পড়েছ। তারপর ইবন মাস'উদের পাঠ শুনে বললেন ঃ তুমিও ঠিক পড়েছ। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুইজনের পাঠই সঠিক হয় কি করে?' এতক্ষণে হযরত উবাই ঘেমে একাকার হয়ে গেছেন। রাসূল (সা) এ অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! উবায়ের সংশয় দূর করে দাও।' পবিত্র হাতের স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে পূর্ণ প্রত্যয় নেমে আসে।

কিরায়াত শাস্ত্রে হযরত উবাই ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। এই বিষয়ে তিনি এত পারদর্শী ছিলেন যে, স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসা করেছেন। সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির বিশেষত্ব রাসুল (সা) নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেইসব মহান ব্যক্তির একজন হযরত উবাই। তাঁর সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আকরাহুম উবাই'- তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী উবাই। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬) মাসরূক থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ইবন মাস'উদ, উবাই ইবন কা'ব, মু'য়াজ ইবন জাবাল ও সালিম

মাওলা আবী হুজায়ফা– এই চারজনের নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৪)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার (রা), উবাই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এসব বাণী অনেকবার মানুষকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন। একবার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ উবাই সবচেয়ে বড় ক্বারী। সিরিয়া সফরের সময় 'জাবিয়া' নামক স্থানের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি আর একবার বলেন ঃ তোমাদের কেউ কুরআন শিখতে চাইলে সে যেন উবাইয়ের কাছে আসে। (মুসনাদ–৫/১২৩; হায়াতুস সাহাবা–৩/২০১) হযরত 'উমার তাঁকে সায়্যিদুল মুসলিমীন নামে আখ্যায়িত করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৯; তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৭; আল–ইসাবা–১/১৯)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজে উবাইকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। যে বছর তিনি ইনতিকাল করেন সে বছরও উবাইকে কুরআন শোনান। আর একথাও বলেন যে, জিবরীল আমাকে বলেছেন, আমি যেন উবাইকে কুরআন শুনাই।

যখনই কুরআনের যে আয়াতটি বা সূরাটি নাযিল হতো রাসূল (সা) উবাইকে পাঠ করে শোনাতেন। শুধু তাই নয়, মুখস্ত করিয়ে দিতেন। যখন সূরা 'আল–বায়্যিনাহ' নাযিল হয় তখন তিনি উবাইকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে কুরআন শিখানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করেনঃ আল্লাহ কি আমার নাম বলেছেন? রাসূল (সা) বলেনঃ হাঁ। উবাই তখন খুশীর আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন। (আল–ইসাবা–১/১৯) 'আবদুর রহমান ইবন আবী আবযা নামক উবাইয়ের এক ছাত্র উস্তাদের এই ঘটনা অবগত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবুল মুনজির! সম্ভবতঃ সেই সময় আপনি বিশেষ পুলক ও আনন্দ অনুভব করেছিলেন? উবাই বললেনঃ কেন করবো না? একথা বলে তিনি সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসনাদ–৪/১১৩) কিরায়াত শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার কারণে বিশেষ এক ধরনের কিরায়াত সেকালে তাঁর নামে চালু হয় এবং 'কিরায়াতে উবাই' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষতঃ দিমাশ্‌কবাসীদের মধ্যে তা বেশী প্রচলিত ছিল।

হযরত উবাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর কিরায়াত সারা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কারণ অনেক মানসূখ (রহিত) আয়াত তাঁর পাঠে বিদ্যমান ছিল। আর এ জন্য হযরত 'উমার (রা) তাঁর মর্যাদা উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করা সত্ত্বেও বহুবার বহু ক্ষেত্রে উবাইয়ের সাথে কুরআন পাঠের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন, উবাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন জানেন। তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে হয়েছে। তিনি দাবী করে থাকেন, সবকিছুই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শিখেছেন। তাঁর দাবী অবশ্য সত্য। কিন্তু যখন দেখা যায় বহু আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়েছে অথচ তিনি তা জানেন না, তখন তাঁর কিরায়াতের ওপর আমরা কেমন করে অটল থাকতে পারি? (মুসনাদ–৫/১১৩)

তবে পরবর্তীকালে তিনি সংশোধন হয়ে যান। হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে যখন কুরআন সংকলন করা হয় তখন মানসূখ আয়াতের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তখন উবাইয়ের কিরায়াত সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে এবং সমগ্র মুসলিম খিলাফতে চালু হয়। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার–১/১৬২–৬৩)

হযরত উবাই (রা) মৃত্যুর সময় তাঁর কিরায়াত শাস্ত্রে দুইজন যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যান যাঁরা বিশ্ব মুসলিমের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁরা হলেনঃ হযরত আবূ হুরাইরা ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাত ক্বারীর মধ্যে নাফে 'ইবন আবদুর রহমান ও আবূ রূওয়াম মাদানী'র সনদ আবূ হুরাইরার মাধ্যমে এবং 'আবদুল্লাহ ইবন কাসীর মাক্কীর সনদ আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের মাধ্যমে হযরত উবাই ইবন কা'বে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

সেকালে হযরত উবাইয়ের 'মাদরাসাতুল কিরায়াহ' (কিরায়াত শাস্ত্রের শিক্ষালয়) একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। আরব, রোম, শাম এবং ইসলামী খিলাফতের নানা অঞ্চলের ছাত্ররা মদীনায় এসে তাঁর শিক্ষালয়ে কিরায়াত শিখতো। বহু বড় বড় সাহাবী দূর-দূরান্ত থেকে উৎসাহী লোকদের সাথে করে মদীনায় নিয়ে আসতেন এবং উবাইয়ের মাদরাসায় ভর্তি করে দিতেন। হযরত 'উমার তাঁর খিলাফতকালে হযরত আবূ দারদা আল-আনসারীকে (রা) লোকদের কুরআন শিক্ষাদানের জন্য শামে পাঠান। তিনি ছিলেন সেই পাঁচ রত্নের অন্যতম যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন হিফ্জ করেন। তাসত্ত্বেও তিনি উবাইয়ের কিরায়াতের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একবার হযরত 'উমারের খিলাফতকালে শামবাসীদের একটি দল সংগে নিয়ে তিনি মদীনায় উবাইয়ের নিকট আসেন। তাঁর নিকট তাঁদের সাথে তিনি নিজেও কুরআন পড়েন।

ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে হযরত উবাইয়ের যদিও বিশেষ আগ্রহ ছিল, তবে মেযাজ ছিল একটু উগ্র। এই কারণে তাঁর ধৈর্য খুব শিগগিরই ক্রোধে পরিণত হত। তিনি ক্ষেপে যান এই ভয়ে ছাত্ররা প্রশ্ন করতে ভয় পেত। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের ছাত্র যার ইবন জা'য়শ, যিনি হযরত উবাইয়ের ছাত্র হওয়ার গৌরবও অর্জন করেন- একদিন তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সাহস পাননি। একদিন এভাবে ভূমিকা দিয়ে একটি প্রশ্ন করেনঃ 'আমার প্রতি একটু অনুগ্রহের দৃষ্টি দিন। আমি আপনার নিকট থেকে ইলম হাসিল করতে চাই।' উবাই বললেন ঃ হুঁ, সম্ভবতঃ তোমার ইচ্ছা, কুরআনের কোন আয়াত যেন জিজ্ঞাসা থেকে বাকী না থাকে।

এই কারণে তাঁর মজলিস অর্থহীন প্রশ্ন থেকে মুক্ত থাকতো। তিনি সম্ভাব্য কোন সমস্যার উত্তর দিতেন না; বরং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। একদিন তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক এমন একটি প্রশ্ন করলে বললেনঃ এমনও কি আছে? মাসরূক বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে অপেক্ষা কর। যখন তেমন অবস্থা হয় তখন তোমার জন্য ইজতিহাদের কষ্ট স্বীকার করা যাবে। তবে যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন করা হলে তিনি খুশী হতেন।

জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী বলেনঃ আমি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলাম, রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন স্থানে হালকা করে বসে আলোচনা করছে। আমি একটি হালকার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম তার মধ্যস্থলে একজন বিমর্ষ লোক, পরনে তার দুই প্রস্থ কাপড়। তিনি যেন এই মাত্র সফর থেকে এসেছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলামঃ 'ক্ষমতাসীন শাসকরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের প্রতি আমার কোন সমবেদনা নেই।' আমি বসলাম। তিনি কিছু কথা বলার পর চলে গেলেন। আমি মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? তারা বললোঃ ইনি সায়্যিদুল মুসলিমীন উবাই ইবন কা'ব। আমি পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটি অতি সাধারণ ভাঙ্গাচোরা। তিনি যেন

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীন এক সাধক। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ কোথা থেকে আসা হয়েছে? বললামঃ ইরাক থেকে। তিনি বললেনঃ লোকেরা আমাকে খুব বেশী প্রশ্ন করে। একথা শুনে আমি একটু ক্ষুণ্ন হলাম। আর কথা না বাড়িয়ে সোজা আমার বাহনের দিকে যেতে যেতে হাত উচিয়ে বলতে লাগলামঃ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ পেশ করছি। আমরা অর্থ-কড়ি খরচ করে, দৈহিক ক্লেশ-ভোগ করে, বাহন ছুটিয়ে ইলম হাসিলের উদ্দেশে আলিমদের নিকট যাই, আর তাঁরা কিনা আমাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করেন। আমার একথা শুনে উবাই কেঁদে ফেলেন এবং আমাকে খুশী করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেনঃ 'যদি তুমি আমাকে জুম'আর দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমি যা শুনেছি তার কিছু তোমাদের শোনাবো। এ ব্যাপারে কারো কোন সমালোচনার পরোয়া আমি করবো না।' আমি ফিরে এসে জুম'আ বারের অপেক্ষা করতে লাগলাম। বৃহস্পতিবারে কোন প্রয়োজনে আমি বের হয়ে দেখি মদীনার সব অলি-গলি লোকে লোকারন্য। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলামঃ কী ব্যাপার? লোকেরা অবাক হয়ে বললোঃ মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। বললামঃ হাঁ। তখন তারা বললো। সায়্যিদুল মুসলিমীন উবাই ইবন কা'বের ইনতিকাল হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২০৬)

হযরত উবাইয়ের জীবনধারা ছিল অতি সাধারণ, তবে গাম্ভীর্যপূর্ণ। বাড়ীর ভিতরে এবং বাইরে উভয় স্থানে গদীর ওপর বসতেন, আর ছাত্ররা বসতেন সাধারণ সারিতে। মজলিসে আসা এবং মজলিস থেকে যাওয়ার সময় তাঁর সম্মানে ছাত্ররা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। সে যুগে এই নিয়ম ছিল সম্পূর্ণ নতুন। একবার সুলায়ম ইবন হানজালা কোন একটি মাসয়ালা জানার জন্য উবাইয়ের নিকট আসলেন। যখন উবাই উঠলেন তখন ছাত্ররা তাঁর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলো। হযরত 'উমার এ অবস্থা দেখে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেনঃ এটা আপনার জন্য ফিত্না এবং তাদের জন্য অপমান। (কানযুল 'উম্মাল-৮/৬১; হায়াতুস সাহাবা-১/৬৯৮)

প্রথম জীবনে তিনি ছাত্রদের নিকট থেকে হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে একবার তুফাইল ইবন 'আমর আদ-দাওসীকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। তিনি একটি ধনুক হাদীয়া দেন। উবাই ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কোথায় পেয়েছ? বললেনঃ একজন ছাত্রের হাদীয়া। রাসূল (সা) বললেনঃ তাকে ফিরিয়ে দাও। ভবিষ্যতে এমন হাদীয়া থেকে দূরে থাকবে।

আর একবার একজন ছাত্র কাপড় হাদীয়া দেয়। সেবারও একই অবস্থা দেখা দেয়। এই কারণে পরবর্তীকালে কোন রকম হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করতেন না। শামের লোকেরা যখন তাঁর নিকট কুরআন শিখতে আসে, তখন তারা মদীনার কাতিবদের (লেখক) দ্বারা কুরআন লিখিয়েও নিত। বিনিময়ে তারা লেখকদের আহার করিয়ে পরিতুষ্ট করতো। কিন্তু হযরত উবাই কোন দিন তাদের কোন খাবারে হাত দেননি। হযরত 'উমার (রা) একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেন, শামীদের খাবার কেমন? তিনি বলেনঃ আমি তাদের খাবার খাইনা। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৪১)

কিরায়াত শিক্ষাদানের সময় হরফের যথাযথ উচ্চারণের প্রতি জোর দিতেন। এতে মদীনা

ও তার আশে–পাশের লোকদের তেমন অসুবিধা হতো না। তবে মরু– বেদুঈন ও অন্য দেশের অধিবাসী, যারা আরবী বর্ণ–ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানতো না তাদের নিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়তেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই সমস্যার সমাধান করতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় এক ইরানীকে তিনি কুরআন শিখাতেন। যখন আদ–দুখানের ৪৩ নং আয়াত 'ইন্না শাজারাতুজ যাকুম, তা'য়ামুল আছীম' পর্যন্ত পৌঁছেন তখন লোকটির 'আছীম' শব্দের উচ্চারণে বিভ্রাট দেখা দেয়। হযরত উবাই উচ্চারণ করেন 'আছীম' আর লোকটি উচ্চারণ করে 'ইয়াতীম'। একদিন উবাই তাকে শব্দটির উচ্চারণ মশ্ক করাচ্ছেন, এমন সময় রাসূল (সা) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উবাইয়ের অস্থিরতা ও দুঃশ্চিন্তা দেখে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি ইরানী লোকটিকে প্রথমে বলেনঃ বল, 'তা'য়ামুজ জালিম'। লোকটি পরিষ্কারভাবে তা উচ্চারণ করলো। তখন তিনি উবাইকে বললেনঃ প্রথমে তার জিহবা ঠিক কর এবং তাকে বর্ণ–ধ্বনির উচ্চারণ শিখাও। আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন।

হযরত উবাই (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যতটুকু কুরআন পড়তেন, ঘরে ফিরে তা লিখে রাখতেন। কিরায়াত শাস্ত্রের ইতিহাসে এই কুরআনই 'মাসহাফে উবাই' নামে প্রসিদ্ধ। এই মাসহাফ হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই মাসহাফের খ্যাতি ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হযরত উবাইয়ের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মদীনায় বসবাস করতেন। একবার ইরাক থেকে কিছু লোক তাঁর নিকট এসে বললো, আমরা আপনার পিতার মাসহাফ শরীফ দেখার জন্য এসেছি। তিনি বললেনঃ তা তো আমাদের নিকট নেই, খলীফা উসমান তা নিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত উবাই ছিলেন কুরআনের মুফাস্সির (ভাষ্যকার) সাহাবীদের অন্যতম। এই শাস্ত্রের বড় একটি অংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর আর রাযী তার বর্ণনাকারী। মাত্র তিনটি মাধ্যমে এই সনদ হযরত উবাই পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই শাস্ত্রে হযরত উবাইয়ের বহু ছাত্র ছিল। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে তার সিংহভাগ আবুল আলীয়্যার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এই আবুল আলীয়্যার ছাত্র রাবী ইবন আনাস। ইমাম তিরমিযীর সনদের ধারাবাহিকতা এই রাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। উবাইয়ের তাফসীরের বর্ণনাসমূহ ইবন জারীর ও ইবন আবী হাতেম প্রচুর পরিমাণে নকল করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে কিছু বর্ণনা সংকলন করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রে হযরত উবাই থেকে দুই রকম রিওয়ায়াত (বর্ণনা) আছে। ১· তিনি রাসূলুল্লাহকে(সা) যে সকল প্রশ্ন করেন এবং রাসূল (সা) তার যে সকল জবাব দেন, তাই। ২· এমন সব তাফসীর যা খোদ উবাইয়ের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের তাফসীর, যেহেতু তা রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এ কারণে তা ঈমান ও ইয়াকীনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের তাফসীর হচ্ছে হযরত উবাইয়ের মতামত ও সিদ্ধান্তের সমষ্টি। তার কোনটিতে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসীর)–এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, কোনটিতে সমকালীন চিন্তা–বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে, আবার কোনটিতে ইহুদী বর্ণনার প্রভাব পড়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ সবের উর্ধে উঠে একজন মুজতাহিদের মত নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মূলতঃ এটাই তাঁর তাফসীর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। শানে নুযূল বিষয়ে তাঁর থেকে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তা ছড়িয়ে রয়েছে।

সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে যাঁদেরকে হাদীসের বিশেষজ্ঞ বলা হয় উবাই ইবন কা'ব তাঁদের অন্যতম। আল্লামা জাহাবী বলেছেনঃ উবাই ছিলেন সেই সকল ব্যক্তির একজন যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে হাদীসের বিরাট এক অংশ শুনেছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬) এই কারণে আলিম সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব হালকা-ই-দারস ছিল তাঁরাও উবাইয়ের হালকা-ই-দারসে শরীক হওয়াকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। আর এই কারণে তাঁর হালকা-ই-দারসে তাবে'ঈদের চেয়ে সাহাবীদের সমাবেশ ঘটতো বেশী। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব, আবূ আইউব আল-আনসারী, উবাদাহ ইবন সামিত, আবূ হুরাইরা, আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, সাহল ইবন সা'দ, সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের সাহাবীরা উবাইয়ের দারসে বসাকে গৌরবের বিষয় মনে করতেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭) তাঁর দারসের নির্দিষ্ট সময় ছিল। তবে তাঁর জ্ঞান ভান্ডার সবার জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। যখন তিনি নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে আসতেন তখন কেউ কিছু জানতে চাইলে মাহরূম করতেন না।

কায়স ইবন 'আববাদ সাহাবীদের দীদার লাভে ধন্য হওয়ার জন্য একবার মদীনায় আসেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ 'আমি মদীনায় উবাই ইবন কা'ব অপেক্ষা অধিকতর বড় কোন 'আলিম পাইনি। নামাযের সময় হলে মানুষ সমবেত হলো। জনগণের মধ্যে হযরত 'উমারও ছিলেন। হযরত উবাই কোন একটি বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়ালেন এবং সমবেত জনমন্ডলীর নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস পৌঁছালেন। জনতা অত্যন্ত আগ্রহ ও আবেগের সাথে নীরবে তাঁর কথা শুনছিল।' হযরত উবাইয়ের এমন সম্মান ও মর্যাদা দেখে কায়স আজীবন মুগ্ধ ছিলেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত উবাই ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও সতর্ক। এ কারণে জীবনে বিরাট এক অংশ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটালেও খুব বেশী হাদীস তিনি বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণিত ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-আ'লাম-১/৭৮)

সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে যাঁদের ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের যোগ্যতা ছিল, উবাই তাঁদের অন্যতম। হয়রত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালেই তিনি ফাতওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। হযরত আবূ বকরের (রা) খিলাফত কালেও সিদ্ধান্তদানকারী ফকীহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেনঃ আবূ বকর (রা) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। এই সকল ব্যক্তির একজন ছিলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৫) হযরত 'উমার ও হযরত 'উসমানের খিলাফতকালেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবন সা'দ, সাহল ইবন আবী খায়সামা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে তিনজন মুহাজির ও তিনজন আনসার ফাতওয়া দিতেন। তাঁরা হলেনঃ 'উমার, 'উসমান, আলী, উবাই, মু'য়াজ ও যায়িদ ইবন সাবিত। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪)

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা বিষয়ে তাঁর নিকট ফাতওয়া চাওয়া হতো। এই ফাতওয়া তলবকারীদের মধ্যে সম্মানিত সাহাবা-ই-কিরামও থাকতেন। সুমরাহ্ ইবন জুনদুব ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। তিনি নামাযে তাকবীর ও সূরা পাঠের পর একটু দেরী করতেন। লোকেরা আপত্তি জানালো। তিনি হযরত উবাইকে লিখলেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত

তথ্য আমাকে অবহিত করুন, আমি ভুলে গেছি। হযরত উবাই সংক্ষিপ্ত জবাব লিখে পাঠান। তাতে তিনি বলেনঃ আপনার পদ্ধতি শরীয়াত অনুসারী। আপত্তি উথাপনকারীরা ভুল করছে। (কানযুল 'উম্মাল-৪/২৫১)

তাঁর ইজতিহাদের পদ্ধতি ছিল, প্রথমে কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, তারপর সেই বিষয়ে হাদীসের সন্ধান করা। আর যখন কোন বিষয়ে কুরআন হাদীস সম্পর্কে কিছু না পেতেন তখন কিয়াস বা অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

হয়রত 'উমারের নিকট এক মহিলা এসে দাবী করলো যে, সে যখন গর্ভবতী তখন তার স্বামী মারা গেছে। এখন সে সন্তান প্রসব করেছে; কিন্তু 'ইদ্দতের সময় সীমা পূর্ণ হয়নি, এ বিষয়ে সে খলীফার মতামত চাইলো। খলীফা 'উমার বললেনঃ 'ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মহিলা উঠে উবাই ইবন কা'বের নিকট গেল এবং 'উমারের নিকট তার যাওয়া, ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা ইত্যাদি তাঁকে অবহিত করলো। উবাই বললেনঃ তুমি 'উমারের কাছে আবার যাও এবং তাঁকে বল, উবাই বলেছেনঃ মহিলার 'ইদ্দত পূর্ণ হয়ে হালাল হয়ে গেছে। যদি তিনি আমার কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবে, আমি এখানে বসে আছি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে। মহিলা 'উমারের নিকট ফিরে গেল। 'উমার (রা) উবাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হাজির হলে 'উমার জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি একথা কিভাবে বললেন এবং কোথায় পেলেন? তিনি বললেনঃ কুরআনে পেয়েছি। এই বলে তিনি সূরা আত-তালাকের ৪ নং আয়াত- 'ওয়া উলাতিল আহমালি আজালুহুন্না আন ইয়াদা'না হামলাহুন্না-' পাঠ করেন। তারপর বলেন, যে গর্ভবতী মহিলা বিধবা হবে সেও এই বিধানের অন্তর্গত। তাছাড়া রাসূল (সা) থেকে এ সম্পর্কে একটি হাদীসও শুনেছি। হযরত 'উমার মহিলাকে বললেনঃ উবাইয়ের কথা শোন। (কানযুল 'উম্মাল-৫/১৬৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাসের (রা) বাড়ীটি ছিল মসজিদে নববীর সংলগ্ন। হযরত 'উমার (রা) যখন মসজিদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি 'আব্বাসকে (রা) বলেন, মসজিদ বানাতে হবে, বাড়ীটি বিক্রী করে দিন। 'আব্বাস বললেন, না, আমি বিক্রী করবো না। 'উমার বললেন, তাহলে বাড়ীটি মসজিদের অনুকূলে হিবা (দান) করে দিন। এ প্রস্তাবেও তিনি রাজী হলেন না। 'উমার তখন বললেনঃ তাহলে আপনি নিজে মসজিদটি সম্প্রসারণ করে দিন এবং আপনার বাড়ীটিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। 'আব্বাস রাজী হলেন না। 'উমার (রা) বললেনঃ এই তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি আপনাকে মানতে হবে। অবশেষে দু'জনই উবাই ইবন কা'বকে শালিস মানলেন। তিনি 'উমারকে (রা) প্রশ্ন করলেনঃ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও জিনিস কেড়ে নেওয়ার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? 'উমার জানতে চাইলেন, এ বিধান কুরআন না হাদীসে পেয়েছেন? বললেনঃ হাদীসে। তারপর বলেনঃ হযরত সুলাইমান বাইতুল মাকদাসের প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীরের একাংশ অন্যের জমিতে নির্মিত হয় এবং তা ধ্বসে পড়ে। অতঃপর হযরত সুলাইমানের নিকট ওহী আসে যে, জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করবে। একথা শুনে হযরত 'উমার চুপ হয়ে যান। এই ঘটনার পর হযরত 'আব্বাস স্বেচ্ছায় মসজিদের জন্য বাড়ীটি দান করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৯৪,৯৫)

সুওয়ায়দ ইবন গাফলা, যায়িদ ইবন সুজান ও সুলাইমান ইবন রাবী'য়ার সাথে কোন এক

অভিযানে যান। পথে 'উজায়ব' নামক স্থানে একটি চাবুক পড়ে থাকতে দেখে উঠিয়ে নেন। তাঁর অপর সঙ্গীদ্বয় বললেন, আপনি ওটা ফেলে দিন। তিনি ফেললেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পর সুওয়ায়দ হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে মদীনায় যাত্রা বিরতি করে হযরত উবাইয়ের নিকট যান এবং চাবুকের ঘটনা বর্ণনা করেন। উবাই বললেন; আমার জীবনেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় একবার আমি একশো দীনার পথে পাই। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, এক বছর পর্যন্ত মানুষকে জানাতে থাকবে। একবছর পূর্ণ হলে বললেন, দীনারের পরিমাণ, থলির অবস্থা সব ভালোভাবে মনে রেখে আরও এক বছর অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে প্রমাণসহ কেউ উপস্থিত হলে তাকে দেবে। অন্যথায় তুমি মালিক হবে।

হযরত 'উমার (রা) একবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তিনি মানুষকে 'তামাত্তু' হজ্জ আদায় করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন। উবাই তাঁকে বললেন, এমন নিষেধাজ্ঞা জারির কোন ইখতিয়ার আপনার নেই।

হযরত উবাই 'কিরায়াত খালফাল ইমাম' (ইমামের পিছনে কিরায়াত পাঠ)–এর প্রবক্তা ছিলেন। তবে তার রূপ ছিল এমনঃ যুহর ও 'আসরের ফরয নামাযে ইমামের পিছনে কিরায়াত পাঠ করতেন। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন হুজায়ল তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ইমামের পিছনে কিরায়াত পড়েন? বললেনঃ হাঁ। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫৪) তিনি সূরা আল–আ'রাফের ২০৪ নং আয়াত 'ওয়া ইজা কুরিয়াল কুরআন ফাসতামি'উ লাহু ওয়া আনসিতূ–' যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক– এর বাহ্যিক অর্থের ওপর 'আমল করতেন। যুহর ও 'আসরে ইমাম যখন চুপে চুপে কিরায়াত পড়েন তখন তো শোনার প্রশ্ন আসেনা। সুতরাং তাঁর মতে যে নামাযে ইমাম জোরে কিরায়াত পাঠ করবেন সেখানে মুক্তাদী চুপ করে শুনবেন। আর যেখানে ইমাম চুপে চুপে পাঠ করবেন সেখানে মুক্তাদীও কিরায়াত পাঠ করবেন।

একবার এক ব্যক্তি মসজিদে একটি হারানো জিনিসের ব্যাপারে হৈ চৈ করছিল। হযরত উবাই রেগে গেলেন। লোকটি বললো, আমি তো অশ্লীল কিছু বলছিনে। উবাই বললেন, অশ্লীল না হলেও এটা মসজিদের আদবের খেলাফ। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫০)

আর একবার রাসুল (সা) জুম'আর খুতবা দিলেন এবং সূরা বারায়াত থেকে পাঠ করলেন। এই সূরাটি হযরত আবূ দারদা ও আবূ জারের (রা) জানা ছিল না। তাঁরা খুতবার মধ্যেই ইশারায় উবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সূরাটি কবে নাযিল হয়েছে, আমাদের তো জানা নেই? উবাইও ইশারা য় তাদেরকে চুপ থাকতে বললেন। নামায শেষে তিনজনই নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরার জন্য রওয়ানা হচ্ছেন, তখন অন্য দু'জন উবাইকে বললেন, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন? উবাই বললেনঃ আজ আপনাদের নামায নষ্ট হয়ে গেছে, আর তাও একটি অহেতুক কারণে। এমন কথা শুনে তাঁরা হযরত রাসূল্ল কারীমের (সা) নিকট হাজির হলেন এবং বললেনঃ উবাই আমাদেরকে এমন কথা বলেছেন। তিনি বললেনঃ সে ঠিক কথাই বলেছে। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫৫)

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে হযরত উবাই বলতেন, তিন রকম লোকের জন্য তিন রকম হুকুম আছে। কিছু লোক দুররা ও রজম উভয় প্রকার শাস্তির যোগ্য। কিছু লোক শুধু রজম এবং কিছু শুধু দুররার শাস্তি লাভের উপযুক্ত। যে বৃদ্ধ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচার করে তাকে

উভয় শাস্তি দিতে হবে। আর যে যুবক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচার করে তাকে শুধু রজম করতে হবে। যে যুবকের স্ত্রী নেই সে ব্যভিচার করলে তাকে শুধু দুররা লাগাতে হবে।

নাবীজ (খেজুরের শরবত) হালাল হওয়া সম্পর্কে সকল 'আলিম প্রায় একমত। তবে উবাই থেকে এ সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমধর্মী মত বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট নাবীজ পান করা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, নাবীজের মধ্যে এমন কী দেখেছ? পানি, ছাতুর শরবত, দুধ ইত্যাদি পান কর। প্রশ্নকারী বললো, মনে হচ্ছে আপনি নাবীজ পানের সমর্থক নন। তিনি বললেন, মদ পান আমি কিভাবে সমর্থন করতে পারি?

এভাবে বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত উবাইয়ের মতামত গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে তাঁর যে উঁচু মর্যাদা ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

হযরত উবাই লিখতে-পড়তে জানতেন। এ কারণে ওহীর বেশীর ভাগ আয়াত তিনিই লিখতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনা আগমনের পর ওহী লেখার প্রথম গৌরব তিনিই লাভ করেন। (আন সাবুল আশরাফ-১/৫৩১) সেযুগে কোন লেখা বা কুরআনের শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল না। হযরত উবাই সর্ব প্রথম নাম লেখার প্রচলন করেন। পরে অন্যরা তাঁর অনুসরণ করে।

সকল প্রকার বিদ'য়াত থেকে দূরে থাকা, সত্য প্রকাশের সৎ সাহস- এ জাতীয় গুণাবলী হযরত উবাইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি প্রবল উৎসাহ-আবেগ তাঁর মধ্যে রূহানিয়্যাতের চরম বিকাশ সাধন করেছিল। গভীর রাতে মানুষ যখন আরাম -আয়েশে বিছানায় গা এলিয়ে দিত, তিনি তখন ঘরের এক কোণে বিনীতভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থাকতেন, মুখে আল্লাহর কালাম জারী থাকতো এবং চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো। তিন রাতে কুরআন খতম করতেন। রাতের এক অংশ দরূদ ও সালাম পেশের মাধ্যমে অতিবাহিত হতো।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত প্রবল ছিল যে 'উস্তুনে হান্নানা'র একাংশ তাবারুক হিসেবে বাড়ীতে রেখে দেন এবং উইপোকায় খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতেই ছিল।

সব ধরনের বিদ'য়াত থেকে এত দূরে থাকতেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র সময়ে যে কথা বা কাজ হয়নি তা বলা বা করাকে তিনি খুব খারাপ মনে করতেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে একদিন মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন লোকেরা পৃথকভাবে যার যার মত তারাবীহর নামায পড়ছে। 'উমার জামায়াতবদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি উবাইকে বললেনঃ আমি আপনাকে ইমাম নিযুক্ত করতে চাই, আপনি তারাবীহর নামায পড়াবেন। উবাই বললেনঃ যে কাজ আগে করিনি এখন তা কিভাবে করি? 'উমার (রা) বললেন, আমি তা জানি। তবে এ কোন খারাপ কাজ নয়। (কানযুল 'উম্মাল-৪/২৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৯)

একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) প্রশ্ন করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমরা মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ি বা নানাবিধ কষ্ট ভোগ করি, কি কোন সাওয়াব আছে? রাসূল (সা) বললেনঃ এতে গুণাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। সেখানে হযরত উবাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, ছোট ছোট বিপদ- মুসীবতও কি গুণাহর কাফ্ফারা হয়? বললেনঃ একটি কাঁটা ফুটলেও তা কাফ্ফারা হয়। তখন ঈমানী আবেগে তাঁর মুখ

থেকে বেরিয়ে যায়; হায়! সব সময় যদি আমার দেহে জ্বর লেগে থাকতো, আর তা সত্ত্বেও আমি হজ্জ 'উমরা আদায়ে সক্ষম হতাম এবং জিহাদে গমন ও জামায়াতে নামায আদায়ের যোগ্য থাকতাম। আল্লাহ পাক তাঁর এই দু'আ কবুল করেন। তারপর থেকে যত দিন জীবিত ছিলেন, শরীরে সব সময় জ্বর থাকতো। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৫৩; আল-ইসাবা-১/২০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০২-৩)

আল্লাহর ভয়ে, শেষ বিচার দিনের ভয়ে, সব সময় তিনি কাঁদতেন। কুরআন পাঠের সময় ভীষণ ভীত হয়ে পড়তেন। বিশেষতঃ সূরা আল-আনয়ামের ৬৫ নং আয়াত ও পরবর্তী আযাবের আয়াতগুলি যখন পাঠ করতেন তখন তাঁর শঙ্কা ও ভয়ের সীমা থাকতো না। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪৯৮)

ইসলামী খিলাফতের সীমা যখন বিস্তার লাভ করে এবং সাধারণ মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী বা শাসকদের অহেতুক তোয়াজ খাতির করে চলতে থাকে তখন তিনি বলতেনঃ কা'বার প্রভুর নামে শপথ! তারা ধ্বংস হয়েছে। তারা ধ্বংস হয়েছে। অন্যদেরকে তারা ধ্বংস করেছে। তাদের জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমার দুঃখ তাদের জন্য, যাদের তারা সর্বনাশ করেছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪৯৮)

হযরত উবাই বলতেনঃ মুমিনের চারটি বৈশিষ্টঃ ১. বিপদে ধৈর্যধারণ করে, ২. কোন কিছু পেলে আল্লাহর শোকর করে, ৩. যখন কথা বলে, সত্য বলে, ৪. যখন বিচার করে, ন্যায়-নীতির সাথে বিচার করে। তিনি আরও বলতেন, মুমিনের জীবন পাঁচটি নূর বা জ্যোতির মধ্যে বিবর্তিত হয়। ১. তার কথা নূর, ২. তার ইলম বা জ্ঞান নূর, ৩. কবরে সে নূরের মধ্যে অবস্থান করবে, ৪. কবর থেকে সে নূরের মধ্যে উঠবে এবং ৫. কিয়ামতের দিন নূরের দিকেই তার শেষ যাত্রা হবে। অপর দিকে একজন কাফিরের জীবন পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে বিবর্তিত হয়। ১. তার কথা অন্ধকার, ২. তার আমল অন্ধকার, ৩. তার কবর অন্ধকার, ৪. কবর থেকে উঠবে অন্ধকারে এবং ৫. কিয়ামতের দিন তার শেষ যাত্রা হবে অন্ধকারের দিকে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৮)

জীনের সাথে হযরত উবাইয়ের একটি ঘটনার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। খেজুর শুকানোর জন্য হযরত উবাইয়ের একটি উঠোন ছিল। সেখানে খেজুর নেড়ে দেওয়া ছিল। তিনি মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। একদিন খেজুরে ঘাটতি লক্ষ্য করে রাতে পাহারা দিলেন। হঠাৎ অন্ধকারে একজন যুবকের মত একটি প্রাণী দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন। সে সালামের জবাব দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি? সে বললোঃ জীন। তিনি বললেনঃ তোমার একটি হাত দাও তো। সে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি হাত ধরলেন এবং তাঁর মনে হলো, সেটা যেন কুকুরের হাত এবং তার লোম কুকুরের লোমের মত। তিনি বললেনঃ জীনদের সৃষ্টি কি এমনই? আমার তো ধারণা ছিল তারা আরও শক্তিশালী। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি যা করেছ, তার কারণ কি? সে জবাব দিলঃ আমরা জেনেছি, আপনি সাদাকা (দান) করতে ভালোবাসেন। তাই আমরা এই খেজুর থেকে কিছু গ্রহণ করতে চেয়েছি। তিনি জীনকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের হাত থেকে আমাদের নিরাপত্তা কিসে? সে বললোঃ সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসীতে। কেউ সন্ধ্যায় পড়ে ঘুমালে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে; আর কেউ সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। পরদিন সকালে হযরত উবাই

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে রাতের ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল (সা) সবকিছু শুনে বললেনঃএই খবীসটি (পাপাত্মাটি) সত্যি কথা বলেছে। নাসাঈ, হাকেম, তাবারানী প্রভৃতি গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৯০)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উবাই ইবন কা'ব প্রতিজ্ঞা করলেনঃ আজ আমি মসজিদে এমন নামায আদায় করবো এবং আল্লাহর এমন প্রশংসা করবো যা আর কেউ কোন দিন করেনি। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে যেই না আল্লাহর প্রশংসার জন্য বসেছেন অমনি পিছন দিকে জোরে জোরে কাউকে হামদ পাঠ করতে শুনতে পেলেন। তিনি ঘটনাটি রাসূলকে (সা) জানালেন। রাসূল (সা) বললেন, এই হামদের পাঠক ছিলেন জিবরীল (আ)। (দ্রঃ হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪১)

ইবন 'আব্বাস বর্ণনা করেন। একবার 'উমার ইবন আল-খাত্তাব আমাদেরকে কোথাও বের হতে বললেন। আমরা পথ চলছি। আমি ও উবাই এক সময় কাফিলার একটু পিছনে পড়ে গেলাম। এমন সময় আকাশে একটু মেঘ দেখা গেল। উবাই দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! এই মেঘের কষ্ট আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আমরা মেঘের কষ্ট থেকে বেঁচে গেলাম। আমরা কাফিলার সাথে মিলিত হলে 'উমার জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরাও কি আমাদের মত কষ্ট পেয়েছ? আমি বললামঃ আবুল মুনজির (উবাই) মেঘের কষ্ট থেকে আমাদেরকে রেহাই দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিল। 'উমার বললেনঃ আমাদের জন্যও একটু দু'আ করলে না কেন? (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৫৮)। ■

আনাস ইবন মালিক (রা)

আনাস ইবন মালিক ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী, খাদিমে রাসূল, ইমাম, মুফতী, মু'য়াল্লিমে কুরআন, মুহাদ্দিস, খ্যাতিমান রাবী, আনসারী, খাযরাজী ও মাদানী। কুনিয়াত আবু সুমামা ও আবু হামযা। খাদিমু রাসূলিল্লাহ লকব বা উপাধি। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া-৩/৪০২, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) আনাস বলতেনঃ আমি 'হামযা' নামক এক প্রকার সব্জী খুটতাম, তাই দেখে রাসূল (সা) আদর করে আমাকে ডাকেনঃ 'ইয়া আবা হামযা'। সে দিন থেকে এটাই আমার কুনিয়াত বা ডাকনাম হয়ে যায়। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১) ইয়াসরিবের (আল-ইসাবা-১/৭১) বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-১/৩৬৫ আল ইসাবা-১/৭১) এই গোত্রটি ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাসের পিতা মালিক ইবন নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আল-আনসারিয়্যা। উম্মু সুলাইম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর-এর নসব 'আমির ইবন গানাম-এ গিয়ে আনাসের মার বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা-১/১২৭, আসাহহুস সীয়াব-৬০৬)

উম্মু সুলাইমের আসল নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যেমনঃ সাহলা, রুমাইলা, রুমাইসা, সুলাইকা, আল-ফায়সা ইত্যাদি। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০)

আনাসের চাচা আনাস ইবন নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা কেটে কুটে তাঁর দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস বলতেন, আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৩, হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৪, ৫০৫) আনাসের মামা হারাম ইবন মিলহান বি'রে মা'উনার দুঃখজনক ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০২)

আনাসের বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং সেখানে কুফরী অবস্থায় মারা যায়। মা আবু তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। আবু তালহা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। মা বালক আনাসকেও সাথে করে আবু তালহার বাড়ীতে নিয়ে যান। আনাস এখানেই প্রতিপালিত হন।

আবু তালহার সাথে তাঁর মার বিয়ে সম্পর্কে আনাস বর্ণনা করেছেনঃ আবু তালহা যখন উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মু সুলাইম বললেনঃ আবু তালহা, তুমি কি জাননা, যে ইলাহ-র ইবাদাত তুমি কর তা মাটি দিয়ে তৈরী? বললেনঃ হাঁ, তা জানি। উম্মু সুলাইম আরও বললেনঃ একটি গাছের ইবাদাত করতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই এবং

তোমার কাছে কোন মোহরের দাবীও আমার থাকবে না। 'আমি ভেবে দেখবো'– এ কথা বলে আবু তালহা উঠে গেলেন। পরে ফিরে এসে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ 'আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তখন উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে ডেকে বললেনঃ আনাস, তুমি আবু তালহার বিয়ের কাজটি সমাধা কর। আনাস তাঁর মাকে আবু তালহার সাথে বিয়ে দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা– ১/১৯৫, ১৯৬)

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আবু তালহার বাড়ীতে মদ পানের আসর বসতো। বালক আনাস সেই আসরে সাকীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং নিজেও মদের অভ্যাস করতেন। এই বালককে মদ পান থেকে বিরত রাখার কেউ ছিল না। (মুসনাদ– ৩/১৮১)

আনাসের বয়স যখন আট/নয় বছর তখন মদীনায় ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। ইসলাম কবুলের ব্যাপারে বনু নাজ্জার গোত্র সবার আগে ভাগেই ছিল। এই খান্দানের বেশীর ভাগ সদস্য রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আনাসের মা উম্মু সুলাইম ও তৃতীয় আকাবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর স্বামী অর্থাৎ আনাসের পিতা স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ করে শামে চলে যায়। স্বামী পরিত্যক্তা উম্মু সুলাইম আবু তালহাকে বিয়ে করতে রাজী হন এই শর্তে যে, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করবেন। এভাবে উম্মে সুলাইমের চেষ্টায় আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় যান এবং তৃতীয় 'আকাবায় শরীক হয়ে রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) বাইয়াতের গৌরব অর্জন করেন। এভাবে আনাসের বাড়ী ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। তাঁর জান্নাতী মা উম্মু সুলাইম ইসলামের এক আলোক বর্তিকা, আর তাঁর স্বামী দ্বীনের এক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। এমনই এক আশ্রয়ে আনাস বেড়ে ওঠেন।

আনাস যখন দশ বছরের বালক তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসেন। আনাসের বয়স অল্প হলেও তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। রাসূল (সা) যখন কুবা থেকে মদীনার দিকে আসছিলেন, সমবয়সী ছোট ছেলে–মেয়েদের সাথে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আনাসও স্বাগত সংগীত গেয়েছিলেন, তাঁরা ছুটে ছুটে 'রাসূলুল্লাহ এসেছেন, মুহাম্মাদ এসেছেন'– বলে মদীনাবাসীদের ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ থেকে ভীড় একটু কম হলে আনাস তাঁর চেহারামুবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনায় আসেন প্রসিদ্ধ মতে আনাসের বয়স তখন দশ বছর। রাসূল (সা) একটু স্থির হওয়ার পর আনাসের মা একদিন তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে আনাস বলেনঃ আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে গিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী–পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালেগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্ব প্রথম আমাকে এই অসীয়াতটি করেনঃ ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা

গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলের (সা) গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে, বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু তালহা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১, আনসাবুল আশরাফ-১/৫০৬, আল-ইসাবা-১/৭১)

হযরত আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় দশ বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাঁর খিদমাতের দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য তাঁর গর্বের শেষ ছিল না। ফজর নামাযের পূর্বেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাতে হাজির হয়ে দুপুরে বাড়ী ফিরতেন। কিছুক্ষণ পর আবার আসতেন এবং আসরের নামায আদায় করে বাড়ী ফিরতেন। আনাসের মহল্লায় একটি মসজিদ ছিল, সেখানে মুসল্লীরা তাঁর অপেক্ষায় থাকতো। তাঁকে দেখে তারা আসরের নামাযে দাঁড়াতো। (মুসনাদে আহমাদ-৩/২২২)

উপরোক্ত সময় ছাড়াও তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। যখনই প্রয়োজন পড়তো রাসূলুল্লাহর (সা) ডাকে সাড়া দিতেন। এক দিনের ঘটনা, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনীয় কাজ সেরে দুপুরে বাড়ীর দিকে চলেছেন। পথে দেখলেন, তাঁরই সমবয়সী ছেলেরা খেলছে। তাঁর কাছে খেলাটি ভালো লাগলো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন তাদের খেলা দেখতে। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, রাসূল (সা) তাদের দিকে আসছেন। তিনি এসে প্রথমে ছেলেদের সালাম দিলেন, তারপর আনাসের হাতটি ধরে তাঁকে কোন কাজে পাঠালেন। আর রাসূল (সা) তাঁর অপেক্ষায় একটি দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আনাস কাজ সেরে ফিরে এলে রাসূল (সা) বাড়ীর দিকে ফিরলেন, আর তিনি চললেন বাড়ীর দিকে। ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁর মা জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরী হলো কেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন কাজে গিয়েছিলাম। এই জন্য ফিরতে দেরী হয়েছে। মা মনে করলেন, ছেলে হয়তো সত্য গোপন করছে, এই জন্য জানতে চাইলেনঃ কী কাজ? আনাস জবাব দিলেন একটি গোপন কথা, কাউকে বলা যাবেনা। মা বললেনঃ তাহলে গোপনই রাখ কারও কাছে প্রকাশ করোনা। আনাস আজীবন এ সত্য গোপন রেখেছেন। একবার তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র সাবিত যখন সেই কথাটি জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, কথাটি কাউকে জানালে তোমাকেই জানাতাম। কিন্তু আমি তা কাউকে বলবো না। (আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগুল আমানী-২২/২০৪, হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৩, ২/৫০৩)

হযরত আনাস সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। আবাসে-প্রবাসে, ভিতরে-বাহিরে কোন বিশেষ স্থান বা সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিলনা। হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে যাতায়াত করতেন। আনাস বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে আসতাম এবং অন্দর মহলে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতদের কাছেও যেতাম। একদিন আমি অন্দরে প্রবেশ করতে যাব, এমন সময় রাসূল (সা) ডাকলেনঃ আনাস, পিছিয়ে এস। হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৪) আনাস আরও বলেনঃ আমি যে দিন বালেগ হলাম, রাসূলকে (সা) সে কথা জানালাম। তিনি বললেনঃ এখন থেকে অনুমতি ছাড়া মেয়েদের কাছে যাবেনা। আনাস বলেনঃ সেই দিনটির মত কঠিন দিন আমার জীবনে আর আসেনি। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৪)

একদিন ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূল (সা) বললেন, আজ রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু খাবার দাও। আনাস খুব তাড়াতাড়ি কিছু খুরমা ও পানি হাজির করেন। রাসূল (সা) তাই দিয়ে সেহরী সেরে ফজরের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। (মুসনাদ-৩/১৯৭) ওয়াকিদী বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিমদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দরজা থেকে দূরে যেত না তাঁদের মধ্যে আনাস একজন। আবু হুরাইরা (রা) বলতেনঃ আমি তো মনে করতাম আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) দাস। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৮৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে আবু আইউব আল আনাসারীর (রা) অতিথি হন। সেই সময় তিনি আনাসের পিতা মালিক ইবন নাদরের কুয়োর পানি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি সহকারে পান করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু আইউবের বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে চলে গেলে আনাস সেই কুয়োর পানি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য বয়ে নিয়ে আসতেন। (আনসাবুলআশরাফ-১/৫৩৫)

হযরত আনাস অত্যন্ত নিপুণতার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সকল কাজ সম্পাদন করতেন। আনুগত্যের মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁকে খুশী রাখতেন। তিনি নিজেই বলেনঃ আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কক্ষণও আমার ওপর নারাজ হননি। আমার কোন কাজের জন্য কক্ষণও বলেননিঃ এ কাজটি তুমি কেন করলে? আর আমি কোন কাজ করিনি সে জন্যও তিনি প্রশ্ন করেননিঃ কাজটি তুমি কেন করনি? অথবা তুমি ভুল করেছ বা যা করেছ, খুবই খারাপ করেছ- এমন কথাও আমার কোন ভুলের জন্য তিনি বলেননি। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৪, ৫০৬) এভাবে আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরে এক বিশেষ স্থান দখল করেন। রাসূল (সা) স্নেহভরে কখনও 'ছেলে' আবার কখনও 'উনাইস' বলে ডাকতেন। তিনি মাঝে মধ্যে আনাসদের বাড়ীতে যেতেন, আহার করতেন, দুপুরের সময় হলে বিশ্রাম নিতেন, নামায আদায় করতেন এবং আনাসের জন্য দু'আও করতেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। (আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/২০৩)

আনাস বলেনঃ একদিন আবু তালহা আমার মা উম্মু সুলাইমকে বললেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল শুনতে পেলাম। মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? মা বললেনঃ আছে। তিনি কয়েকটুকরো রুটি আমার কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। আমাকে দেখেই রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু তালহা পাঠিয়েছে? বললামঃ হাঁ। বললেনঃ খাবার? বললামঃ হাঁ। রাসূল (সা) সাথের লোকদের বললেনঃ তোমরা ওঠো। তাঁরা চললেন, আমিও তাদের আগে আগে চললাম। আবু তালহা সকলকে দেখে স্ত্রীকে ডেকে বললেনঃ উম্মু সুলাইম, দেখ, রাসূল (সা) লোকজন সংগে করে চলে এসেছেন। সবাইকে খেতে দেওয়ার মত খাবার তো নেই। উম্মু সুলাইম বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সে কথা ভালোই জানেন। আবু তালহা অতিথিদের নিয়ে বসালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বললেনঃ যা আছে নিয়ে এসো। সামান্য খাবার ছিল, তাই হাজির করা হলো। তিনি বললেনঃ প্রথম দশজনকে আসতে বল। দশ জন ঢুকে পেট ভরে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর দশ জন। এ ভাবে মোট সত্তুর জন লোক পেট ভরে সেই খাবার খেয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৪)

আনাস আরও বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইমের আবু তালহার পক্ষের আবু 'উমাইর নামে একটি ছোট ছেলে ছিল। রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এলে তার সাথে একটু রসিকতা করতেন। একদিন দেখলেন আবু 'উমাইর মুখ ভার করে বসে আছে। রাসূল (সা) বললেনঃ আবু 'উমাইর এমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন? মা বললেনঃ তার খেলার সাথী 'নুগাইর' টি মারা গেছে। তখন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে দেখলে কাব্যি করে বলতেনঃ 'ইয়া আবা 'উমাইর- মা ফা'য়ালান নুগাইর'- ওহে আবু 'উমাইর, তোমার নুগাইরটি কি করলো? উল্লেখ্য যে, 'নুগাইর' লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই-এর মত এক প্রকার ছোট্ট পাখী। (তারীখে ইবন 'আসাকির- ৩/১৩৯, হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০, ৫৭১)

আনাসদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা) ওহী নাযিলের সময় ঘেমে যেতেন আর তাঁরা সেই ঘাম সংরক্ষণ করতেন। আনাস বলেনঃ একদিন দুপুরে রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিলেন এবং ঘেমে গেলেন। আমার মা একটি বোতল এনে সেই ঘাম ভরতে লাগলেন। রাসূল (সা) জেগে উঠে বললেনঃ 'উম্মু সুলাইম, একি করছো? মা বললেনঃ আপনার এই ঘাম আমাদের জন্য সুগন্ধি। আনাস বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সুগন্ধি থেকে অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত মিশ্‌ক অথবা আম্বর আমার জীবনে আর শুকিনি। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৪, ১৪৫)

আমরা আগেই বলেছি, আনাসের কল্যাণময়ী মা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা। তিনি অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। আর রাসূলও (সা) তাঁর কথা কখনও বিস্মৃত হননি। এই সম্মানিত মাহিলাকে রাসূল (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৩/৪০২) খাইবার যুদ্ধে হযরত সাফিয়্যা (রা) বন্দী হলেন এবং রাসূল (সা) তাঁকে শাদী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাফিয়্যাকে উম্মু সুলাইমের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনিই বিয়ের সকল ব্যবস্থা সম্পাদন করলেন। এ সম্পর্কে ইবন ইসহাক বলেনঃ খাইবারে অথবা খাইবার থেকে ফেরার পথে হযরত সাফিয়্যার সাথে রাসূলল্লাহর (সা) শাদী মুবারাক অনুষ্ঠিত হয়। আনাসের মা উম্মু সুলাইম তাঁর সাজানো, চুল বাঁধা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৯, ৩৪০, আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৩)

এমনিভাবে হযরত যয়নাবের সাথে যখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় তখনও উম্মু সুলাইম কিছু খাবার তৈরী করে পাঠান। রাসূল (সা) সাহাবীদের দা'ওয়াত দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করে সেই খাবার পরিবেশন করেন। (মুসনাদে আহমাদ-৩/১৬৩)

এই সব বৈশিষ্ট্যই আনাসকে নবী খান্দানের একজন সদস্যে পরিণত করে। রাসূল (সা) মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে হালকা মিযাজ হয়ে যেতেন। এই যেমন তাঁকে ডাকলেন 'আবু হামযা' বলে। একবার তো ডাকলেন 'ইয়া জাল উজনাইন'- ওহে দুই কান ওয়ালা বলে। (উসুদুল গাবা-১/১২৭)

আমরা পূর্বেই দেখেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আনাসের কত গভীর সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের কারণেই ঘরে-বাইরে, আবাসে-প্রবাসে সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। যুদ্ধের ময়দানেও সেই সংগ ত্যাগ করেননি। বদর যুদ্ধের সময় আনাসের বয়স এমন কিছু হয়নি। মাত্র বারো বছর। তাসত্ত্বেও মুসলিম মুজাহিদদের পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেবা ও সৈনিকদের সাজ–সরঞ্জাম ও মাল–সামান দেখার দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় বয়স অতি অল্প থাকার কারণে তাঁর এ যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। একবার তো সংশয়ের সুরে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেই বসেঃ আপনি কি বদরে হাজির ছিলেন? জবাব দিলেনঃ আমি কিভাবে গায়ের হাজির থাকতে পারি? (আল–ইসাবা–১/৭১, দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–৩/৪০২)

বদরের এক বছর পর উহুদ যুদ্ধ হয়। তখনও আনাস অল্প বয়স্ক। হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদাইবিয়ায় বাইয়াতে শাজারার গৌরব অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। হিজরী সপ্তম সনে রাসূল (সা) 'উমরাতুল কাদা (কাজা 'উমরাহ) আদায় করেন। আনাস সংগে ছিলেন। এ বছরই খাইবার বিজিত হয়। এই অভিযানে আনাস আবু তালহার সাথে উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। এক পর্যায়ে বিজয়ীর বেশে হযরত রাসূলে কারীম (সা) খাইবারে প্রবেশ করছিলেন তখন আনাস তাঁর এত নিকটে ছিলেন যে তাঁর পা রাসূলের (সা) পবিত্র পা স্পর্শ করে। এর ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) ইযার হাঁটুর ওপরে উঠে যায় এবং তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। (মুসনাদ–৩/১০২) এরপর মক্কা বিজয়, তায়িফ ও হুনাইন অভিযানে যোগ দেন। সর্বশেষ হিজরী দশ সনে বিদায় হজ্জে রাসূলল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন।

আনাস বলেনঃ হুনাইন যুদ্ধের দিন আবু তালহা হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন, উম্মু সুলাইমের হাতে খঞ্জর? রাসূল (সা) বললেনঃ উম্মু সুলাইম খঞ্জর দিয়ে কি করবে? জবাব দিলেনঃ কেউ আমার দিকে এগিয়ে এলে এটা দিয়ে আমি আঘাত করবো। (হায়াতুস সাহাবা–১/৫৯৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অভিযানের সংখ্যা ছিল ২৬ অথবা ২৭টি। তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এমন অভিযানের সংখ্যা মাত্র ৯টি। যেমনঃ বদর, উহুদ, খন্দক, কুরায়জা, মুসতালিক, খাইবার, হুনাইন ও তায়িফ। আনাস এর সব ক'টিতে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি আনাসের ছেলে মূসাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার সম্মানিত পিতা কতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ আটটি যুদ্ধে। সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধটি বাদ দিয়েছিলেন। তার কারণ এই হতে পারে যে, সে সময় জিহাদে যাওয়ার যে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল, আনাস তার চেয়ে ছোট ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এ সময় ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে আনাসের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। (হায়াতুস সাহাবা–১/৫৩৭) খলীফা আনাসকে বাহরাইনে 'আমিলে সাদাকা'র পদে নিয়োগ দান করতে চান। এ ব্যাপারে 'উমারের পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন ঃ আনাস বুদ্ধিমান ও লেখাপড়া জানা মানুষ। তার জন্য যে খিদমতের প্রস্তাব আপনি করেছেন আমি তা সমর্থন করি। খলীফা আনাসকে ডেকে পাঠান এবং আমিলে সাদাকার দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে বাহরাইনে পাঠিয়ে দেন। (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, আল–ইসাবা–১/৭২) তিনি যখন বাহরাইন থেকে ফিরে আসেন তখন আবু বকর (রা) আর নেই। তাঁর স্থলে 'উমার (রা) খলীফা। তিনি বাহরাইন থেকে আনীত অর্থ থেকে চার হাজার দিরহাম আনাসকে দান করেন। আনাস বলেন ঃ আমি

সেই অর্থ পেয়ে মদীনাবাসীদের মধ্যে একজন অধিক অর্থশালী ব্যক্তি হয়ে যাই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২২)

আনাস আরও বলেন ঃ আবু বকরের (রা) মৃত্যুর পর 'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার হাতে নিলে আমি মদীনায় এসে তাঁকে বললাম ঃ দেখি, আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন। যে কথার ওপর আপনার পূর্ববর্তী বন্ধুর হাতে আপনি বাই'য়াত করেছিলেন সেই কথার ওপর আমি আপনার হাতে বাই'য়াত করবো। এভাবে তিনি 'উমারের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৫৮)

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইয়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্রসহ আনাসকে ইয়ামনেও পাঠান। সেই পত্রে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পড়ার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৪১, ৪৪২)

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বসরার গভর্ণর ছিলেন। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকরার (রা) নেতৃত্বে এক মারাত্মক অভিযোগ উথাপিত হয়। (দ্রঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯০-৪৯২) খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বরখাস্ত করে আবু মূসা আল-আশ'য়ারীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁর সহকারী হিসাবে আরও চার ব্যক্তিকে বসরায় পাঠান। তারা হলেন, ১. আনাস ইবন মালিক, ২. আনাসের ভাই আল-বারা' ইবন মালিক, ৩. ইমরান ইবনুল হুসাইন, ৪. আবু নাজীদ আল-খুযা'ঈ। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯১)

এই বসরা শহরে হযরত আনাস স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। খলীফা 'উমার (রা) যাঁদের ওপর এখানকার ফিকাহ ও ফাতওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁদের মধ্যে আনাস একজন। জীবনের বাকী অংশ তিনি এই বসরা শহরেই কাটিয়ে দেন। এখানে ফিকাহ ও ফাতওয়ার দায়িত্ব পালন ছাড়াও যখন যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি দক্ষতার সাথে তা পালন করেন। এই সময় পরিচালিত সকল অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 'তুসতার' অভিযানে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তুসতার বিজিত হয় এবং পারশ্য সেনাপতি হুরমুযানকে সপরিবারে বন্দী করে মুসলিম সেনাপতি আবু মূসা আল-আশয়ারীর (রা) সামনে হাজির করা হয়। হযরত আবু মূসা (রা) তিনশো সদস্যের একটি বাহিনীর হিফাজতে হুরমুযানকে মদীনায় খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেন। আনাস (রা) ছিলেন এ বাহিনীর আমীর এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। এভাবে দীর্ঘদিন পর প্রিয় জন্মভূমির যিয়ারত লাভের সুযোগ পান। (হায়াতুস সাহাবা-১/৬৬, দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০২)

কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করার পর আনাস আবার বসরায় ফিরে গেলেন। হিজরী ২৩ সনের জ্বিলহজ্জ মাসে হযরত 'উমার (রা) শাহাদাত বরণ করলে হযরত 'উসমান (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম কয়টি বছর খুবই শান্ত ছিল। তবে কিছুকাল পরে নানারকম ফিত্না ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চতুর্দিকে স্বার্থান্বেষী, হাঙ্গামাবাজ লোকেরা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

তখনও কিন্তু ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা কোন রকম বিদ্রোহ ও হুমকির পরোয়া করতেন না। সুতরাং মাজলুম খলীফার আর্ত চিৎকার সর্ব প্রথম এই সত্যের সৈনিকদের কানে পৌঁছে। তাঁরা তাঁর সাহায্যের জন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

ইরাকের রাজধানী বসরাতেও এমন লোকের অভাব ছিলনা। এমন ভয়াবহ অবস্থার খবর যখন সেখানে পৌছলো তখন আনাস ইবন মালিক, 'ইমরান ইবন হুসাইনসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বীনের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁরা বক্তৃতা-ভাষণের দ্বারা গোটা বসরাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের সাহায্য মদীনায় পৌছার পূর্বেই বিদ্রোহীদের হাতে খলীফা 'উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত 'উসমানের (রা) পর হযরত'আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁরও বিরুদ্ধে এক মস্ত বড় ফিত্না এই বসরাতেই মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর তাতে বিশিষ্ট সাহাবা-ই-কিরামও জড়িয়ে পড়েন। বসরা ছিল আনাসের আবাস স্থল। সেখানে তার বিশেষ প্রভাবও ছিল। কিন্তু তিনি সকল আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত না হয়, তিনি আরও বহু বিশিষ্ট সাহাবীর মত নির্জনতা অবলম্বন করেন। এ কারণে, হযরত আলী ও হযরত 'আয়িশার (রা) উটের যুদ্ধ, যা এই বসরার অনতি দূরে সংঘটিত হয়- তাতে কোন পক্ষে আনাসের (রা) কোন ভূমিকা দেখা যায় না। এসব ঘটনায় তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন।

হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতের পরেও হযরত আনাস বহুদিন জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে নানা রকম দৃশ্য ও অবস্থা অবলোকন করেন; কিন্তু সব সময় নির্জনতাকে প্রাধান্য দান করেন। কোন অবস্থাতেই নিজেকে জাহির করা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারেননি। খলীফা আবদুল মালিকের সময় উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। অত্যাচারী ও নিপীড়ক হিসেবে ইতিহাসে তিনি খ্যাতিমান। একবার তিনি বসরায় এসে আনাসকে ডেকে শাসান এবং জনগণের মাঝে হেয় করার জন্য তাঁর ঘাড়ে ছাপ মেরে দেন। ওয়াকিদী ইসহাক ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি এই ছাপ মারা অবস্থায় আনাসকে দেখেছি। (আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-১/৭২)

হাজ্জাজ ধারণা করেছিলেন, আনাস রাজনৈতিক বাতাস বুঝে কাজ করেন। তাই আনাসকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন ঃ ওহে খবীস! এটা একটা চালবাজি। আপনি মুখতার আস-সাকাফীর সাথেও থাকেন, আবার কখনও থাকেন ইবনুল আশ'য়াসের সাথে। আমি আপনাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। এমন কঠিন মুহূর্তেও আনাস নিজেকে আয়ত্বে রাখেন। শান্তভাবে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমীরকে সাহায্য করুন। আপনার শাস্তি কার জন্য? বললেন ঃ আপনার জন্য। হযরত আনাস চুপচাপ বাড়ী ফিরে এলেন এবং খলীফা 'আবদুল মালিকের নিকট হাজ্জাজের আচরণের বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি পড়ে 'আবদুল মালিক রাগে ফেটে পড়লেন। সাথে সাথে তিনি হাজ্জাজকে লিখলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি আনাসের বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা চাও, নইলে তোমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করা হবে। খলীফার চিঠি পেয়ে হাজ্জাজ তাঁর পরিষদবর্গসহ আনাসের খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি আনাসের নিকট আরও আবেদন জানান, তিনি যে হাজ্জাজকে ক্ষমা করেছেন, সেই কথা যেন খলীফাকে একটু জানিয়ে দেন। আনাস তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সেই মর্মে একটি চিঠি দিমাশ্কে পাঠিয়ে দেন। মূলতঃ ফিত্না ও বিশৃঙ্খলার ভয়ে আনাস এমন

কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৮, আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগিল আমানী-২২/২০৫, হায়াতুস সাহাবা-২/৬৪৭,৬৪৮)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) কর্তৃত্বের সময় হযরত আনাস কিছুদিনের জন্য বসরার ইমাম ছিলেন। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের সময় তিনি একবার দিমাশকে যান। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৩৯) তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি প্রথমে দিমাশকে যান এবং সেখান থেকে বসরায় পৌঁছেন। (আল-আ'লাম-১/৩৬৫)

হযরত আনাসের মৃত্যু সন ও মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৯৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল এক শো বছরের উর্দ্ধে। কারণ, হিজরাতের পূর্বে তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। (তাহজীবুল আসমা-১/১২৮, আল-আ'লাম-১/৩৬৫, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৫, উসুদুল গাবা-১/১২৮) মৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। দেখার জন্য ভক্ত-অনুরক্তদের ভীড় লেগেই থাকতো। দূর থেকে দলে দলে মানুষ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য আসতো। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর একান্ত শাগরিদ সাবিত নাবানীকে বলেন, আমার জিহবার নীচে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পবিত্র চুল রেখে দাও। পবিত্র চুল রাখা হলো। এ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেই অবস্থায় দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি লাঠি ছিল তাঁর কাছে। মৃত্যুর পূর্বে লাঠিটি কবরে তাঁর সাথে দাফনের নির্দেশ দিয়ে যান। সে নির্দেশ পালন করা হয়। (উসুদুল গাবা-১/১২৮, আল-ইসাবা-১/৭১, আল-ইসতীয়াব-১/৭৩) ইবন কুতায়বা 'আল-মা'য়ারিফ' গ্রন্থে বলেন, বসরার তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই এক শো বছর জীবন পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আনাস ইবন মালিক, আবু বাকরাহ্ ও খীলফা ইবন বদর (রা)। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৮)

হযরত আনাস ছিলেন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী বসরার শেষ সাহাবী। সম্ভবতঃ একমাত্র আবুত তুফাইল (রা) ছাড়া তখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। (আল-ইসাবা-১/৭১, আল-আ'লাম-১/৩৬৫, আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবা-১/৭৩) অবশ্য আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে বলেন ঃ 'কানা (আনাস) আখিরাস সাহাবাতি মাওতান'- আনাস মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।' সাহাবীদের মধ্যে দুনিয়া থেকে তিনিই সর্বশেষ বিদায় নেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) হযরত আনাস নিজেও শেষ জীবনে বলতেনঃ কিবলাতাইন বা দুই কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া এখন আর কেউ বেঁচে নেই। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৫)

পরিবারের সদস্য, ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ ছাড়াও আশ-পাশের লোকেরা তাঁর জানাযায় শরীক হন। কুতন ইবন মুদরিক আল-কিলাবী জানাযার নামায পড়ান। বসরার উপকণ্ঠে 'তিফ্' নামক স্থানে তাঁর বাসস্থানের পাশেই কবর দেওয়া হয়। (উসুদুল গাবা-১/১২৯)

হযরত আনাসের মৃত্যুতে গোটা মুসলিম উম্মাহ দারুণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবেও তেমন হওয়ার কথা। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। মাত্র দুই ব্যক্তি যাঁদেরকে দেখে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতো, তাঁদের একজন চলে গেলেন।

হযরত আনাসের ইনতিকালের পর 'মাওরিক' নামক এক তাবেঈ ব্যক্তি আফসোস করে বলেন ঃ 'আল-ইউয়াম জাহাবা নিসফুল 'ইলম- আজ অর্ধেক 'ইলম (জ্ঞান) চলে গেল।' লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ তা কেমন করে? বললেন ঃ আমার কাছে একজন প্রবৃত্তির অনুসারী লোক আসতো। সে যখন হাদীসের বিরোধিতা করতো, আমি তাঁকে আনাসের নিকট নিয়ে যেতাম। আনাস তাঁকে হাদীস শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করতেন। এখন কার কাছে যাব? (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৮, তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১)

আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে হযরত আনাসের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশী। আর এটা হয়েছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দু'আর বরকতে। এ সম্পর্কে আনাস বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) উম্মু সুলাইমের (আনাসের মা) বাড়ীতে এলেন। উম্মু সুলাইম খুরমা ও ঘি খেতে দিলেন। কিন্তু রাসূল (সা) সে'দিন সাওম পালন করছিলেন। তিনি বললেন ঃ এগুলি নিয়ে যাও এবং খুরমার পাত্রে খুরমা ও ঘিয়ের পাত্রে ঘি রেখে দাও। তারপর তিনি উঠে ঘরের এক কোণে গিয়ে দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি উম্মু সুলাইম ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। উম্মু সুলাইম 'আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু বিশেষ নিবেদন আছে। তিনি জানতে চাইলেন ঃ কী? বললেন ঃ এই আপনার খাদিম আনাস। আনাস বলেন ঃ তারপর রাসূল (সা) আমার জন্য এমন দু'আ করলেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণই বাদ দিলেন না। শেষের দিকে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান কর এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।' আনাস বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যে তিনটি জিনিসের জন্য দু'আ করেছিলেন, তার দুইটি আমি পেয়ে গেছি এবং বাকী একটির (জান্নাত) অপেক্ষায় আছি। আনাস আরও বলতেন ঃ 'আজ আনসারদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী ব্যক্তি আর কেউ নেই।' ঐতিহাসিকরা বলছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আর পূর্বে একটি মাত্র আংটি ছাড়া তিনি কোন সোনা বা রূপোর মালিক ছিলেন না। এভাবে রাসূল (সা) আনাস ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ চেয়ে বহুবার দু'আ করেছেন। (আল-ফাতহুর রাব্বানী- মা'য়া বুলুগিল আমানী-২২/২০৩, আল-ইসাবা-১/৭২, তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪২, ১৪৩)

মৃত্যুকালে হযরত আনাস মোট ৮২ (বিরাশি) জন ছেলে মেয়ে-রেখে যান। তাদের মধ্যে ৮০ (আশি) জন ছেলে এবং হাফসা ও উম্মু 'আমর নামে দুই মেয়ে। তাছাড়া নাতি-নাতনীর সংখ্যা ছিল আরও অনেক। (উসুদুল গাবা-১/১২৮) খলীফা ইবন খাইয়্যাত বলেন ঃ আনাস যখন মারা যান তখন তাঁর চারটি বাড়ী। একটি বসরার জামে মসজিদের সামনে, একটি ইসতাফানুস গলিতে এবং একটি বসরা থেকে দুই ফারসাখ দূরে। তাছাড়া আরও একটি বাড়ী ছিল। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১)

সন্তানদের প্রতি ছিল হযরত আনাসের দারুণ স্নেহ-মমতা। সব সময় যে তিনি বাড়ীতে থাকতেন- এই স্নেহ-মমতার প্রাবাল্যও তার একটি কারণ। ছেলে-মেয়েদের নিজেই শিক্ষা দিতেন। মেয়েদেরও হালকায়ে দারসে বসার অনুমতি ছিল। তাঁর কয়েকটি ছেলে হাদীস শাস্ত্রের শায়খ ও ইমাম রূপে স্বীকৃত হন। তাবেঈদের তাবকায় (শ্রেণী) তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। হযরত আনাসই তাদেরকে গড়ে তোলেন।

হযরত আনাস ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। সন্তানদেরও এর অনুশীলন করাতেন। ছেলেরা

প্রথমে নিশানা ঠিক করে তীর ছুড়তো। তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তিনি ছুড়তেন এবং সঠিকভাবে তা লক্ষ্যভেদ করতো। তীর ছোড়ার অনুশীলনী সেই প্রাচীন জাহিলিয়্যাতের সময় থেকেই আনসারদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একথা তাবারী উল্লেখ করেছেন। (উসূদুল গাবা–১/১২৮)

হযরত আনাসের পরিপূর্ণ হুলিয়া বা অবয়ব জানা যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি মধ্যম আকৃতির সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। চুল–দাড়িতে মেহেন্দীর খিযাব লাগাতেন। হাতে সব সময় হলুদ বর্ণের 'খালুক' নামক এক রকম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থকার বলেন ঃ সিংহের ছবি অঙ্কিত একটি আংটি হাতে পরতেন। বার্দ্ধক্যে সোনা দিয়ে দাঁত বেঁধেছিলেন। সুন্দর মিহি কাপড়ের পোশাক পরতেন। ছোট বেলায় মাথায় একটি জটা ছিল। রাসূল (সা) যখন মাথায় হাত দিতেন, সেই জটা স্পর্শ করতেন। পরে সেটি কেটে ফেলার ইচ্ছা করলে মা বললেন ঃ রাসূল (সা) এটি স্পর্শ করেছেন, সুতরাং কেটো না। (উসুদুল গাবা–১/১২৭, ১২৮) মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন।

তিনি ছিলেন দারুণ সৌখিন ও পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির একজন মার্জিত রুচির মানুষ। দুনিয়ার বিত্ত–বৈভবও তাঁর অনুকূলে সাড়া দেয়। এ কারণে তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। অতি যত্নে একটি উদ্যান তৈরী করেছিলেন, তাতে বছরে দুইবার ফল আসতো। সেখানে একটি ফুল ছিল যা মিশকের মত সুগন্ধি ছড়াতো। (আল–ইসাবা–১/৭১)

তিনি বসরার দুই ফারসাখ (মাইল) দূরে 'তিফ' নামক স্থানে একটি বাড়ী বানিয়ে বসবাস করতেন। এতে বুঝা যায়, নগর জীবনের চেয়ে পল্লীতে বাস করা বেশী পসন্দ করতেন। ভালো খাবার খেতেন। খাবার তালিকায় সব সময় রুটি ও শুরবা থাকতো। তিনি উদার প্রকৃতির ছিলেন। আহারের সময় ছাত্র বা অন্য কেউ কাছে থাকলে, আহারে শরীক করাতেন। সকালে নাশতা করতেন এবং তিন অথবা পাঁচটি খেজুর খেতেন। কথা খুব কম বলতেন। প্রয়োজন হলে কথা তিনবার করে বলতেন। কারও বাড়ীতে ঢুকবার আগে তিনবার অনুমতি চাইতেন। (মুসনাদ–৩/১২৮, ১৮০, ২২১, ২৩২) আত্মীয়–বন্ধুদের কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে কিছু না কিছু খাবার তাদের সামনে উপস্থিত করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। তিনি দাসীকে ডেকে বললেন ঃ রুটির সামান্য একটি টুকরো হলেও আমার বন্ধুদের জন্য নিয়ে এসো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ উত্তম নৈতিকতা জান্নাতের কাজ। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৮২)

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির ছিলেন। মানুষের সাথে উদারভাবে মিশতেন। ছাত্রদের সাথেও ছিলেন ভীষণ আন্তরিক। প্রায়ই বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আমরা বসা থাকতাম, তিনি আসতেন; কিন্তু তাঁর সম্মানে আমরা কেউই উঠে দাঁড়াতাম না। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে অধিকতর প্রিয় আমাদের আর কে হতে পারে? এর কারণ, রাসূল (সা) এ সব কৃত্রিমতা একটুও পসন্দ করতেন না।

সবরের গুণটি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। তিনি যে পর্যায়ের লোক ছিলেন, মুসলমানদের অন্তরে তার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর যে মর্যাদার কথা বলেছেন এবং খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) যে নৈকট্য তিনি লাভ করেছিলেন তাতে প্রতিটি মানুষ তাঁকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতো। তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত তাবেঈ সাবিত নাবানী ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে হযরত আনাসের দুই চোখের মাঝখানে চুমু দিতেন।

একবার আনাস আবুল 'আলিয়্যাকে একটি সেব দিলেন। সেবটি হাতে নিয়ে তিনি শুকতে, চুমু খেতে ও মুখে ঘষতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ এই সেবে এমন হাতের স্পর্শ লেগেছে যে হাত রাসূলের(সা)পবিত্র হাত স্পর্শ করেছে।(তারীখে ইবন'আসাকির–৩/১৪৪)কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও উমাইয়্যা শাসকদের অনেকের কাছে এর কোন গুরুত্বই ছিল না। এসব স্বেচ্ছাচারী দুষ্টমতিদের নেতা ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। তাঁর উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত আনাস তখন চরম ধৈর্য অবলম্বন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কারও সাথে এমন আচরণ করা হলে বসরায় আগুন জ্বলে যেত। তিনি কোন্ নীতি অবলম্বন করে এত ধৈর্য ধারণ করতেন? এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর নিজের কথার মধ্যে। তিনি বলতেন ঃ মুহাম্মাদের (সা) বিশিষ্ট সাহাবীরা আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের আমীরদেরকে গালাগালি করবেনা, তাঁদেরকে ধোকা দেবে না এবং তাঁদের অবাধ্য হবে না। আল্লাহকে ভয় করবে ও ধৈর্য ধারণ করবে। (হায়াতুস সাহাবা–২/৭২)

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভয়–ডর শূন্য দুঃসাহসী। খুব দৌড়াতে পারতেন। একবার 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে একটি খরগোশ তাড়া করে ধরে ফেলেন। অথচ তাঁর সমবয়সী ছেলেরা খরগোশটির পিছনে ধাওয়া করে ফিরে আসে। বড় হয়ে নিপুণ অশ্বারোহী ও দক্ষ তীরন্দাজ হন।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে আবার এমন একদল আছেন যাঁরা বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত। আনাস ছিলেন এই দলেরই একজন। তাঁর বর্ণনা সমূহ বিশ্লেষণ করলে নীচের মূলনীতিগুলি পাওয়া যায় ঃ

১. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে এসেছে ঃ 'আনাস ইবন মালিক হাদীস বর্ণনার সময় ভীত হয়ে পড়তেন। বর্ণনার শেষে বলতেন ঃ এই রকম অথবা এই যেমনটি রাসূল (সা) বলেছেন' মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার শেষে যে বলে থাকেন– 'আও কামা কালা–অথবা যেমন তিনি বলেছেন'– এবং আজকের যুগ পর্যন্ত যে ধারাটি অব্যাহত রয়েছে, তার প্রচলন হযরত আনাস থেকে। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৩/১৪৮)

২. যে হাদীস বুঝতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তিনি তা বর্ণনা করেননি।

৩. যে সকল হাদীস তিনি সাহাবীদের নিকট থেকে এবং যেগুলি খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিলেন এই দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানের সেবা বা খিদমাত হলো সেই জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো, হযরত আনাস এ ক্ষেত্রে কোন সাহাবী থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সারাটি জীবন তিনি অভিনিবেশ সহকারে ইলমে হাদীসের প্রচার–প্রসারে অতিবাহিত করেন। তিনি হাদীস শিক্ষা দানের আওতা থেকে কক্ষণও বাইরে যাননি। যে যুগে তাঁর সমসাময়িক সাহাবা যুদ্ধ–বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তখনও রাসূলুল্লাহর (সা) এই খাদিম দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে বসরার জামে মসজিদে বসে মানুষকে হাদীস শোনাতেন।

তাঁর জ্ঞানের প্রসারতা তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা দ্বারাই অনুমান করা যায়। তাঁর হালকায়ে দারসে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রের সমাবেশ ঘটতো। তাঁর সন্তান সংখ্যার মত ছাত্র সংখ্যাও অগণিত। হযরত আনাস হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে

এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রায় এক শো রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২২৮৬ (দুই হাজার দুই শো ছিয়াশি)। মুত্তাফাক আলাইহি–১৮০, বুখারী এককভাবে ৮০ এবং মুসলিম এককভাবে ৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছেলে এবং নাতীদের থেকেও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বসরার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু 'উমাইর 'আবদুল কাবীর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাফ্স ইবন হিশাম (২৯১ হিঃ) তাঁরই বংশধর। (দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–৩/৪০১) অবশ্য তাঁর বর্ণিত মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন–১৬৮, আবার কেউ বলেছেন–১২৮। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৪৫, তাহজীবুল আসমা–১/১২৭)

হযরত আনাস প্রথমতঃ রাসূলে পাকের (সা) সাহচার্যে থেকে ইল্ম হাসিল করেন। রাসূলের (সা) ওফাতের পর যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শোনেন তারা হলেন ঃ উবাই ইবন কা'ব, 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবু জার, আবু তালহা, মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সাবিত ইবন কায়েস, মালিক ইবন সা'সা', উম্মু সুলাইম (তাঁর মা), উম্মু হারাম (তাঁর খালা), উম্মুল ফাদল (হযরত 'আব্বাসের স্ত্রী), আবু বকর, 'উমার, 'উসমান (রা) প্রমুখ। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৪৪)

হযরত আনাসের ছাত্র ও শাগরিদদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে যাঁরা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন এখানে তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা গেল ঃ হাসান বসরী, ইবন শিহাব যুহরী, সুলাইমান তায়মী, আবু কিলাবা, ইসহাক ইবন আবী তালহা, আবু বকর ইবন 'আবদিল্লাহ মুযানী, কাতাদাহ, সাবিত নাবানী, হুমাইদ আতত্বাবীল, সুমামাহ্ ইবন 'আবদিল্লাহ, (আনাসের পৌত্র) জা'দ, আবু 'উসমান, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন আনসারী, আনাস ইবন সীরীন আযহারী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, রাবী'য়াতুর রায়, সা'ঈদ ইবন জুবাইর এবং সুলাইমান ওয়ারদান রাহিমাহুমুল্লাহ। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৪৫)

ইলমে হাদীসের মত ফিকাহ শাস্ত্রেও হযরত আনাসের পান্ডিত্য ছিল। ফকীহ সাহাবীদেরকে তিনটি তাবকা বা স্তরে ভাগ করা হয়। আনাসের স্থান দ্বিতীয় স্তরে। তাঁর ইজতিহাদ ও ফাতওয়াসমূহ সংকলিত হলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের রূপ লাভ করতে পারে। হযরত 'উমার (রা) ফকীহ সাহাবীদের একটি দলের সাথে তাঁকে বসরায় পাঠান। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

সাহাবীদের যুগে শিক্ষাদান সাধারণতঃ হালকা–ই–দারসের মধ্যেই সীমিত ছিল। হযরত আনাসও এই হালকার পদ্ধতিতেই দারস দিতেন। কোন ছাত্র প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিতেন। তাঁর দারসের এ ধরনের সাওয়াল–জাওয়াবের একটি সংকলন আছে। এখানে কয়েকটি মাসয়ালা উদ্ধৃত হলো যার মাধ্যমে তাঁর ইজতিহাদ পদ্ধতি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, স্বচ্ছ বোধশক্তি, সঠিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

বিশেষ কয়েকটি বরতনে নাবীজ (আংগুর বা খেজুরের রস) পান করা মাকরূহ। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত। হযরত আনাস স্পষ্ট করে তার কারণগুলির প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন।

একবার কাতাদাহ জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়া বা কলসে কি নাবীজ বানানো যায়? আনাস

বললেন ঃ যদিও রাসূলে কারীম (সা) এ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করে যাননি, তবুও আমি মাকরূহ মনে করি। কারণ, যে জিনিসের হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ আছে, তাতে হারাম হওয়ার দিকটিই প্রাধান্য পাবে।

একবার মুখতার ইবন ফিলফিল জানতে চাইলেন, কোন্ কোন্ পাত্রে নাবীজ পান করা উচিত নয়? বললেন, যাতে নেশা হয় তা সবই হারাম। মুখতার বললেন, কাঁচ অথবা আলকাতরার পাত্রে কি পান করা যায়? বললেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ মানুষ যে মাকরূহ মনে করে? বললেন ঃ যাতে সন্দেহ হয় তা পরিহার কর। তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হলো ঃ নেশা হয় এমন জিনিস তো হারাম; কিন্তু এক দুই ঢোক পানে আপত্তি কি? আনাস বললেন ঃ যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম। দেখ–আংগুর, খুরমা,গম, যব ইত্যাদি থেকে মদ তৈরী হয়। তার মধ্যে যে জিনিসে নেশা সৃষ্টি হয় তা মদ হয়ে যায়।

হযরত আনাস যদিও সুন্দরভাবে এই মাস'য়ালাটি বর্ণনা করেছেন; তবুও এর আরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) পান ও পানীয় সম্পর্কে যে বিধি–বিধান দান করেছেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক শরাব বা পানীয় যা নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম। সাহীহাইনে হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই খমর এবং প্রত্যেক খমর (মদ) হারাম। ইবন 'উমার (রা) থেকে সাহীহ মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩. 'যে সব জিনিসের বেশী পান করলে নেশা হয় তার অল্প একটুও হারাম।' (সুনানু ইবন 'উমার)। এর মধ্যে প্রথম হাদীসটির মর্ম হলো, যে সকল পানীয়ের মধ্যে নেশা বা মাদকতা এসে যায় তা হারাম। দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই খমর, আর প্রত্যেক খমরই হারাম। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায়; প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। তৃতীয়টির অর্থ হলো ঃ যে সব জিনিসের বেশী পান করলে নেশা হয় তার অল্প একটুও হারাম। হযরত আনাস (রা) তাঁর উপরোক্ত জবাবে এই কথাটিই বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো বিশেষ কয়েকটি পাত্রে নাবীজ পান করতে নিষেধ করা হয়েছে কেন? এর প্রকৃত রহস্য এই যে, আধুনিক বিশ্ব মদ তৈরী ও সংরক্ষণের জন্য সুন্দর কাঁচের যে সব পাত্র আবিষ্কার করেছে, তৎকালীন আরবে তা ছিলনা। সেখানে সাধারণভাবে লাউ–এর খোল ও সুরাহী বোতলের কাজ দিত। অথবা এ জাতীয় আরও কয়েকটি পাত্র ছিল যা প্রাকৃতিক ফল শুকিয়ে ও সাফ করে মদের কাজে ব্যবহার করা হতো। ঐ সব পাত্রে মদ রাখলে স্বাভাবিকভাবেই তাতে মদের ক্রিয়া পড়তো, আর তা ধোয়ার পরেও দূর হতো না। ইসলামের প্রথম যুগে যখন মদ হারাম হয় তখন এইসব পাত্রের ব্যবহার হারাম হওয়ার প্রকৃত রহস্য এটাই। অবশ্য পরবর্তীকালে এ জাতীয় পাত্র যাতে মদ রাখা হয়নি, তার ব্যবহার জায়েয হতে পারে। কিন্তু হিজরী প্রথম শতকের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত মুসলমানরা ধারণা করে যে, ঐ সব পাত্র ব্যবহার করলে শরাব পানের কথা নতুন করে মানুষের স্মরণ হতে পারে।

একবার এক ব্যক্তি হযরত আনাসকে প্রশ্ন করলো ঃ রাসূল (সা) কি জুতো পরে নামায

আদায় করতেন? বললেন ঃ হাঁ। জুতো পরে নামায আদায় করা যায়। তবে শর্ত হলো, পাক হতে হবে, নাজাসাত থেকে পরিষ্কার হতে হবে। কেউ নতুন জুতো পরে নামায পড়লে ক্ষতি নেই।

একবার ইয়াহইয়া ইবন ইয়াযীদ হান্নায়ী প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযে কখন কসর করা উচিত? বললেন ঃ আমি যখন কুফা যেতাম, তখন কসর করতাম। আর রাসূল (সা) তিন মাইল বা তিন ফারসাখ পথ চলার পর কসর করেছিলেন। হযরত আনাসের কথার অর্থ এই নয় যে, তিন মাইল সফর করলেই কসর করতে হবে। বরং প্রকৃত ঘটনা হলো, রাসূল (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথে সর্বপ্রথম জুলহুলায়ফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সাহীহ বর্ণনা মতে, তা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। আর এ জন্যই তিনি সেখানে কসর আদায় করেন।

মুখতার ইবন ফিলফিল একবার প্রশ্ন করলেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে? আনাস বললেন ঃ বসে বসে।

'আবদুর রহমান ইবন দারদান এবং তাঁর সাথে আরও কিছু লোক মদীনায় আনাসের কাছে আসলেন। আনাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি 'আসরের নামায আদায় করেছ? তাঁরা বললেনঃ হাঁ। তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করলো ঃ রাসূল (সা) 'আসরের নামায পড়তেন কোন সময়? বললেন ঃ সূর্য তখনও উজ্জ্বল ও উপরে থাকতো।

একবার তিনি একটি জানাযার নামায পড়ালেন। জানাযাটি ছিল পুরুষের। এজন্য মাইয়্যেতের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। একবার এক মহিলার জানাযা আনা হলো। এবার তিনি কোমর সোজা দাঁড়ালেন। 'আলা ইবন যিয়াদ 'আদাদীও সেই নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুইটি জানাযায় দুই রকম দাঁড়ানোর কারণ জানতে চাইলেন। আনাস বললেন ঃ রাসূল (সা) এমনটিই করতেন। 'আলা' সমবেত লোকদের বললেন ঃ ওহে, তোমরা কথাটি মনে রেখ।

একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ হযরত 'উমার (রা) রুকু'র পরে কুনূত পড়েছিলেন? বললেন ঃ হাঁ। রাসূল (সা) ও পড়েছিলেন। তবে এটা হযরত আনাসের নিজস্ব মতামত। কারণ, সাহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) এবং সাধারণভাবে প্রায় সকল সাহাবা 'বিতর' নামাযে রুকু'র পূর্বে কুনূত পড়তেন। এই মাস'য়ালায় ইমাম শাফে'ঈ হযরত আনাসের অনুসারী। তিনি নিজের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হলো, হযরত 'আলীও রুকু'র পরে কুনূত পড়তেন। কিন্তু হাদীসটি মুনকাতা'ও দুর্বল সনদ বিশিষ্ট।

তাছাড়া ইবন মুনজির 'আল-আশরাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, আনাস এবং অমুক অমুক সাহাবী থেকে বর্ণিত যে সকল হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে, তার প্রত্যেকটিতে রুকু'র পূর্বে কুনূত পড়ার কথা এসেছে। আর এটাই সঠিক। কারণ, সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে আনাস থেকে যে সকল রিওয়ায়াত এসেছে তাতে এই মাসয়ালার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'আসিম হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুনূত রুকু'র পূর্বে না পরে পড়া উচিত? বললেন ঃ রুকু'র পূর্বে। 'আসিম বললেন ঃ মানুষের তো ধারণা রাসূল (সা) রুকু'র পরে পড়তেন। আনাস বললেন ঃ সে একটা সাময়িক ঘটনা। কয়েকটি গোত্র মুরতাদ হয়ে যায় এবং বেশ কিছু সাহাবাকে হত্যা করে। এজন্য হযরত রাসূলে কারীম (সা) একমাস রুকু'র পরে কুনূত পড়ে তাদের ওপর বদ দু'আ করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ- ৩/১০০, ১১২, ১১৮,১২৬, ১২৯, ২০৪, ২০৯)

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম হযরত আনাস কেমন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইজতিহাদী মাসয়ালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অন্যান্য সাহাবার ইজতিহাদের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য তা সঠিক। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার-১/১৩৭-১৪২)

হযরত আনাসের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যকে আরও শোভা দান করেছিল, হুব্বে রাসূল, ইত্তেবা-ই-সুন্নাত, আমর বিল মা'রূফ ও হক কথা বলা- এগুলিই হলো সেই বৈশিষ্ট্য। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসার চিত্র তো আমরা তুলে ধরেছি। তিনি যখন মাত্র দশ বছরের এক অবুঝ বালক তখনই রাসূলের (সা) প্রতি এত গভীর মুহাব্বত যে, প্রতিদিন প্রত্যুষে রাসূলের (সা) দীদার লাভে তাঁর চোখ দুটি ধন্য হতো। সেই সুবহে সাদিকের পূর্বে রাতের অন্ধকারে উম্মু সুলাইমের এই ছেলে শয্যা ত্যাগ করে তাঁর হাবীবের অজুর পানির বন্দোবস্ত করার জন্য মসজিদে নববীর পথ ধরতেন। যৌবনে তাঁর এই ভালোবাসার কোন সীমা ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) একটিমাত্র দৃষ্টি আনাসের জন্য চরম আনন্দ ও প্রশান্তি বয়ে নিয়ে আসতো। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যদিও তিনি বাহ্যতঃ তাঁর দীদার থেকে বঞ্চিত হন, তবুও প্রায়ই স্বপ্নে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে মানুষের কাছে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা যখন তিনি স্মরণ করতেন তখন বড় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক ও দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন শুধু উদাস চাহনিতে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশার সেই সৌভাগ্যে ভরা দিনগুলির কথা স্মরণ করতে লাগলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতের কথা বলতেন, তখন দেখা যেত অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেছে। অবলীলাক্রমে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছেঃ কিয়ামতের দিন আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হবো তখন বলবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সেই নিকৃষ্ট খাদিম আনাস উপস্থিত।

হযরত আনাসের প্রতিটি মজলিস হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ঘটনাবলী স্মরণে ভরপুর থাকতো। নবুওয়াতের সময়কালের ঘটনাবলী ছাত্র ও ভক্তদের কাছে বর্ণনা করতেন। এই বর্ণনার মধ্যেই অন্তরে একটা প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতেন এবং তাতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি বাড়ী ফিরে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল জিনিস তাঁর কাছে ছিল তা বের করে বার বার দেখতেন এবং মনকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর ছাত্রদের সকলের মধ্যে এই রাসূল-প্রেমের প্রভাব পড়েছিল। সাবিত ছিলেন হযরত আনাসের অন্যতম ছাত্র। তিনি একেবারেই উস্তাদের রংগে রংগিত ছিলেন। তিনি উস্তাদের নিকট সব সময় নবুওয়াতী যুগ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। একদিন প্রশ্ন করলেন, আপনি কি হযরতের পবিত্র হাত স্পর্শ করেছেন? আনাস বললেন ঃ হাঁ। অথবা তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাত অপেক্ষা অধিকতর কোমল হাত আর কক্ষণও স্পর্শ করিনি। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৪) একথা শুনে সাবিতের অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি উস্তাদকে বললেন ঃ আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন, একটু চুমু দিই।

প্রকৃত ভালোবাসার দাবী হলো প্রিয়জনের প্রতিটি জিনিস ও আচরণই পছন্দ করা। হযরত আনাস তা করতেন। তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনাও একথা প্রমাণ করে। আনাস বলেন ঃ

একবার এক দর্জি রাসূলকে (সা) আহারের দা'ওয়াত দিল। আমিও সাথে গেলাম। যবের রুটি এবং শুকনো গোশত ও লাউ–এর তরকারি উপস্থিত করা হলো। আমি দেখলাম, রাসূল (সা) বেছে বেছে লাউ খাচ্ছেন। সেইদিন থেকে আমি লাউ খেতে ভালোবাসি। (হায়াতুস–সাহাবা–২/১৯০)

আনাস বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলো ঃ কিয়ামত কখন হবে? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বললো ঃ কিছুই না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করি। রাসূ ল (সা) বললেন ঃ তুমি যাদের ভালোবাস তাদের সাথেই থাকবে। আনাস বলেন ঃ সেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথায় আমরা দারুণ খুশী হয়েছিলাম। আমি—নবী (সা), আবু বকর ও 'উমারকে ভালোবাসি এবং আশা করি এই ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাঁদের সাথেই থাকবো। (হায়াতুস সাহাবা–২/৩১৮)

কালিমা তাওহীদের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন নামায। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যে খুশু'–খুদু' (ভয় ও বিনয়) ও আদবের সাথে নামায আদায় করতেন সাহাবীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করতেন। বহু সাহাবীর নামায তো ছিল প্রায় রাসূলে পাকের (সা) নামাযের কাছাকাছি। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে আনাসের নামাযের সাদৃশ্য ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। একবার তো হযরত আবু হুরাইরা (রা) আনাসকে (রা) নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন, আমি ইবন উম্মে সুলাইমের (আনাস) নামায অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ আর কারও নামায দেখিনি।

নামায ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথা ও কাজ সাহাবায়ে কিরামের সামনে ছিল। হযরত আনাস দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন। এই সময় কালে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কাজ আনাসের নিকট গোপন থাকতে পারে না। রাসূল (সা) যা কিছু বলতেন অথবা 'আমলের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত করতেন তার সবই আনাস স্মৃতিতে ধরে রাখতেন এবং সেই অনুযায়ী 'আমল করতেন। একবার খলিফার আমন্ত্রণে তিনি দিমাশকে গেলেন। ফেরার পথে 'আইনুত তামার' নামক স্থানে যাত্রা বিরতির ইচ্ছা করলেন। ছাত্র ও ভক্তদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল। তারা নির্ধারিত দিনে উক্ত স্থানে সমবেত হলো, লোকালয়ের বাইরে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়ে তাঁর উট এগিয়ে আসছিল। তখন ছিল নামাযের সময়। লোকেরা দেখলো, তিনি উটের পিঠে নামাযরত; কিন্তু উটটি কিবলামুখী নয়। ছাত্ররা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এ কেমনভাবে নামায আদায় করছিলেন? হযরত আনাস বললেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সা) এভাবে নামায আদায় করতে না দেখতাম, কক্ষণও আদায় করতাম না।

একবার ইবরাহীম ইবন রাবীয়া' হযরত আনাসের নিকট আসলেন। হযরত আনাস একখানা কাপড়ের একপাশ পরে অন্য পাশ গায়ে জড়িয়ে নামাযে মশগুল ছিলেন। নামায শেষ হলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এভাবে এক কাপড়ে নামায পড়েন? আনাস বললেন ঃ হাঁ, আমি এভাবে রাসূলকে (সা) নামায পড়তে দেখেছিলাম। উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের সর্বশেষ নামায– যে নামায হযরত আবু বকরের (রা) পিছনে পড়েছিলেন, তা এক কাপড়েই ছিল। (মুসনাদ – ৩/১৫৯)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র জীবনের প্রতিটি আচরণ ও পদক্ষেপ ছিল হযরত আনাসের জীবন পথের দিশারী। ফরজ ছাড়াও ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহেও রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি ছোট–বড় সকলকে সালাম করতেন। সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলতেন, আমাকে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আনাস, তুমি যখন ঘর থেকে বের হবে, তারপর যার সাথে দেখা হবে, সকলকে সালাম করবে। এতে তোমার নেকী বা মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। আর সম্ভব হলে সব সময় অজু অবস্থায় থাকবে। কারণ, তুমি জান না তোমার মৃত্যু কখন আসবে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৬৪)

প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী প্রয়োজন। হযরত আনাস ছিলেন একজন বিত্তশালী রয়িস বা নেতা। যতগুলি জানোয়ার ইচ্ছা, কুরবানী করতে পারতেন। কিন্তু 'খায়রুল কুরূন'– সর্বোত্তম যুগের লোকদের নিকট নাম–কামের চেয়ে রাসূলের (সা) পায়রুবী ও অনুসরণ ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। সে যুগের লোকেরা খ্যাতির জন্য নয়; বরং সাওয়াবের জন্যই কুরবানী করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) দুইটি পশু কুরবানী করতেন, এই জন্য হযরত আনাসও দুইটিই করতেন।

উমাইয়্যা শাসন আমলে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (র) যুবরাজ থাকাকালে একবার মদীনার গভর্ণর ছিলেন। যেহেতু শাহী খান্দানের সদস্য ছিলেন, এ কারণে জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল না। সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী নিজেই নামাযের ইমামতি করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিছু ভুল–ত্রুটিও হয়ে যেত। হযরত আনাস প্রায়ই তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন। তিনি একবার হযরত আনাসকে বললেন, আপনি এভাবে আমার বিরোধিতা করেন কেন? হযরত আনাস বললেন ঃ আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামায পড়তে দেখেছি আপনি যদি সেইভাবে নামায পড়ান তাহলে আমি সন্তুষ্ট হবো। অন্যথায় আপনার পিছনে নামায আদায় করবো না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন বুদ্ধিমান ও সৎ স্বভাব–বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত আনাসের কথায় তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি আনাসকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিছুদিন তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এমন সুন্দর নামায পড়াতে লাগলেন যে, খোদ আনাসই বলতে লাগলেন, এই ছেলের নামাযের চেয়ে আর কারও নামায রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৩৩, ১৩৪)

একবার খলীফা 'আবদুল মালিক হযরত আনাসসহ আরও চল্লিশজন আনসারী ব্যক্তিকে দিমাশ্‌কে ডেকে পাঠান। সেখান থেকে ফেরার পথে 'ফাজ্জুন নাকাহ' নামক স্থানে পৌঁছলে আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। যেহেতু সফর তখনও শেষ হয়নি, এই কারণে হযরত আনাস দুই রাকা'য়াত নামায পড়ান (কসর করেন)। তবে কিছু লোক আরও দুই রাকা'য়াত পড়ে চার রাকা'য়াত পুরো করেন। একথা হযরত আনাস জানতে পেরে দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ যখন কসরের অনুমতি দিয়েছেন তখন এ সুবিধা গ্রহণ করবে না কেন? আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে। আসলে তারা দ্বীনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে থাকবে গাফিল।

সত্যকথা বলা এবং সত্যকে পছন্দ করা ছিল হযরত আনাসের চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। খিলাফতে রাশেদার প্রথম দুই খলীফার পর এমন অনেক যুবক সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় যারা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এজন্য তাদের

অনেক কাজই কুরআন–সুন্নাহর পরিপন্থী হতো। যে সাহাবায়ে কিরাম জীবনের বিনিময়ে ইসলাম খরীদ করেছিলেন তাঁরা এটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা ভয়–ভীতির উর্ধ্বে উঠে সব সময় সত্য কথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। হযরত আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু স্বৈরাচারী শাসকের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যারা প্রকাশ্যে শরীয়াতের প্রতি অবহেলা করতো। হযরত আনাস এ অবস্থায় চুপ থাকেননি। তিনি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে তাদের সতর্ক করে দিতেন।

ইয়াযীদের সময়ে আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন ইরাকের গভর্ণর। তাঁর নির্দেশে হযরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা সামনে আনা হলে তিনি হাতের ছড়িটি দিয়ে হযরত হুসাইনের চোখে টোকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অশালীন কটাক্ষ করেন। হযরত আনাস নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ এই চেহারা রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়্যা রাজবংশের বিখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস–সাকাফী নিজের ছেলেকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চায়। হাদীস শরীফে বিচারক অথবা আমীরের পদের আকাঙ্খী হবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই হযরত আনাস হাজ্জাজের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেন ঃ এমনটি করতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

উমাইয়্যা শাসকদের আর এক আমীর হাকাম ইবন আইউব। তাঁর নৃশংসতা মানুষের সীমা অতিক্রম করে জীব–জন্তু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একবার হযরত আনাস তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, মুরগীর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হচ্ছে। তীর লাগলে মুরগীটি ছটফট করছে। হযরত আনাস এ দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং মানুষকে তাদের এ কাজের জন্য ধিক্কার দিলেন। (সাহীহ মুসলিম–২/১৫৮)

একবার কিছু লোক জুহরের নামায আদায় করে হযরত আনাসের সাক্ষাতের জন্য আসে। তিনি তখন চাকরের নিকট অজুর পানি চাইলেন। লোকেরা জানতে চাইলো, এ কোন নামাযের প্রস্তুতি? বললেন ঃ 'আসর নামাযের। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমরা তো এখনই 'জুহর' পড়ে এলাম। হযরত আনাস আমীর উমরাহের দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা এবং জনগণের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন ঃ এ তো হবে মুনাফিকদের নামায। মানুষ বেকার বসে থাকবে, তবুও নামাযের জন্য উঠবে না। যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকবে তখন খুব তাড়াতাড়ি মোরগের মত চারটি ঠোকর মেরে দেবে। সেই ঠোকরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে অতি অল্পই।

প্রকৃত দ্বীনদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আমর বিল মা'রূফ'– সৎ কাজের আদেশ দান করা। আর এজন্যই কুরআন মজীদে উম্মাতে মুসলিমাকে সর্বোত্তম উম্মাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আনাসের মধ্যে এই গুণটির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। একবার 'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের একটি মজলিসে হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। উবাইদুল্লাহ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। একথা হযরত আনাসের কানে গেল। তিনি সরাসরি উবাইদুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ তোমার এখানে কি 'হাউজে কাওসার' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল? বললেন ঃ হাঁ। কেন, রাসূল (সা) কি এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন? হযরত আনাস (রা) হাউজে কাওসার সম্পর্কে রাসূলের (সা) হাদীস তাঁকে শুনিয়ে

ফিরে আসেন।

হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) একজন আনসারী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট পেলেন। এই অপরাধের জন্য তিনি লোকটিকে পাকড়াও করার চিন্তা করলেন। লোকেরা হযরত আনাসকে কথাটি জানালেন। তিনি সোজা মুস'য়াবের কাছে গিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য আমীরদের অসীয়াত করেছেন। তাদের ভালো লোকদের সাথে উত্তম আচরণ এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করতে বলেছেন। এই হাদীস শুনা মাত্র মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) খাট থেকে নীচে নেমে এসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশের স্থান আমার চোখের ওপর। আমি লোকটিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সাবিত আন-নাবানী বলেন ঃ একদিন আমি বসরার 'যাবিয়া' নামক স্থানে আনাসের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় আজান শোনা গেল। সাথে সাথে আনাস মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলেন এবং এভাবে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বলতে পার কেন আমি এভাবে হেঁটে মসজিদে এলাম? তারপর নিজেই বললেন ঃ নামাযের জন্য আমার পদক্ষেপ যাতে বেশী হয়, সেই জন্য। (হায়াতুস সাহাবা- ৩/১০৪)

হযরত আনাস 'ইলম হাসিলের চেয়ে অর্জিত 'ইলম অনুযায়ী 'আমলের ওপর বেশী জোর দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যত ইচ্ছা 'ইলম বা জ্ঞান হাসিল কর। তবে আল্লাহর কসম, 'আমল না করলে সে সব 'ইলমের প্রতিদান দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলতেন ঃ প্রকৃত 'আলেমের কাজ বুঝা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর মূর্খদের কাজ শুধু বর্ণনা করা। (হায়াতুস সাহাবা- ৩/২৪১, ২৪৪)

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে আমার সুন্নাত ছেড়ে দেবে সে আমার উম্মাতের কেউ নয়। তিনি আরও বলেছেন ঃ যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। (হায়াতুস সাহাবা- ১/৩৫)

হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যেমন ঃ জুতো, একটি চাদর, একটি পিয়ালা, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি ইত্যাদি। আনাস বলতেন ঃ আমার মা উম্মু সুলাইম মৃত্যুকালে আমার জন্য রেখে যান রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চাদর, একটি পিয়ালা যাতে তিনি পানি পান করতেন, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি এবং একটি শীলা যার ওপর আমার মা রাসূলুল্লাহর (সা) ঘাম মিশিয়ে সুগন্ধি পিষতেন। (তারিখে ইবন আসাকির- ৩/১৪৪, ১৪৫)

এভাবে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সম্পর্কে টুকরো টুকরো তথ্য হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ এবং মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকরও বটে। ■

আবু দারদা (রা)

ডাক নাম আবু দারদা। কন্যা দারদার নাম অনুসারে এ নাম এবং ইতিহাসে এ নামেই খ্যাত। আসল নামের ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে। যথা ঃ 'আমির ও 'উয়াইমির । আল-আসমা'ঈর মতে, 'আমির, তবে লোকে 'উয়াইমির বলতো। আর এটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কেউ বলেছেন, 'উয়াইমির তাঁর লকব বা উপাধি। পিতার নামের ব্যাপারেও বিস্তর মত পার্থক্য আছে। যথাঃ মালিক, 'আমির, সা'লাবা, আবদুল্লাহ, যায়িদ ইত্যাদি। মায়ের নাম মুহাব্বাত বা ওয়াকিদাহ্। (তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১৫৬; আল-ইসাবা-২/৪৫; উসুদুল গাবা-৫/১৮৫; আল-ইসতী'য়াবঃ পার্শ্ব টীকা: আল-ইসাবা-৪/৫৯) মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'বালহারিস' শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) সমবয়সী বা কিছুদিনের ছোট। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)-১/৮০০)

তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অশ্বারোহী ও বিচারক। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন মদীনার একজন সফল ব্যবসায়ী। তারপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি ছিলাম ব্যবসায়ী। তারপর যখন ইসলাম এলো, আমি আমার ব্যবসা ও ইবাদাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা সমন্বিত হলো না। সুতরাং আমি ব্যবসা ছেড়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করলাম।' (আজ-জাহাবীঃ তারীখুল ইসলাম-২/১০৭; আল-আ'লাম-৫/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-২/২৯৬) শেষে ব্যবসার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় বলতেন, এখন যদি আমার মসজিদে নববীর সামনে একটি দোকান থাকে, প্রতিদিন তাতে ৪০ দীনার করে লাভ হয় এবং তা সাদাকা করে দিই, আর এ জন্য নামাযের জামা'য়াতও ফাওত না হয়- তবুও এমন ব্যবসা এখন আমার পসন্দ নয়। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেনঃ শেষ বিচার দিনের কঠিন হিসাবের ভয়। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫; হায়াতুস সাহাবা-২/২৯৬; আল-হুলায়্যা-১/২০৯) ইসলাম গ্রহণের পর বীরত্ব, খোদাভীরুতা ও পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীনতার জন্য সাহাবাকুলের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। (আল-আ'লাম-৫/২৮১; আল-ইসাবা-২/৪৫)

আবু দারদার বীরত্ব, অশ্বারোহণ ও বিজ্ঞতার স্বীকৃতি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বাণীতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞতা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'উয়াইমির হাকীমু উম্মাতি- 'উয়াইমির- আমার উম্মাতের একজন মহাজ্ঞানী হাকীম। তাঁর অশ্বারোহণ সম্পর্কে বলেছেনঃ নি'মাল ফারিসু 'উয়াইমির- 'উয়াইমির একজন চমৎকার অশ্বারোহী। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৮; আল-ইসাবা-২/৪৪; আল-ইসতীয়াবঃ আল-ইসাবার টীকা-৪/৬০) তাঁর বিজ্ঞতাসূচক অনেক বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার কিছু অংশ 'আল-ইসতীয়াব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। (টীকা আল-ইসাবা-২/১৭) এ কারণে ইমাম ইবনুল জাযারী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ 'কানা মিনাল 'উলামা আল-হুকামা'- তিনি ছিলেন বিজ্ঞ জ্ঞানীদের একজন। (আল-আ'লাম-৫/২৮১)

সা'ঈদ ইবন 'আবদুল আযীয বলেনঃ আবু দারদা বদর যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৯) আবার অনেকে বলেছেন বদর যুদ্ধের পর। (শাজারাতুজ জাহাব-৫/৩৯) আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার বলেনঃ তিনি তাঁর পরিবারের সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে একজন ভালো মুসলিমে পরিণত হন। (টীকা-আল-ইসাবা-৪/৫৯) জুবাইর ইবন নুফাইর বলেন, রাসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ আমাকে আবু দারদার ইসলামের অঙ্গীকার করেছেন। জুবাইর বলেনঃ অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৯)

এ খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এত বড় বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্য শ্রেষ্ঠ আনসারদের সাথে ইসলাম গ্রহণ না করে হিজরী দ্বিতীয় সন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এর একমাত্র কারণ, তার ইসলাম গ্রহণ অন্যের দেখাদেখি নয়; বরং ভেবে-চিন্তে ও জেনেশুনে ছিল। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর এক বছর পর্যন্ত তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভালো মত খোঁজখবর নেন। তবে এই একটি বছর পেছনে পড়ার কারণে সারা জীবন অনুশোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রায়ই বলতেনঃ এক মুহূর্তের প্রবৃত্তির দাসত্ব দীর্ঘকালের অনুশোচনার জন্ম দেয়।

জাহিলী যুগে প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) সাথে আবু দারদার গভীর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিল। আবদুল্লাহ আগে ভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু আবু দারদা পৌত্তলিকতার ওপর অটল থাকেন। তবে আবদুল্লাহর সাথে সম্পর্ক পূর্বের মতই বজায় রাখেন। আবদুল্লাহও বন্ধুকে ইসলামের মধ্যে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। তিনি আবু দারদাকে বারবার ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁরই চেষ্টায় আবু দারদা মুসলমান হন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

'সেদিন আবু দারদা 'উয়াইমির প্রত্যূষে ঘুম থেকে জেগে তাঁর প্রতীমাটির কাছে গেলেন। সেটি থাকতো বাড়ীর সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে। প্রথমে তার প্রতি আদাব ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। নিজের বিশাল দোকানের সর্বোত্তম সুগন্ধ তেল তার গায়ে ভালো করে মালিশ করলেন। তারপর গতকালই ইয়ামন থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী তাঁকে যে একখানি উৎকৃষ্ঠ রেশমী কাপড় উপহার দিয়েছেন তাই দিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রতীমাটি ঢেকে রাখলেন। অতঃপর একটু বেলা হলে তিনি দোকানের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যাওয়ার পথে তিনি দেখলেন, মদীনার রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি সর্বত্রই মুহাম্মাদের (সা) সংগী-সাথী গিজ গিজ করছে। তারা দলে দলে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরছেন। আর তাঁদের আগে আগে চলছে কুরাইশ বন্দীরা। তিনি তাঁদের এড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ খাযরাজ গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে এসে পড়লো। তিনি যুবকের কাছে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কুশল জিজ্ঞেস করলেন। যুবক বললেন, বদরে তিনি দারুণ যুদ্ধ করেছেন এবং গণীমতের মাল নিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরেছেন। আবু দারদা দোকানে গিয়ে বসলেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বদর থেকে ফিরে তাঁর ভাই আবু দারদার বাড়ীতে গেছেন তার সাথে দেখা করতে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দেখলেন, আবু দারদার স্ত্রী বসে বসে চুলে চিরুনী করছেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু দারদা

কোথায়? স্ত্রী বললেনঃ আপনার ভাই তো এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। এ কথা বলে আবদুল্লাহকে ঘরে বসতে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে আবদুল্লাহ একটি হাতুড়ি হাতে তুলে নিয়ে যে ঘরে প্রতীমাটি ছিল সেখানে ঢুকে গেলেন এবং বিভিন্ন শয়তানের নামের একটি কাসীদা আবৃত্তি করতে করতে হাতুড়ির আঘাতে মূর্তিটি চূর্ণ–বিচূর্ণ করে ফেলেন। কাসীদাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপঃ

'ওহে সাবধান! আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুই ডাকা হোক না কেন সবই বাতিল ও অসার।'

আবু দারদার স্ত্রী হাতুড়ির আঘাতের শব্দ শুনে ছুটে এসে ঘটনাটি দেখে চেঁচিয়ে বলে ওঠেনঃ 'ওহে ইবন রাওয়াহা! আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন।' আবদুল্লাহ কোন জবাব না দিয়ে এমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যেন কিছুই ঘটেনি।

আবু দারদা বাড়ী ফিরে দেখলেন, স্ত্রী বসে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হয়েছে? বললেনঃ আপনার ভাই আবদুল্লাহ এসে ঐ দেখুন কি কান্ডই না ঘটিয়ে গেছেন। আবু দারদা প্রথমতঃ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারপর গভীরভাবে চিন্তা করার পর আপন মনে বলে ওঠেনঃ যদি এ প্রতীমার মধ্যে সত্যি সত্যিই কোন কল্যাণ থাকতো তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতো। এমন চিন্তার পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলাম কবুল করেন।' (সুওয়ারুন মিন হায়াতুস সাহাবা–৩/৯৫–১০০; হায়াতুস সাহাবা–১/২৩২–২৩৩; ৩/৩৮৪; আল–মুসতাদরিক–৩/৩৩৬) রাসূল (সা) সালমান আল–ফারেসীর সাথে তাঁর দ্বীনি–ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৭১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২৫; উসুদুল গাবা–৫/১৮৫)

বদর যুদ্ধের সময় আবু দারদা অমুসলিম ছিলেন। এ কারণে সে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তবে খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে সাহাবাদের যে ভাতার ব্যবস্থা করেন তাতে আবু দারদার ভাতা বদরী সাহাবীদের সমান নির্ধারণ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। (দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–১/৮০০) উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমান। এ যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন এবং একজন অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবেই এতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে প্রতিপক্ষের একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি একাই তাদের তাড়িয়ে দেন। রাসূল (সা) সে দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে দারুণ পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেনঃ 'নি'মাল ফারিসু 'উয়াইমির'– 'উয়াইমির এক চমৎকার ঘোড় সওয়ার। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২৪; তারীখুল ইসলাম–২/১০৭) উহুদ ছাড়াও অন্যান্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে আবু দারদা মদীনায় ছিলেন। তাঁর এ সময়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মদীনা ছেড়ে শামে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁর মদীনা ত্যাগের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। ১· মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) স্মৃতি তাঁকে সব সময় কষ্ট দিত। ২· তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামী

শিক্ষার প্রচার-প্রসার নবীর ওয়ারিসদের ওপর ফরজ। এই বোধ তাঁকে মদীনা ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। ৩· তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একথা শুনেছিলেন যে, ফিত্‌নার অন্ধকারে ঈমানের প্রদীপ শামে নিরাপদ থাকবে। মূলতঃ এসকল কারণে শামের রাজধানী দিমাশ্‌কে তিনি বসতি স্থাপন করেন। (সীয়ারে আনসার-২/১৯০)

হযরত আবু দারদার মদীনা ত্যাগের ব্যাপারে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। তিনি সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খলীফা হযরত 'উমারের নিকট গেলেন অনুমতি চাইতে। খলীফা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তবে একটি শর্তে অনুমতি দিতে পারেন বলে জানালেন। শর্তটি হলো তাঁকে কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে যেতে হবে। আবু দারদা জানালেন, শাসক হওয়া তাঁর পছন্দ নয়। খলীফা বললেন, তাহলে অনুমতির আশা করবেন না। আবু দারদা অবস্থা বেগতিক দেখে বললেন, আমি কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবো না ঠিক, তবে মানুষকে কুরআন-হাদীস শিখাবো এবং নামায পড়াবো। তাঁর প্রস্তাবে খলীফা রাজী হলেন এবং তাঁকে মদীনা ত্যাগের অনুমতি দিলেন। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তিনি শামের প্রবাস জীবন গ্রহণ করেন।

আবু দারদার শামে গমন সম্পর্কে ইবন সা'দ ও হাকেম, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী থেকে একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী কারীমের (সা) জীবনকালে পাঁচজন আনসার সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেন। তাঁরা হলেনঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদা ইবনুস সামিত, উবাই ইবন কা'ব, আবু আইউব ও আবু দারদা (রা)। খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে হযরত ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান শাম থেকে খলীফাকে লিখলেনঃ শামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি শহর-বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। এ সকল লোককে কুরআন শিখাতে পারে এমন কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন। চিঠি পেয়ে খলীফা 'উমার (রা) উপরোক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে ডেকে চিঠির বক্তব্য তাঁদেরকে জানালেন এবং আবেদন রাখলেন, আপনাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিনজন এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। আর ইচ্ছা করলে সবাই করতে পারেন। ইচ্ছা করলে আপনাদের মধ্য থেকে নিজেরা তিনজনকে নির্বাচন করতে পারেন, অন্যথায় আমিই তিনজনকে বেছে নেব। তাঁরা বললেনঃ ঠিক আছে, আমরা যাব। আবু আইউব ছিলেন বয়োবৃদ্ধ, আবু উবাই পীড়িত, এ জন্য এ দু'জনকে তাঁরা বাদ দিলেন। বাকী তিন জনকে খলীফা বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। আবু দারদাকে পাঠালেন দিমাশ্‌কে এবং তিনি আমরণ সেখানে অবস্থান করেন। (তাবাকাত-৪/১৭২; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৫-১৯৬)

দিমাশ্‌কে তাঁর অধিকাংশ সময় ছাত্রদের কুরআন হাদীসের তা'লীম, শরীয়াতের আহকামের তারবিয়্যাত (প্রশিক্ষণ দান) এবং ইবাদাতের মধ্যে অতিবাহিত হতো। যখন শামে অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের ওপর সেখানকার ঠাঁট ও জৌলুসের কিছু না কিছু ছাপ পড়েছিল তখন আবু দারদা এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অকৃত্রিম জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর ঐতিহাসিক শাম সফরের সময় সেখানে অবস্থানরত প্রখ্যাত সাহাবা ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান, 'আমর ইবনুল 'আস ও আবু মুসা আল-'আশ'য়ারী (রা) প্রত্যেকের গৃহে অতর্কিতে উপস্থিত হন এবং তাঁদের জীবন যাপনে জৌলুসের ছাপ দেখতে পান। তিনি আবু দারদার আবাসস্থলেও যান; কিন্তু সেখানে ভোগ-বিলাসের চিহ্ন

তো দূরের কথা রাতের অন্ধকারে একটি বাতিও দেখতে পেলেন না। একটি অন্ধকার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর এ চরম দীন-হীন অবস্থা দেখে খলীফার চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, জীবনের প্রতি এমন নির্মমতার কারণ কি? আবু দারদা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এ পৃথিবীতে আমাদের এতটুকু জীবন উপকরণ থাকা উচিত যতটুকু একজন মুসাফিরের প্রয়োজন হয়। হায়! রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমরা কিসের থেকে কি হয়ে গেলাম। তারপর উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাত কাটিয়ে দিলেন। (কানযুল 'উম্মাল-৭/৭৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৮২-৮৪)

খলীফা হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে শামের গভর্ণর হযরত মু'য়াবিয়া (রা) খলীফার নির্দেশে আবু দারদাকে দিমাশ্কের কাজী নিয়োগ করেন। হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) কখনও সফরে গেলে তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এটি ছিল দিমাশ্কের প্রথম কাজীর পদ। (শাজারাতুজ জাহাব-৫/৩৯; আল-আ'লাম-৫/২৮১) ইবন হিব্বানের মতে, খলীফা 'উমারের নির্দেশে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কাজীর পদে নিয়োগ করেন। (লিসানুল মীযান--৭/৪৪) 'আল-ইসতী'য়াব' গ্রন্থকার প্রথম মতটি সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-২/১৭; ৪/৬০)

হযরত আবু দারদার দুই স্ত্রী ছিল। দু'জনই ছিলেন সম্মান ও মর্যাদার উঁচু আসনের অধিকারিনী। প্রথম জনের নাম উম্মু দারদা কুবরা খাযরা বিন্তু আবী হাদরাদ আল-আসলামী এবং দ্বিতীয়জনের নাম উম্মু দারদা সুগরা হাজীমা হায়ওয়াস্ সাবিয়্যা। উম্মু দারদা কুবরা ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা, প্রখর বুদ্ধিমতী, উঁচু স্তরের ফকীহা ও শ্রেষ্ঠ 'আবিদাহ্। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস পাওয়া যায়। তবে উম্মু দারদা সুগরা সাহাবিয়্যা ছিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত আবু দারদার বিয়ে সম্পর্কিত একটি বর্ণনা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। সাবিত আল-বুনানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু দারদা তাঁর দ্বীনী ভাই সালমান আল-ফারেসীকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে সংগে করে একটি কনের পিতার গৃহে গেলেন। তিনি সালমানকে বাইরে বসিয়ে রেখে ভিতর বাড়ী ঢুকলেন। কনের অভিভাবকদের নিকট সালমানের দ্বীনদারী ও দ্বীনের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা উল্লেখ করে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাদের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। পাত্রীপক্ষ বলেন ঃ আমরা সালমানকে মেয়ে দেব না, তবে তোমাকে দেব। এই বলে তাঁরা আবু দারদার সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কাজ শেষ হলে আবু দারদা বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত লজ্জার সাথে সালমানকে খবরটি দেন। তবে এটা আবু দারদার কোন বিয়ে সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭৪)

হযরত আবু দারদা ছিলেন একজন সুপুরুষ। বার্ধক্যে দাড়িতে খিজাব লাগাতেন। সব সময় আরবী পোশাক পরতেন। মাথায় 'কালানসুয়া' নামক এক প্রকার উঁচু টুপি ও পাগড়ী পরতেন। আবু দারদার সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন ঃ বিলাল, ইয়াযীদ, দারদা ও নুসাইবা। প্রথমজন বিলাল। তিনি ইতিহাসে বিলাল আবু মুহাম্মাদ দিমাশকী নামে খ্যাত। তিনি ইয়াযীদ ও পরবর্তী খলীফাদের সময়ে দিমাশ্কের কাজী ছিলেন। খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে বরখাস্ত করেন। হিজরী ৯২ সনে তাঁর ওফাত হয়।

কন্যা দারদা ছিলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও প্রখ্যাত তাবে'ঈ সাফওয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ আল কুরাইশীর সহধর্মিনী। এই দারদার বিয়ে সম্পর্কে একটি ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া দারদাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। আবু দারদা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে এক অতি সাধারণ দীনদার মুসলমানের সাথে তাঁকে বিয়ে দেন। তখন লোকে বলাবলি করতে লাগলো, আবু দারদা, ইয়াযীদের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন না; অথচ তাঁর চেয়ে নিচু স্তরের একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। একথা আবু দারদার কানে গেলে তিনি বললেন ঃ আমি দারদার প্রতি লক্ষ্য করেছি। যখন দারদার মাথার ওপর চাকর–বাকর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ঘরের বিপুল দ্রব্যের প্রতি নজর পড়বে তখন তাঁর দ্বীনের কি অবস্থা হবে? (সিফাতুস সাফওয়াহ্–১/২৬০; হায়াতুস সাহাবা–২/৬৭৪)

হযরত আবু দারদার মৃত্যুসন সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতভেদ আছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন গ্রন্থে হিজরী ৩১,৩২, ৩৩ ও ৩৪ সনগুলি উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে তিনি হযরত আলী ও হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফীন যুদ্ধের পর ইনতিকাল করেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি হিজরী ৩২ সন মুতাবিক ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে দিমাশ্কে ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী, আবু মাসহার সহ প্রমুখ ইতিহাসবিদ এমত পোষণ করেছেন। দিমাশ্কের 'বাবুস সাগীর'–এর নিকট তাঁকে দাফন করা হয় এবং তাঁরই পাশে তাঁর সহধর্মীনী উম্মু দারদাকেও সমাহিত করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। (দ্রঃ আল–ইসতী'য়াব ঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৪৬; ৪/৬০; উসুদুল গাবা–৫/১৮৬; 'আল–আ'লাম–৫/২৮১; তারীখুল ইসলাম–২/১১১; দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–১/৮০১; তাহজীবুত তাহজীব–৮/১৫৬; শাজারাতুজ জাহাব–৫/৩৯)

হযরত আবু দারদার (রা) মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল একটু ব্যতিক্রম ধরনের। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদছেন। স্ত্রী উম্মু দারদা বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী হয়ে এত কাঁদছেন? বললেন ঃ কেন কাঁদবো না? কিভাবে মুক্তি পাব আল্লাহই ভালো জানেন। এ অবস্থায় ছেলে বিলালকে ডেকে বললেন, দেখ, একদিন তোমাকেও এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সে দিনের জন্য কিছু করে রাখ। মৃত্যুর সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো তাঁর হাহুতাশ ও অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেয়ে চললো। ঈমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ঈমান হচ্ছে ভীতি ও আশার মাঝখানে। আবু দারদার ওপর খোদাভীতির প্রাবল্য ছিল।

স্ত্রী পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তিনি এক সময় বললেন, আপনি তো মৃত্যুকে খুবই ভালোবাসতেন। এখন এত অস্থির কেন? বললেন ঃ তোমার কথা সত্য। কিন্তু যখন মৃত্যু অবধারিত বুঝেছি তখনই এ অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এতটুকু বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর বললেন, এখন আমার শেষ সময়। আমাকে কালিমার তালকীন দাও। লোকেরা কালিমার তালকীন দিল। তিনি তা উচ্চারণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন

হযরত আবু দারদা যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন একদিন ইউসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সালাম আসলেন তাঁর নিকট ইল্ম হাসিলের জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে?, তাঁর সেই মুমূর্ষ অবস্থা দেখে ইউসুফ জবাব দিলেন আপনার সাথে আমার আব্বার যে

গভীর সম্পর্ক ছিল সেই সূত্রে আমি আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, মিথ্যা অতি নিকৃষ্ট জিনিস। কিন্তু কেউ মিথ্যা বলে ইসতিগফার করলে তা মাফ হতে পারে। (মুসনাদ–৬/৪৫০)

হযরত আবু দারদার ওফাত পর্যন্ত ইউসুফ অবস্থান করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ডেকে বললেন, আমার মৃত্যু আসন্ন, একথা মানুষকে জানিয়ে দাও। তিনি খবর ছড়িয়ে দিতেই বন্যার স্রোতের মত মানুষ আসতে শুরু করলো। ঘরে বাইরে শুধু মানুষ আর মানুষ। তাঁকে প্রচুর লোক সমাগমের কথা জানানো হলে তিনি বললেন, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো। ধরে বাইরে আনা হলে তিনি উঠে বসলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। (মুসনাদ–৬/৪৪৩) এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস প্রচারের আবেগ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

হযরত আবু দারদাকে আলিম সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন ঃ তোমরা দু'জন বা–'আমল আলিম–মু'য়াজ ও আবু দারদার কিছু আলোচনা কর। ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া বলতেন ঃ আবু দারদা এমন আলিম ও ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রোগের নিরাময় দান করে থাকেন। (আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবা–৪/৫০) মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালও আবু দারদার গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এত কান্না কেন? লোকটি বললো ঃ আমি আপনার নিকট থেকে ইলম হাসিল করতাম; কিন্তু এখন আপনি চলে যাচ্ছেন। তাই আমার কান্না পাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ কেঁদো না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ইলম হাসিলের জন্য আবু দারদা, সালমান, ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালাম– এ চার ব্যক্তির কাছে যাবে। (কানযুল 'উম্মাল–২/৩২৫; হায়াতুস সাহাবা–২/৫৮১, ৫৮২; তারীখুল ইসলাম–২/১০৯) একবার হযরত আবুজার আল–গিফারী (রা) আবু দারদাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ওহে আবু দারদা ঃ যমীনের ওপর এবং আসমানের নীচে আপনার চেয়ে বড় কোন 'আলিম নেই। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯); হযরত মাসরূক, যিনি একজন উঁচু মর্যাদার তাবে'ঈ এবং তাঁর যুগের একজন বিশিষ্ট ইমাম–বলেন ঃ আমি সকল সাহাবীর জ্ঞানরাশি মাত্র ছ' ব্যক্তির মধ্যে একত্রে দেখতে পেয়েছি। তাঁদের একজন আবু দারদা। মিসয়ার থেকে বর্ণিত। কাসেম ইবন 'আবদির রহমান বলেন ঃ যাঁদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আবু দারদা তাঁদের একজন। (আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবা–৪/৫০) তাঁর এ বিশাল জ্ঞানের কারণে তাঁর সময়ে মক্কা–মদীনা তথা গোটা হিজাযে বহু বড় বড় সাহাবী ফাতওয়া ও ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা দলে দলে আবু দারদার দারসগাহে ভিড় জমাতেন।

হযরত আবু দারদার দারসগাহে সব সময় ছাত্রদের ভিড় জমে থাকতো। ঘর থেকে বের হলেই দেখতে পেতেন পথের দু'ধারে ছাত্ররা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন মসজিদে যাচ্ছেন। পিছনে এত ভিড় জমে গেল যে, মানুষ মনে করলো হয়তো এটা কোন শাহী মিছিল হবে। তাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু জিজ্ঞেস করছিল। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/২৫)

হযরত আবু দারদা সব সময় মানুষকে ইলম হাসিলের প্রতি উৎসাহ দান করতেন। হযরত

হাসান বলেছেন, আবু দারদা বলতেন : তোমরা 'আলিম, তালিবে ইলম, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী অথবা তাঁদের অনুসারী– এ চারটির যে কোন একটি হও। এর বাইরে পঞ্চম কিছু হয়ো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পঞ্চমটি কি? বললেন ঃ বিদ'য়াতী। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৬০) তিনি আরও বলতেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে প্রবেশ করা ও বের হওয়া একজন মানুষের বিজ্ঞতার পরিচায়ক। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৯)

দাহ্হাক থেকে বর্ণিত হয়েছে আবু দারদা শামবাসীদের বলতেন ঃ ওহে দিমাশ্কের অধিবাসীরা! তোমরা আমার দ্বীনী ভাই, বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আমার সাথে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে তোমাদের বাঁধা কিসের? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদের 'আলিমরা চলে যাচ্ছেন অথচ তোমাদের জাহিলরা শিখছেনা? তোমরা শুধু জীবিকার ধান্দায় ঘুরছো অথচ তোমাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে দিচ্ছ? শুনে রাখ, একটি জাতি বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করেছিল, বিশাল সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল। এভাবে তারা বড় উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েছিল। অবশেষে তাদের সেই সুউচ্চ অট্টালিকা তাদের কবরে পরিণত হয়, তাদের উচ্চাভিলাষ তাদেরকে প্রতারিত করে এবং তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ওহে, তোমরা শেখ এবং অন্যকে শিখাও। কারণ, শিক্ষাদানকারী ও গ্রহণকারীর প্রতিদান সমান সমান। এ দু'শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কারও মধ্যে অধিকতর কল্যাণ নেই।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি দিমাশ্কবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ ওহে, তোমরা বছরের পর বছর পেট ভরে শুধু গমের রুটি খাবে– এতেই খুশী থাকবে? তোমাদের মজলিশ ও সভা–সমিতিতে কি তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে না? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদের 'আলিমগণ চলে যাচ্ছেন আর তোমাদের জাহিলগণ তাঁদের নিকট থেকে কিছুই শিখছে না? (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৬০,১৬১)

হযরত আবু দারদা ছিলেন একজন বা–'আমল আলিম। যা শিখেছিলেন তা যথাযথভাবে পালন করতেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম বলতেন ঃ আমাদের মধ্যে আবু দারদা ইলম অনুযায়ী সর্বাধিক আমলকারী। আবু দারদা বলতেন ঃ যে জানেনা তার ধ্বংস একবার, আর যে জেনে 'আমল করেনা তার ধ্বংস সাতবার। সালেম ইবন আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। আবু দারদা বলতেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আল্লাহর কসম! আমাকে হারালে তোমরা একজন মহান ব্যক্তিকে হারাবে। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯, ২১১)

হযরত আবু দারদার শিক্ষাদানের নিয়ম ছিল ফজরের নামাযের পর জামে' মসজিদে দারসের জন্য বসে যেতেন। ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বসে প্রশ্ন করতো, আর তিনি জবাব দিতেন। যদিও তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁর মূল বিষয় ছিল কুরআন মজীদের দারস ও তা'লীম। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় যাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ও সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবু দারদা, মু'য়াজ, যায়িদ ইবন সাবিত ও আবু যায়িদ আল–আনসারী– এ চারজন ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যু পর্যন্ত আর কেউ সম্পূর্ণ কুরআন সংগ্রহ করেননি। ইমাম শা'বী অবশ্য উবাই ইবন কা'ব ও সা'ঈদ ইবন 'উবায়েদ– এ দু'জনের নাম

সংযোগ করে মোট ছয় জনের কথা বলেছেন। ইবন হাজার ফাতহুল বারী (৯/৪৩) গ্রন্থে এমন ২৯ জন হাফেজে কুরআনের নাম উল্লেখ করেছেন। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৮; আল-আ'লাম-৫/২৮১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫) যাইহোক, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালের হুফ্ফাজে কুরআনদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আবু দারদা। এ কারণে খলীফা হযরত 'উমার (রা) শামে কুরআনের তা'লীম ও তাবলীগের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেন। দিমাশ্কের জামে' 'উমারী'তে তিনি কুরআনের দারস দিতেন। অবশেষে এটা একটি শ্রেষ্ঠ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর অধীনে আরো অনেক শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রসংখ্যাও ছিল কয়েক হাজার। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর দারসে শরীক হতো।

ফজর নামাযের পর তিনি দশজন করে একটি গ্রুপ করে দিতেন। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একজন করে ক্বারী থাকতেন। ক্বারী কুরআন পড়াতেন। তিনি টহল দিতেন এবং ছাত্রদের পাঠ কান লাগিয়ে শুনতেন। এভাবে কোন ছাত্রের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ হয়ে গেলে তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দানের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিতেন। গ্রুপ শিক্ষক ছাত্রদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হলে তাঁর নিকট থেকেই জেনে নিতেন। দারসে প্রচুর ছাত্র সমাগম হতো। একদিন গুণে দেখা গেল কেন্দ্র থেকে ১৬০০ ছাত্র বের হচ্ছে।

ইবন 'আমির ইয়াহসাবী, উম্মু দারদা সুগরা, খলীফা ইবন সা'দ, রাশেদ ইবন সা'দ, খালিদ ইবন সা'দ প্রমুখ এই কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের খ্যাতিমান ছাত্র-ছাত্রী। ইবন 'আমির ইয়াহসাবী ছিলেন খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের সময়ে মসজিদ বিষয়ক দফতরের রয়িস বা নেতা। আবু দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা সুগরা ছিলেন কিরাত শাস্ত্রের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ। মূলতঃ স্বামীর নিকট থেকেই তিনি এ জ্ঞান অর্জন করেন। আতীয়্যা ইবন কায়েস কিলাবীকে তিনিই কিরাত শেখান। খলীফা ইবন সা'দের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লোকে তাঁকে আবু দারদার সার্থক উত্তরাধিকারী বলতো। শামের বিখ্যাত ক্বারীদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হতো।

তাফসীর শাস্ত্রে যে সকল সাহাবী প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে যদিও আবু দারদার নামটি পাওয়া যায় না, তবুও বেশ কিছু আয়াতের তাফসীর তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন, মানুষ যতক্ষণ না কুরআনের নানা দিক বিবেচনায় আনবে ততক্ষণ ফকীহ হতে পারবে না। জটিল আয়াতসমূহের ভাব তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

হযরত আবু দারদার নিকট কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি খুব সন্তোষজনক জবাব দিতেন। একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ ولمن خاف مقام ربه جنتان এর মধ্যে কি ব্যভিচারী ও চোর শামিল হবে? তিনি জবাব দিলেন, তার রব বা প্রভুর ভয় থাকলে সে কিভাবে ব্যভিচার ও চুরি করতে পারে?

সূরা قلم -এ এক কাফির সম্পর্কে এসেছে عتل بعد ذلك زنيم এখানে 'উ'তুল'শব্দটির অর্থের ব্যাপারে 'মুফাস্সিরগণ নানা কথা বলেছেন। আবু দারদা তার ব্যাপক অর্থ বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ বড় পেট ও শক্ত হলক বিশিষ্ট অতিরিক্ত পানাহারকারী, সম্পদ পুঞ্জিভূতকারী ও অতি কৃপণ ব্যক্তিকে 'উতুল' বলে।

এমনিভাবে সূরা তারিক-এ السرائر শব্দটি এসেছে। হযরত আবু দারদা এ শব্দটিরও একটি বিশেষ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদের তা'লীম ও খিদমতের পরে সাহাবায়ে কিরাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে। হযরত আবু দারদা অতি সার্থকভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু দারদার এক বিশেষ স্টাইল ছিল। তাবারানী ইদরীস আল-খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবু দারদাকে দেখেছি, রাসূলের (সা) কোন হাদীস বর্ণনা শেষ করে তিনি বলতেনঃ এই অথবা এই রকম অথবা এ ধরনের। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৩৯)

ইবন 'আসাকির ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন 'আউফ থেকে বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার (রা) বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবা—'আবদুল্লাহ ইবন হুজাইফা, আবু দারদা, আবু জার ও 'উকবা ইবন 'আমিরকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হাজির হলে বলেনঃ এই যে আপনারা রাসূলের (সা) হাদীসের নামে যা কিছু প্রচার করছেন, এসব কী? তাঁরা বললেনঃ আপনি প্রচার করতে নিষেধ করেন? 'উমার বললেনঃ না। তবে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আমি আপনাদের থেকে গ্রহণ অথবা বর্জন করবো। এ ব্যাপারে আমরা বেশী জানি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৪০,৪৪১)

একবার তিনি হযরত সা'দান ইবন তালহার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। দিমাশ্‌কের মসজিদে তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আযাদকৃত দাস হযরত সাওবান উপস্থিত ছিলেন। হযরত সা'দান একটু বেশী আশ্বস্ত হওয়ার জন্য হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। সাওবান বললেন, আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমিও সে সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। (মুসনাদ-৬/৪৪২)

হযরত মু'য়াজ (রা) মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেছিলেন, এর জন্য সাক্ষী চাইলে 'উয়াইমির (আবু দারদা) আছেন, তাঁর কাছে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার। লোকেরা তাঁর নিকট গেল। তিনি হাদীসটি শুনে বললেনঃ আমার ভাই (মু'য়াজ) সত্য বলেছেন। (মুসনাদ-৬/৪৫০)

সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল, একে অপরের সাথে মিলিত হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতেন। একবার একটি সমাবেশে 'উবাদা ইবনুস সামিত, হারিস আল-কিন্দী ও মিকদাদ ইবন মা'দিকারিবের সাথে আবু দারদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'উবাদাকে প্রশ্ন করলেন, অমুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) কি খুমুস সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন? 'উবাদার স্মরণ হলো। তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হযরত আবু দারদার গোটা জীবন কেটেছে আল্লাহর কালাম ও হাদীসে নববীর শিক্ষাদান ও প্রচারে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শহরের নানা শ্রেণীর অধিবাসীদের সমবেত করে তাদেরকে ঠিকমত নামায আদায়ের শেষ অসীয়াত করে যান। তাঁর নিকট হাদীসের যে ভান্ডার ছিল তা তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর কিছু হাদীস তিনি যায়িদ ইবন সাবিত ও 'আয়িশা (রা) থেকেও বর্ণনা করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের গন্ডি ছিল সীমিত। আনাস ইবন মালিক, ফুদালা ইবন 'উবাইদ, আবু উমামা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, উম্মু দারদা প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ খ্যাতিমান 'আলিম তাবে'ঈ তাঁর নিকট ইলমে হাদীস হাসিল করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এখানে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, বিলাল ইবন আবু দারদা, 'আলকামা ইবন কায়স, আবু মুররা

মাওলা উম্মে হানী, আবু ইদরীস খাওলী, জুবাইর ইবন নাদীর, সুওয়ায়িদ ইবন গাফলা, যায়িদ ইবন ওয়াহাব, মা'দান ইবন আবী তালহা, আবু হাবীবা তাঈ, আবুস সাফার হামাদানী, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান, সাফওয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ, কুসায়্যিব ইবন কায়স, আবু বাহরিয়্যা 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স, কুসায়্যির ইবন মুররা, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুহাম্মাদ ইবন সুওয়াইদ আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী, হিলাল ইবন ইয়াসাফ প্রমুখ। (তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৫৬; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৪; তারীখুল ইসলাম-২/১০৭)

হযরত আবু দারদার সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায় তার মোট সংখ্যা-১৭৯ (এক শো উনাশি)। এর মধ্যে বুখারী শরীফে ১৩টি ও মুসলিম শরীফে ৮টি সংকলিত হয়েছে। (আল-আ'লাম-৫/২৮১; তারীখুল ইসলাম-২/১০৭)

ফিকাহ শাস্ত্রেও তিনি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। মানুষ বহু দূর-দুরান্ত থেকে মাসয়ালা জানার জন্য তাঁর কাছে আসতো। এক ব্যক্তি তো শুধু একটি মাসয়ালা জানার জন্য সূদুর কূফা থেকে দিমাশ্কে তাঁর নিকট আসেন। সেই বিশেষ মাসয়ালাটি ছিল এ রকমঃ

উক্ত ব্যক্তি প্রথমে বিয়ে করতে রাজী ছিলনা। কিন্তু পরে মায়ের চাপাচাপিতে বিয়ে করে। বিয়ের পর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা গড়ে ওঠে তখন মা আবার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দেন। এখন সে তালাক দিতে চায়না। সবকিছু শুনে আবু দারদা বললেন, আমি সুনির্দিষ্টভাবে কারো সাথে- না মায়ের সাথে, না স্ত্রীর সাথে, সম্পর্ক ছেদ করার কথা বলবো না। আমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথাও বলবো না, আবার মায়ের নাফরমানীও জায়েয মনে করবো না। তোমার ইচ্ছা হলে তালাকও দিতে পার, আবার এখন যেমন আছ তেমন থাকতেও পার। তবে একথা যেন স্মরণ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাকে জান্নাতের দরজা বলে অভিহিত করেছেন। (মুসনাদ-৫/৯৮; সীয়ারে অনসার-২/২০০)

আবু হাবীব তাঈ একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই কিছু দীনার 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর রাহে) দান করেন এবং মরণকালে অসীয়াত করে যান, দীনারগুলি যেন দানের খাতসমূহের কোন একটিতে দিয়ে দিই। এখন আপনি বলুন, সবচেয়ে উত্তম খাত কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, আমার নিকট উত্তম খাত 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ)।

হযরত আবু দারদা ছিলেন স্বভাবগতভাবেই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতির। ইসলামী শিক্ষা তাঁর এ প্রকৃতিকে আরো দীপ্ত ও স্বচ্ছ করে তোলে। গোটা সাহাবাকুলের মধ্যে হযরত আবু জার আল গিফারী ছিলেন সবচেয়ে বড় স্পষ্টভাষী ও স্বাধীনচেতা। প্রথম পর্যায়ে তিনিও শামে থাকতেন। সেখানে খুব কম লোকই তাঁর কঠোরতার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। হযরত আমীর মু'য়াবিয়াকে (রা) তিনি তাঁর দরবারে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইসলামী বিধি-নিষেধের ব্যাপারে এহেন কঠোর ব্যক্তি একদিন আবু দারদাকে বললেনঃ আপনি যদি রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ নাও পেতেন অথবা রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলেও নেককার মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতেন। হযরত আবু দারদার (রা) আখলাকের পবিত্রতার জন্য এর চেয়ে বড় সনদ আর কী হতে পারে?

তিনি ছিলেন নবীর (সা) সহচর। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে তাঁর দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো। একবার তো মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে বলতে লাগলেন, আমি সেই দিনের ব্যাপারে খুবই ভীত যেদিন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার ইল্ম অনুযায়ী 'আমল করেছো? যে দিন কুরআনের প্রতিটি আয়াত জীবন্তরূপে আমার

সামনে এসে দাঁড়াবে এবং আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে তুমি কুরআনের নির্দেশের কতটুকু অনুসরণ করেছো? নির্দেশসূচক আয়াত তখন আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, কোন কিছুই করেনি। তারপর প্রশ্ন করা হবে নিষেধ থেকে কতটুকু দূরে থেকেছো? নিষেধসূচক আয়াত তখন বলে উঠবে, কিছুই করেনি। ওহে জনমন্ডলী! আমি কি সেদিন মুক্তি পাব? (কানযুল 'উম্মাল-৭/৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮৮, ৪৮৯)

পরকালের ভয়ে সব সময় তিনি ভীত থাকতেন। হিযাম ইবন হাকীম বলেন, আবু দারদা বলতেনঃ মরণের পর যে কী হবে তা যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তাহলে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে পারতে না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাদওয়ালা ঘরেও প্রবেশ করতে না। বরং রাস্তায় বেরিয়ে বুক চাপড়াতে আর কাঁদতে। তিনি আরো বলতেনঃ হায়! আমি যদি গাছ হতাম, আর গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলতো। আমি যদি আমার পরিবারের ছাগল হতাম, আর তারা আমাকে জবেহ করে টুকরো টুকরো করে অতিথি-মেহমানদের নিয়ে খেয়ে ফেলতো। অথবা আমি যদি এই খুঁটি হয়ে জন্মাতাম! তাহলে হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকতো না। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৪৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬২০, ৬২১)

ইবাদাতের ক্ষেত্রে পাঞ্জেগানা ও কিয়ামুল লাইল ছাড়াও তিনটি জিনিস অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন। ১· প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন। ২· বিতর নামায আদায় করতেন। ৩· আবাসে-প্রবাসে সকল অবস্থায় চাশ্‌তের নামায আদায় করতেন। এগুলি সম্পর্কে রাসূল (সা) তাঁকে অসীয়াত করেছিলেন।

তিনি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করতেন। তাসবীহ ৩৩ বার, তাহমীদ ৩৩ বার এবং তাকবীর ৩৪ বার। (মুসনাদ-৫/১৯৬) উম্মু দারদা থেকে বর্ণিত। একবার আবু দারদার নিকট একটি লোক এলো। আবু দারদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি থাকবেন না চলে যাবেন? থাকলে বাতি জ্বালাই, নইলে আপনার বাহনের খাদ্য দিই। লোকটি বললোঃ চলে যাব। আবু দারদা বললেনঃ আমি আপনাকে পাথেয় দান করবো। যদি এর চেয়ে উত্তম কোন পাথেয় পেতাম তাহলে তাই আপনাকে দিতাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই লুটে নিল। আমরাও নামায পড়ি, তারাও পড়ে, আমরাও রোযা রাখি, তারাও রাখে। কিন্তু তারা সাদাকা করে, আমরা তা করতে পারিনা। রাসূল (সা) বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি জিনিস বলে দেব না, যদি তুমি তা কর তাহলে তোমার পূর্বের ও পরের কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবেনা? তবে যে তোমার মত করবে, কেবল সেই তোমার সমান হবে। সে জিনিসটি হলোঃ প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার তাসবীহ, ৩৩ বার আল- হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩০৫)

আর একবার আবু দারদা বলেনঃ এক শো দীনার সাদাকা করার চেয়ে এক শো বার তাকবীর পাঠ করা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৭৯) তিনি প্রতি মুহূর্ত তাসবীহ পাঠে নিরত থাকতেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি প্রতিদিন কতবার তাসবীহ পাঠ করেন? বললেনঃ এক লাখ বার। তবে আমার আংগুল যদি ভুল করে তবে তা ভিন্ন কথা। (তারীখুল ইসলাম-২/১১০)

একবার আবু দারদাকে বলা হলোঃ আবু সা'দ ইবন মুনাব্বিহ্ এক শো দাস মুক্ত করেছে। তিনি বললেনঃ একজন লোকের সম্পদের জন্য এক শো দাস অনেক। তুমি শুনতে চাইলে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা আমি তোমাকে শোনাতে পারি। আর তা হলোঃ দিবা-রাত্রির অবিচ্ছিন্ন ঈমান, আর সেই সাথে আল্লাহর জিক্‌র (স্মরণ) থেকে তোমার জিহবা বিরত না থাকা। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১২)

একবার এক ব্যক্তি আবু দারদার নিকট এসে বললো, আমাকে কিছু অসীয়াত করুন। বললেনঃ সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার দুঃখের সময় স্মরণ করবেন। দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি যখন তাকাবে তখন তার পরিণতির প্রতি একটু দৃষ্টি দেবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৭৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে জিকর শিক্ষা দিয়েছেন। একদিন রাসূল (সা) বললেনঃ আবু দারদা, তুমি কী পাঠ কর? বললেনঃ আল্লাহর জিক্র করি। রাসূল (সা) বললেনঃ আমি কি রাত-দিনে আল্লাহর যে জিক্র করা হয় তার থেকে কিছু শিখিয়ে দেব না? আবু দারদা বললেন হাঁ, শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে একটি জিক্র শিখিয়ে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শ্রুত বাণীর প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও ইয়াকীন ছিল। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললোঃ আবু দারদা! আপনার বাড়ীটি আগুনে পুড়ে গেছে। তিনি বললেনঃ না পুড়েনি। এরপর দু'ব্যক্তি একের পর এক একই খবর নিয়ে এলো। তিনিও একই জবাব দিলেন। চতুর্থ এক ব্যক্তি এসে বললো, আগুন লেগে ছিল; কিন্তু আপনার ঘর পর্যন্ত এসে তা নিভে যায়। একথা শুনে তিনি বলেন, আমি জেনেছি, আল্লাহ অবশ্যই তা করেন না। তখন লোকটি বললোঃ ওহে আবু দারদা! আপনি যে বললেন, 'আমার ঘর পুড়েনি' এবং 'আমি জেনেছি, আল্লাহ অবশ্যই তা করেন না'- এ দু'টি কথার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বিস্ময়কর? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখেছি, কেউ সেগুলি সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিপদে পড়েনা। তারপর তিনি সেই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন। (বায়হাকীঃ আসমা ও সিফাত অধ্যায়-১২৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৭০)

হযরত আবু দারদার জীবন ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর। দুনিয়ার কোন চাকচিক্য, জৌলুষ, ভোগ-বিলাস তাঁর গায়ে কক্ষনো দাগ কাটতে পারেনি। তিনি বলতেন, দুনিয়ায় মানুষের একজন মুসাফিরের মত থাকা উচিত। সূফীরা তাঁকে 'আসহাবে সুফ্‌ফা'র সদস্যদের মধ্যে গণ্য করে থাকেন এবং 'যুহ্‌দ ও তাকওয়া'র বিষয়ের ওপর তাঁর বহু মূল্যবান বাণী- তারা বর্ণনা করেছেন। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-১/৮০০)

একবার হযরত সালমান আল-ফারেসী (রা) সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে আসলেন। তাঁরা ছিলেন পরস্পর দ্বীনি ভাই। তিনি আবু দারদার স্ত্রীকে অতি সাধারণ বেশভূষায় দেখতে পেয়ে তাঁর এমন দীন-হীন অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদা দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছেন। এখন আর তাঁর কোন কিছুর প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। আবু দারদা ঘরে ফিরলেন। সালাম বিনিময়ের পালা শেষ হলে খাবার এলো। সালমান আবু দারদাকে খাবারের জন্য ডাকলেন। আবু দারদা বললেন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান কসম খেয়ে বললেন, আপনাকে অবশ্যই আমার সাথে খেতে হবে, অন্যথায় আমিও খাব না। সালমান আবু দারদার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলেন। রাতে আবু দারদা নামায পড়ার জন্য উঠলেন। সালমান তাঁকে বাধা দিয়ে বললেনঃ ভাই আপনার ওপর আল্লাহর যেমন হক আছে, তেমনি স্ত্রীরও আছে। আপনার দেহেরও আছে। সুতরাং আপনি ইফতার করবেন, নামায পড়বেন, স্ত্রীর কাছে যাবেন এবং সকলের হক আদায় করবেন। শেষ রাতে সালমান তাঁকে ঘুম থেকে জাগালেন, দুইজন এক সাথে নামায পড়লেন এবং এক সাথে মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। সকালে আবু দারদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সালমানের ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন, সালমান ঠিক বলেছে। সে তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৯২, ৬৯৩)

বিলাল ইবন সা'দ বলেন। আবু দারদা প্রায়ই দু'আ করতেনঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তরের

বিক্ষিপ্ততা থেকে আমি আপনার পানাহ চাই। প্রশ্ন করা হলোঃ অন্তরের বিক্ষিপ্ততা আবার কী? বললেন ঃ প্রতিটি উপত্যকায় আমার সম্পদ ছড়িয়ে থাকাই হচ্ছে অন্তরের বিক্ষিপ্ততা। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩৮৩)

আবু নু'য়াইম 'আল হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২২২) খালিদ ইবন হুদাইর আল–আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি আবু দারদার ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি চামড়া অথবা পশমের বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর গায়ে মোটা পশমের কাপড় এবং পায়েও পশমের জুতো। আর তিনি তখন অসুস্থ। এ অবস্থায় তিনি শুধু ঘামছেন। খালিদ বললেনঃ আপনি অনুমতি দিলে আমীরুল মুমিনীদের নিকট থেকে প্রেরিত উত্তম বিছানা ও পোশাক আপনার জন্য আনতে পারি। জবাবে তিনি বললেনঃ আমার তো অন্য একটি বাড়ী আছে। আমি সেখানেই চলে যাব এবং সেখানে যাওয়ার জন্যই কাজ করছি। সুতরাং এতকিছুর প্রয়োজন কি? (হায়াতুস সাহাবা ২/২৯৬)

একবার আবু দারদার গৃহে কয়েকজন মেহমান এলো। সময়টি ছিল শীতকাল। তিনি গরম খাবার তো দিলেন; কিন্তু গরম বিছানা দিলেন না। মেহমানদের একজন তার সঙ্গীদের বললেনঃ আমাদের গরম খাবার তো দিলেন, কিন্তু শীত নিবারনের জন্য কোন কিছু তো দিলেন না। এভাবে থাকা যাবে না। তাঁর কাছে চাইতে হবে। অন্য একজন বললোঃ বাদ দাও। কিন্তু এক ব্যক্তি কারো কথা না শুনে সোজা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। সে দেখলো, আবু দারদার পাশেই তাঁর স্ত্রী বসে আছেন; কিন্তু তাদের গায়েও তেমন কোন শীতের কাপড় নেই। লোকটি ফিরে গেল। পরে সে আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনি আমাদের মতই শীত বস্ত্র ছাড়াই রাত কাটালেন কেন? জবাব দিলেন, আমাদের অন্য একটি বাড়ী আছে। আর সেখানেই আমরা চলে যাব। আমাদের বিছানাপত্র ও লেপ–তোষক সবই সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার কিছু আমাদের কাছে থাকলে অবশ্য তোমাদের কক্ষে পাঠিয়ে দিতাম। (সিফাতুস সাফওয়া–১/২৬৩; হায়াতুস সাহাবা–২/২৯৭)

মু'য়াবিয়া ইবন কুররা বলেন, আবু দারদা বলতেনঃ আমি তিনটি জিনিস পসন্দ করি, অথচ মানুষ সেগুলি অপসন্দ করে। দারিদ্র, রোগ ও মৃত্যু। মৃত্যুকে আমি পসন্দ করি আমার রব বা প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, দারিদ্রকে পসন্দ করি প্রভুর সামনে বিনীতভাব প্রকাশের জন্য, আর রোগ পসন্দ করি আমার পাপের কাফ্ফারার জন্য। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২৫; তারীখুল ইসলাম–২/১১০)

রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই বুঝেছিলেনঃ 'আমর বিল মা'রূফ বা সৎ কাজের আদেশ তাঁদের ওপর ফরজ। হযরত আবু দারদা এ ফরজের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। একবার হযরত মু'য়াবিয়া একটি রূপোর পাত্র খরীদ করলেন। বিনিময়ে তিনি কিছু কম–বেশী রূপোর মুদ্রা বিক্রেতাকে দিলেন। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটা ছিল অবৈধ। বিষয়টি আবু দারদা অবগত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলেন, ওহে মু'য়াবিয়া! এমন কেনা–বেচা জায়েয নয়। রাসূল (সা) সোনা–রূপোর বিনিময়ে সমতার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহর ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আবু দারদার কাছে এসেছিলেন এক উদ্দেশ্যে, আর বলেছিলেন ভিন্ন কথা। এ কারণে আবু দারদা সংগে সংগে তাঁকে শুধরে দিয়ে বলেছিলেনঃ মিথ্যা বলা খুবই খারাপ কাজ। (মুসনাদ–৬/৪৫০)

আমীর মু'য়াবিয়া (রা) হযরত আবু জারকে (রা) শাম থেকে বের করে দিলেন। পথ চলা কালে আবু দারদার কানে খবরটি পৌঁছালে অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারিত হলো। তারপর তিনি বললেনঃ উটের সাথীদের সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (উটের সাথী দ্বারা হযরত সালেহর (আ) সংগী সাথী বুঝিয়েছেন।)

তারপর অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তারা আবু জারকে মিথ্যাবাদী বলেছে, কিন্তু আমি তা বলি না। লোকে তাঁর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কিন্তু আমি তা করিনা। তারা তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে তাদের সাথে নই। কারণ আমি জানি, রাসূল (সা) ধরাপৃষ্ঠে তাঁর মত আর কাউকে সত্যবাদী মনে করতেন না এবং তাঁর মত আর কারো নিকট গোপন কথা বলতেন না। যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, যদি আবু জার আমার হাতও কেটে দেন তবুও আমি তাঁর প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করবো না। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেনঃ আসমানের নীচে ও যমীনের ওপরে আবু জার অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী আর কেউ নেই।

ইবন 'আসাকির বর্ণনা করেছেন। আবু দারদা একবার মাসলামা ইবন মুখাল্লাদকে লিখলেনঃ বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যখন তাঁকে ভালোবাসেন তখন তার সকল বান্দার প্রিয়পাত্র করে দেন। অপর দিকে বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানির কাজ করে তখন তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। যখন সে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয় তখন সে তার সৃষ্টিরও ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। (কানযুল 'উম্মাল–৮/২২৭, হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন বললেন, যে ব্যক্তি তাওহীদের কালেমা উচ্চারণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আবু দারদা প্রশ্ন করলেন—সে যদি যিনা বা চুরি করে, তবুও? রাসূল (সা) বললেনঃ হাঁ, তবুও। এমন একটা খোশখবর মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত। আবু দারদা তিনবার জিজ্ঞেস করে মানুষের নিকট এ খবর পৌঁছানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পথে 'উমারের সাথে সাক্ষাৎ। তিনি বললেনঃ এমন কাজ করো না। এতে মানুষ 'আমল ছেড়ে দেবে। আবু দারদা ফিরে বিষয়টি রাসূলকে (সা) জানালেন। তিনি বললেন, 'উমার ঠিক বলেছে।(মুসনাদ–৫/৪১)

একদিন তিনি বাহির থেকে ঘরে ফিরলেন। চোখে–মুখে উত্তেজনার ছাপ। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেনঃ কী হয়েছে? বললেনঃ আল্লাহর কসম! শুধুমাত্র জামায়াতে নামায আদায় ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) একটি কাজও আর পালিত হচ্ছে না। মানুষ সব ছেড়ে দিয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১২৩)

একবার সা'দান ইবন আবী তালহার সাথে তাঁর দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার বাড়ী কোথায়? সা'দান বললেনঃ গ্রামে। তবে শহরের কাছাকাছি। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে আপনি শহরে নামায পড়বেন। যেখানে আযান এবং নামায হয়না সেখানে শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। দেখ, নেকড়ে সেই মেষকে ধরে যে দলছুট হয়ে যায়। (মুসনাদ–৬/৪৫৯)

গোটা মুসলিম সমাজ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ ও সম্মান করতো। উত্তেজিত অবস্থায়ও তিনি যা কিছু বলতেন, মানুষ অন্তর দিয়ে তা শুনতো। একবার এক কুরাইশী এক আনসারীর দাঁত ভেঙ্গে দেয়। হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) দরবারে বিচার গেল। তিনি কুরাইশীকে অপরাধী ঘোষণা করলেন। তখন সে বললো, আনসারী লোকটি প্রথমে আমার দাঁতে ব্যথা দেয়। একথা শুনে আমীর মু'য়াবিয়া বললেনঃ একটু থাম, আমি আনসারীকে রাজী করাচ্ছি। কিন্তু আনসারী–কিসাসের দাবীতে অটল রইল। সে রাজী হলো না। আমীর মু'য়াবিয়া বললেন, এই যে আবু দারদা আসছেন, তিনি যে ফয়সালা করেন তাই মেনে নাও। আবু দারদা ঘটনাটি শুনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ কোন ব্যক্তি কাউকে দৈহিক কষ্ট দিলে কষ্টপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু দারদার মুখ থেকে এ হাদীসটি শোনার সাথে সাথে আনসারী লোকটি– যে তখন

দারুণ উত্তেজিত ছিল, রাজী হয়ে গেল। সে আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলো, হাদীসটি কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন· হ্যাঁ। আনসারী বললেন, তাহলে আমি তাঁকে মাফ করে দিলাম। (মুসনাদ–৬/৪৪৮)

তিনি সব সময় সব রকম ফিত্না ও অশান্তি থেকে দূরে থাকতেন। হিজায অপেক্ষা শাম কোন দিক দিয়েই ভালো ছিল না। তবে ফিত্না ও অশান্তি থেকে দূরে থাকার জন্যই শামে বসবাস করতেন। তিনি বলতেন, যেখানে দু'জন লোকও একহাত পরিমাণ ভূমির জন্য বিবাদ করে সে স্থানও ত্যাগ করা আমি পসন্দ করি।

তিনি নির্জনতা ভালোবাসতেন। তিনি বলতেনঃ একজন মুসলমানের সবচেয়ে ভালো ইবাদাতগাহ্ তার বাড়ী। সেখানে তাঁর নাফ্স, চোখ ও লজ্জাস্থান সর্বাধিক সংযত থাকে। তিনি আরো বলতেন তোমরা বাজারের মজলিস থেকে দূরে থাক। কারণ, এসব মজলিস তোমাদেরকে খেলা ও হাসি–তামাশার দিকে নিয়ে যায়। (কানযুল 'উম্মাল–২/১৫৯; হায়াতুস সাহাবা–২/৬৫০)

তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতে এবং চিন্তা–অনুধ্যানে সময় কাটাতে পসন্দ করতেন। 'আউন ইবন 'আবদিল্লাহ একবার উম্মু দারদাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু দারদার সর্বোত্তম আমল ছিল কোনটি? বললেনঃ গভীর চিন্তা ও অনুধ্যান। আবু দারদা আরও বলেতেনঃ এক ঘন্টা চিন্তা করা সারারাত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম। (সিফাতুস সাফওয়া–১/২৫৮; কানযুল 'উম্মাল–২/১৪২; হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৭) তিনি আরও বলতেনঃ তোমরা যেমন কথা বলা শেখ, তেমনি চুপ থাকাও শেখ। কারণ, চুপ থাকা বিরাট সহনশীলতা। বলার চেয়ে শোনার প্রতি আগ্রহী হও। অহেতুক কোন কথা বলো না। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৩২)

তিনি সব সময় হাসি মুখে থাকতেন এবং মানুষের সাথে খোশ– মেযাজে মিশতেন। কথা বলার সময় ঠোঁটে হাসি ঝরতো। আর এ হাসিকে স্ত্রী উম্মু দারদা মর্যাদার পরিপন্থী মনে করতেন। একদিন তো বলেই বসলেন, এই যে আপনি প্রতি কথায় মুচকি হাসি দেন, এতে লোকে আপনাকে নির্বোধ মনে না করে। আবু দারদা বললেনঃ রাসূল (সা) তো কথা বলার সময় মৃদু হাসতেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২০৩)

তাঁর স্বভাব ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। দিমাশ্কের মসজিদ চত্বরে নিজ হাতে গাছ লাগাতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী ও মসজিদের হালকায়ে দারসের ইমাম হয়ে এত ছোট ছোট কাজ নিজ হাতে করাতে লোকে অবাক হয়ে যেত। এক ব্যক্তি তো একবার তাঁকে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে বসে, আপনি নিজেই এমন কাজ করেন? আবু দারদা তাঁর বিস্ময়ের জবাবে বলেন, এতে খুব সওয়াব।

তিনি অত্যন্ত দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অভাব–অনাটন সত্ত্বেও মেহমানের খিদমতের কোন প্রকার ত্রুটি কক্ষণো করতেন না। অধিকাংশ সময় তাঁর বাড়ীতে লোক থাকতেন। কোন মেহমান এলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ থাকবেন না চলে যাবেন? যদি যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতো, তাহলে তিনি তার পাথেয় দিয়ে দিতেন। কোন কোন লোক কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতো। হযরত সালমান আল–ফারেসী–দিমাশ্কে গেলে তাঁরই বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

তাঁর অন্তরটি ছিল বড় কোমল ও উদার। কাউকে ঘৃণা করা বা গালি দেওয়া পসন্দ করতেন না। একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। দেখলেন, বেশ কিছু লোক এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, সে কোন পাপ কাজ করেছে। হযরত আবু দারদা লোকদের বললেন, কেউ কুয়ায় পড়ে গেলে তাকে টেনে তোলা উচিত। গালি দেওয়াতে কোন কল্যাণ নেই। তোমরা যে এ পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছ, সেটাই সৌভাগ্য মনে কর। লোকেরা

তখন প্রশ্ন করলো, আপনি কি এ ব্যক্তিকে খারাপ মনে করেন না? বললেনঃ স্বভাবগতভাবে লোকটির মধ্যে কোনরকম খারাবি নেই; তবে তার এ কাজটি খারাপ। যখন সে এ কাজ ছেড়ে দেবে তখন সে আবার আমার ভাই। (উসুদুল গাবা-৪/১৫০; কানযুল 'উম্মাল-২/১৭৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৮)

তাঁর স্বভাবটি ছিল বড় ঐশ্বর্যমন্ডিত। কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরোধী। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির আসলেন শামে। বহু সাহাবী তাঁর কাছে গিয়ে নিজ নিজ ভাতা গ্রহণ করলেন। কিন্তু আবু দারদা গেলেন না। বাধ্য হয়ে 'আবদুল্লাহ নিজেই ভাতা নিয়ে তাঁর গৃহে হাজির হলেন এবং বললেনঃ আপনি যাননি তাই আমি নিজেই ভাতা নিয়ে হাজির হয়েছি। তিনি বললেনঃ রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, যখন আমীরগণ নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে নেয় তখন তোমরাও নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেবে। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৭১)

তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আবুল বাখতারী থেকে বর্ণিত। একবার আবু দারদা একটি হাঁড়িতে কিছু জ্বাল দিচ্ছিলেন। পাশেই হযরত সালমান আল-ফারেসী বসেছিলেন। এমন সময় আবু দারদা ছোট বাচ্চাদের আওয়াযের মত হাঁড়ির মধ্যে তাসবীহ পাঠের আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে সালমানকে ডেকে বললেনঃ সালমান! দেখ, দারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার। তুমি বা তোমার বাপ-দাদা কেউ কক্ষনো এমন ঘটনা দেখনি। সালমান বললেনঃ তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আল্লাহর এর থেকে বড় নিদর্শন দেখতে পেতে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৮৬)

আবু নু'য়াইম 'আল-হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২১০) 'আউফ ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আউফ স্বপ্নে একটি চামড়ার নির্মিত গম্বুজ ও একটি চারণক্ষেত্র দেখলেন। গম্বুজের পাশে একপাল ছাগল শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কার? বলা হলো, আবদুর রহমান ইবন আউফের। কিছুক্ষণ পর আবদুর রহমান ইবন আউফ বের হয়ে আসলেন। বললেন ঃ হে আউফ, কুরআনের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এ সবকিছু দান করেছেন। যদি তুমি এ রাস্তার দিকে একটু তাকাও তাহলে এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যা তোমার চোখ কখনো দেখেনি, তোমার কান কখনো সে সম্পর্কে কিছু শোনেনি এবং তোমার অন্তরে তার কল্পনাও কখনো উদয় হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা তা আবু দারদার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। কারণ, তিনি দু'হাত ও বুক দিয়ে দুনিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। (উসুদুল গাবা-৫/১৮৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৭২)

তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁর দ্বীনী-ভাই হযরত সালমান আল-ফারেসীর সাথে আজীবন গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আশ'য়াস ইবন কায়স ও জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালী একবার সালমান আল-ফারেসীর নিকট আসলেন। তিনি তখন মাদায়েনের একটি দূর্গে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি সালমান আল-ফারেসী? বললেন ঃ হা। আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী? বললেন ঃ জানিনে। তখন তাঁরা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল। তাঁরা মনে করলেন, আমরা যাঁকে খুঁজছি, এ তিনি নন। তাঁদের এ ইতস্তত: ভাব দেখে সালমান বললেন ঃ তোমরা যাঁকে খুঁজছো আমি সেই ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছি, তাঁর সাথে উঠা-বসা করেছি। আর সাহাবী তো সেই যে রাসূলের (সা) সাথে জান্নাতে যাবে। যাই হোক, তোমাদের কী প্রয়োজন? তাঁরা বললেন ঃ শামে অবস্থানরত আপনার এক ভাইয়ের নিকট থেকে আমরা এসেছি। তিনি জানতে চাইলেন ঃ কে সে? তারা বললেন ঃ আবু দারদা। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তোমাদের সাথে পাঠানো তাঁর

উপহার সামগ্রী কোথায়? তাঁরা বললেন ঃ আমাদের সাথে তো কোন উপহার পাঠাননি। আবু দারদা বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথভাবে আমানত আদায় কর। তাঁর নিকট থেকে যেই এসেছে, তার সাথে কিছু না কিছু হাদিয়া তিনি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ এভাবে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না। এই আমাদের অর্থকড়ি থেকে যা খুশী আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের অর্থকড়ি চাইনা। যে হাদিয়া পাঠিয়েছেন শুধু তাই চাই। তখন তাঁরা শপথ করে বললেন, কোন হাদিয়া তিনি পাঠাননি। তবে তিনি আমাদেরকে একথা বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, রাসূল (সা) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেন তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ডাকতেন না। তোমরা যখন তাঁর কাছে যাবে, তাঁকে আমার সালাম পৌছে দেবে। আবু দারদা বললেন ঃ এছাড়া আর কি হাদিয়া আমি তোমাদের কাছে চাচ্ছি? সালামের চেয়ে উত্তম হাদিয়া আর কী হতে পারে? (হায়াতুস সাহাবা–২/৪৯২–৪৯৫)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন তাঁর জাহিলী যুগের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ভাই। তাঁরই দাওয়াত ও চেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি সে সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন। তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা লজ্জা পায় আমার এমন কোন 'আমল তাঁর কাছে উপস্থাপনের ব্যাপারে আমি আপনার পানাহ্ চাই। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩৮৪)

এছাড়া হযরত আবু দারদার বহু দ্বীনী ইয়ার–বন্ধু ছিলেন। তিনি নামাযের পর তাঁদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মুল দারদা (রা) বলেন ঃ আবু দারদার ৩৬০ জন আল্লাহর পথের বন্ধু ছিলেন। নামাযে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দু'আ করতেন। আমি তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কোন মানুষ দূর থেকে যখন তার কোন ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন আল্লাহ তার জন্য দু'জন ফিরিশতা নিয়োগ করেন। তারা বলতে থাকেঃ তোমার ভাইয়ের জন্য তুমি যা কামনা করছো, আল্লাহ তোমাকেও তা দান করুন। ফিরিশতারা আমার জন্য দু'আ করুক, তাকি আমি চাইবো না? (তারীখুল ইসলাম–২/১১১)

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও 'আশেক। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তাঁকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে, রাতে তাঁর ঘরের সামনে শুয়ে থাকতেন, যাতে তিনি প্রয়োজন হলে তাঁকে জাগিয়ে তুলে তাঁকে কাজে লাগাতে পারেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৮৮)

পরোক্ষভাবে কুরআনের একটি আয়াতও তাঁর শানে নাযিল হয়েছে। শুরাইহ ইবন 'উবাইয়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি একদিন আবু দারদাকে বিদ্রুপ করে বললো ঃ ওহে ক্বারীদের দল! তোমাদের হয়েছে কি যে, তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী ভীরু ও বেশী কৃপণ? কিন্তু খাওয়ার সময় তোমাদের গ্রাসটি তো হয় সবচেয়ে বড়। আবু দারদা তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। বিষয়টি 'উমারের কানে গেল। তিনি আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন। তাদের সব কথাই কি আমরা ধরবো? তখন 'উমার সেই লোকটির নিকট গিয়ে তার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান। লোকটি বললো ঃ আমরা একটু হাসি–মাশ্কারা করছিলাম। তখন সূরা তাওবার ৬৫ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪৬৩)

মু'য়াবিয়া ইবন কুররা বলেন ঃ একবার আবু দারদা অসুস্থ হলেন। বন্ধুরা দেখতে গেলেন। তাঁরা বললেন ঃ আপনার অভিযোগ কিসের বিরুদ্ধে? বললেন ঃ আমার গুনাহ্র বিরুদ্ধে। আপনার সর্বশেষ কামনা কী? বললেন ঃ জান্নাত। তাঁরা বললেন ঃ আমরা কি একজন ডাক্তার

ডাকবো? বললেন ঃ প্রয়োজন নেই। শ্রেষ্ঠতম ডাক্তারই তো আমাকে এ কষ্ট দিয়েছেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮১)

আবু নু'য়াইম 'আল-হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২১২) জুবাইর ইবন নুফাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ 'কিবরিস' বিজয়ের দিন অনেক মুজাহিদ কেঁদে ফেলেন। আমি দেখলাম, আবু দারদা একাকী বসে বসে কাঁদছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করলেন, সে দিন এভাবে কাঁদার কারণ কি? বললেন ঃ জুবাইর, তোমার ধ্বংস হোক। যে মানুষ আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দেয় সে কতই না নিকৃষ্ট জীব। এই জাতি ছিল শক্তিশালী ও বিজয়ী। তাদের ছিল একটি রাষ্ট্র। তারা আল্লাহর আদেশ ছেড়ে দেয়। তাই তাদের এ পরিণতি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৮১)

একবার হযরত মুয়াবিয়া আবু দারদাকে লিখলেন ঃ আপনি আমাকে দিমাশ্‌কের ফাসিকদের একটা তালিকা দিন। জবাবে তিনি বললেন ঃ তাদের সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি কিভাবে তাদের চিনবো? কিন্তু তাঁর ছেলে বিলাল বললেন ঃ আমিই তাদের তালিকা পাঠাবো। সত্যিই তিনি তালিকা তৈরী করলেন। তখন আবু দারদা বললেন ঃ কিভাবে তুমি তাদেরকে চিনলে? তুমি তাদের দলের একজন না হলে তাদেরকে চিনতে পার না। তোমার নামটি দিয়েই তালিকা শুরু কর। একথার পর বিলাল আর তালিকা পাঠাননি। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৪)

হযরত আবু দারদা মানুষকে বলতেন ঃ তোমরা দুনিয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, এ দুনিয়া হারূত ও মারূত অপেক্ষা বড় জাদুকর। (লিসানুল-মীযান-৭/৪৪) তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে পূণ্যবানদের সাথে মরণ দিন এবং পাপাচারীদের সাথে বাঁচিয়ে রাখবেন না। তিনি আরো দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আলিমদের অভিশাপ থেকে আপনার পানাহ চাই। যখন জানতে চাওয়া হলো, তারা কিভাবে আপনাকে অভিশাপ দেবে? বললেন ঃ আমাকে ঘৃণা করবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৪)

হযরত আবু দারদা (রা) সম্পর্কে অনেক টুকরো টুকরো কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ ও শিক্ষনীয়। ইবন হাজারের (রহ) মত আমরাও বলি, তাঁর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী অনেক যা ছোটখাট কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না। (তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৫৬)

হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)

আসল নাম হুজাইফা, ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ, এবং লকব বা উপাধি 'সাহিবুস সির'। গাতফান গোত্রের 'আবস শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে আল-'আবসীও বলা হয়। পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হাসাল ইবন জাবির এবং মাতার নাম রাবাহ বিনতু কা'ব ইবন 'আদী ইবন 'আবদিল আশহাল, মদীনার আনসার গোত্র আউসের আবদুল আশহাল শাখার কন্যা। ইবন হাজার (রহ) বলেন ঃ এ হুজাইফা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী। (আল-ইসাবা-১/৩১৭; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-১/২৭৭)

হুজাইফার পিতা হুসাইল ছিলেন মূলতঃ মক্কার বনী 'আবস গোত্রের লোক। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াসরিবে আশ্রয় নেন। সেখানে বনী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সাথে প্রথমে মৈত্রীচুক্তি, পরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। মদীনার আনসার গোত্রসমূহের আদি সম্পর্ক মূলতঃ ইয়ামানের সাথে। হুসাইল তাদের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত 'আল-ইয়ামান' বলে। এজন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান বলা হয়। (দ্রঃ শাজারাতুয্ যাহাব-১/৪৪; আল-ইসাবা-১/৩১৭; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩) এ ইয়ামান আবদুল আশহাল গোত্রে যে বিয়ে করেন সেখানে তাঁর নিম্নোল্লেখিত সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন ঃ ১· হুজাইফা, ২· সা'দ, ৩· সাফওয়ান; ৪· মুদলিজ, ৫· লাইলা। এঁরা ইতিহাসে ইয়ামানের বংশধর নামে খ্যাত।

আল-ইয়ামানের মক্কায় প্রবেশে যে বাধা ও ভয় ছিল ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে যায়। তিনি মাঝে মধ্যে মক্কা-ইয়াসরিবের মধ্যে যাতায়াত করতেন। তবে বেশী থাকতেন ইয়াসরিবে। এদিকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান বনী 'আবসের এগারো ব্যক্তিকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখনও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেননি। সুতরাং হুজাইফা মূলের দিক থেকে মক্কার তবে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১২২)

হযরত হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান মুসলমান হন মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে। পিতার সাথে মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে হুজাইফা মুসলিম পিতা-মাতার কোলে বেড়ে ওঠেন। এবং হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) দেখার সৌভাগ্য অর্জনের আগেই মুসলিম হন। ভাই-বোনের মধ্যে শুধু তিনি ও সাফওয়ান এ গৌরবের অধিকারী হন। মুসলিম হওয়ার পর রাসূলকে (সা) একটু দেখার আগ্রহ জন্মে। দিন দিন এ আগ্রহ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তিনি সব সময় যাঁরা রাসূলকে (সা) দেখেছেন, তাঁদের কাছে রাসূলের (সা) চেহারা-সুরত ও গুণ-বৈশিষ্ট কেমন তা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন। শেষে একদিন সত্যি সত্যি মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হন এবং হিজরাত ও নুসরাতের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। রাসূল (সা) তাঁকে দু'টোর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করেন। হুজাইফা বলেন ঃ রাসূল (সা) হিজরাত ও নুসরাত (মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান)-এর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করেন। আমি নুসরাতকে বেছে নিলাম। (উসুদুল গাবা-১/৩৯৪; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩; আল-ইসাবা-১/৩১৮) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ মক্কার প্রথম সাক্ষাতে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি

মুহাজির না আনসার? রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ তুমি মুহাজির বা আনসার যে কোন একটি বেছে নিতে পার। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনসারই হবো। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা–৪/১২৩–১২৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ–সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিধান চালু করেন। তিনি হুজাইফা ও 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে পরস্পরের দ্বীনী ভাই বলে ঘোষণা করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫০৬)

হযরত হুজাইফা বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। ইবন সা'দ তাঁকে যে সকল সাহাবী বদরে যোগদান করেননি তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–১/৯৪) এ যুদ্ধে হুজাইফা ও তাঁর পিতার যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ আমার বদরে যোগদানে কোন বাধা ছিল না। তবে আমার আব্বার সাথে আমি তখন মদীনার বাইরে। আমাদের মদীনায় ফেরার পথে কুরাইশ কাফিররা পথরোধ করে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বললাম ঃ মদীনায়। তারা বললো ঃ তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মাদের কাছেই যাচ্ছো? আমরা বললাম ঃ আমরা শুধু মদীনায় যাচ্ছি। তা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশেষে তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিল। তবে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে, আমরা মদীনায় গিয়ে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহাম্মাদকে (সা) কোনভাবে সাহায্য করবো না। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) কুরাইশদের নিকট কৃত অঙ্গীকারের কথা বলে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখন আমরা কী করবো? বললেন ঃ তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর। আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবো। (তারীখুল ইসলাম ঃ যাহাবী–২/১৫৩; সহীহ মুসলিম–২/৮৯; তাহজীবুত তাহজীব–২/১৯৩; আল–ইসাবা–১/৩১৭)

হযরত হুজাইফা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে যোগদান করেন। তিনি দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করেন এবং নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শাহাদাত বরণ করেন। আর সে শাহাদাত ছিল স্বপক্ষীয় মুসলিম সৈনিকদের হাতে। ঘটনাটি এ রকম ঃ

উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর পিতা আল–ইয়ামান ও সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। যুদ্ধের আগে নারী ও শিশুদের একটি নিরাপদ দুর্গে রাখা হয়। আর এ দুই বৃদ্ধকে রাখা হয় ঐ দুর্গের তত্ত্বাবধানে। যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন আল–ইয়ামান সঙ্গী সাবিতকে বললেন ঃ তোমার বাপ নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? পিপাসিত গাধার স্বল্পায়ুর মত আমাদের সবার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা খুব বেশী হলে আজ অথবা কাল পর্যন্ত বেঁচে আছি। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট চলে যাওয়া? হতে পারে, আল্লাহ তাঁর নবীর (সা) সাথে আমাদের শাহাদাত দান করবেন। তাঁরা দু'জন তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক বাহিনী পরাজয় বরণ করে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল। তখন এক দুরাচারী শয়তান চেচিয়ে বলে ওঠে, দেখ, মুসলমানরা এসে পড়েছে। একথা শুনে পৌত্তলিক বাহিনীর একটি দল ফিরে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের একটি দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল–ইয়ামান ও সাবিত দু'দলের তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান। পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে সাবিত শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু হুজাইফার পিতা আল–ইয়ামান শহীদ হন মুসলমানদের হাতে।। না চেনার কারণে এবং যুদ্ধের ঘোরে এমনটি ঘটে যায়। হুজাইফা কিছু দূর থেকে পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠেন ঃ 'আমার আব্বা, আমার আব্বা' বলে। কিন্তু সে চিৎকার কারো কানে পৌঁছেনি। যুদ্ধের শোরগোলে তা অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিজ সঙ্গীদের তরবারির আঘাতে ঢলে পড়ে গেছেন। হুজাইফা পিতার মৃত্যু

নিশ্চিত হয়ে শুধু একটি কথা উচ্চারণ করেন ঃ 'আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হুজাইফাকে তাঁর পিতার 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার আব্বা তো শাহাদাতেরই প্রত্যাশী ছিলেন, আর তিনি তা লাভ করেছেন। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, আমি তাঁর দিয়াত বা রক্তমূল্য মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম। রাসূল (সা) দারুণ খুশী হলেন। (দ্রঃ সহীহ বুখারী–২/৫৮১; সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৭; হায়াতুস সাহাবা–১/৫১৯; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা–৪/১২৫–১২৭)

হযরত হুজাইফা খন্দক যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরাইশরা এমন তোড়জোড় করে ধেয়ে আসে যে, মদীনায় ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত কুরাইশ বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, আর সেইসাথে মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক খনন করেন। একদিন রাতে এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। আর তা মুসলমানদের জন্য এক অদৃশ্য সাহায্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কুরাইশ মদীনার আশে–পাশের বাগানগুলিতে শিবির সংস্থাপন করে আছে। হঠাৎ এমন প্রচন্ড বাতাস বইতে শুরু করলো যে, রশি ছিড়ে তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, হাঁড়ি–পাতিল উল্টে–পাল্টে গেল এবং হাড় কাঁপানো শীত আরম্ভহলো। আবু সুফইয়ান বললো, আর উপায় নেই, এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে। (তাবাকাত–২/৫০)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুরাইশ বাহিনী নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি সেই ভয়াল দুর্যোগময় রাতে হুজাইফার শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাতের অন্ধকারে কাউকে কুরাইশ বাহিনীর অভ্যন্তরে পাঠিয়ে তাদের খবর সংগ্রহের ইচ্ছা করলেন। আর এ দুঃসাহসী অভিযানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত হুজাইফাকে নির্বাচন করেন। এ অভিযান সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থসমূহে নানা রকম বর্ণনা দেখা যায়। একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) সঙ্গীদের বললেন ঃ 'যদি কেউ মুশরিকদের খবর নিয়ে আসতে পারে, তাকে আমি কিয়ামতের দিন আমার সাহচর্যের খোশখবর দিচ্ছি।' একে তো দারুণ শীত, তার উপর প্রবল বাতাস। কেউ সাহস পেল না। রাসূল (সা) তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন; কিন্তু কোন দিক থেকে কোন রকম সাড়া পেলেন না। চতুর্থবার তিনি হুজাইফার নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ 'তুমি যাও, খবর নিয়ে এসো।' যেহেতু নাম ধরে ডেকেছেন, সুতরাং আদেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না।

অন্য একটি বর্ণনা মতে হুজাইফা নিজেই বলেন ঃ 'আমরা সে রাতে কাতারবন্দী হয়ে বসেছিলাম। আবু সুফইয়ান ও মক্কার মুশরিক বাহিনী ছিল আমাদের উপরের দিকে, আর নীচে ছিল বনী কুরাইজার ইহুদী গোত্র। আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে আমরা ছিলাম শঙ্কিত। আর সেইসাথে ছিল প্রবল ঝড়–ঝন্ঝা ও ঘোর অন্ধকার। এমন দুর্যোগপূর্ণ রাত আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। বাতাসের শব্দ ছিল বাজ পড়ার শব্দের মত। আর এমন ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার ছিল যে, আমরা আমাদের নিজের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এদিকে মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা একজন একজন করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলতে লাগলো ঃ আমাদের ঘর–দোর শত্রুর সামনে একেবারেই খোলা। তাই একটু ঘরে ফেরার অনুমিত চাই। মূলতঃ অবস্থা সে রকম ছিল না। কেউ যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেই তিনি অনুমতি দিচ্ছিলেন। এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমরা তিন শো বা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোক থাকলাম।

এমন এক সময় রাসূল (সা) উঠে এক এক করে আমাদের সবার কাছে আসতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছেও আসলেন। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার গায়ে একটি চাদর ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাদরটি ছিল আমার স্ত্রীর, আর তা খুব টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত পড়ছিল। তিনি আমার একেবারে কাছে আসলেন। আমি মাটিতে বসে ছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই তুমি কে? বললাম ঃ হুজাইফা। হুজাইফা? এই বলে মাটির দিকে একটু ঝুঁকলেন, যাতে আমি তীব্র ক্ষুধা ও শীতের মধ্যে উঠে না দাঁড়াই। আমি বললাম ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ কুরাইশদের মধ্যে একটি খবর হচ্ছে। তুমি তাদের শিবিরে যেয়ে আমাকে তাদের খবর এনে দেবে।

আমি বের হলাম। অথচ আমি ছিলাম সবার চেয়ে ভীতু ও শীতকাতর। রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপর-নীচে, সব দিক থেকে তুমি তাকে হিফাজত কর।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'আ শেষ হতে না হতে আমার সব ভীতি দূর হলো এবং শীতের জড়তাও কেটে গেল।

আমি যখন পিছন ফিরে চলতে শুরু করেছি তখন তিনি আমাকে আবার ডেকে বললেন ঃ হুজাইফা! আমার কাছে ফিরে না এসে আক্রমণ করবে না। বললাম ঃ ঠিক আছে। আমি রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলতে লাগলাম। এক সময় চুপিসারে কুরাইশদের শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন আমি তাদেরই একজন।

আমার পৌঁছার কিছুক্ষণ পর আবু সুফইয়ান কুরাইশ বাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তা মুহাম্মাদের কাছে পৌঁছে যায় কিনা। তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখ। একথা শোনার সাথে সাথে আমার পাশের লোকটির হাত মুট করে ধরে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে তুমি? সে জবাব দিল অমুকের ছেলে অমুক।

আবু সুফইয়ান বললেন ঃ 'ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা কোন নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের ঘোড়াগুলি মরে গেছে, উটগুলি কমে গেছে এবং মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজাও আমাদের ছেড়ে গেছে। তাদের যে খবর আমাদের কাছে এসেছে তা সুখকর নয়। আর কেমন প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি, তাও তোমরা দেখছো। আমাদের হাঁড়িও আর নিরাপদ নয়। আগুনও জ্বলছেনা। সুতরাং ফিরে চলো। আমি চলছি।' একথা বলে তিনি উটের রশি খুললেন এবং পিঠে চড়ে বসে তার গায়ে আঘাত করলেন। উট চলতে শুরু করলো। কোন কিছু ঘটাতে রাসূল (সা) যদি নিষেধ না করতেন তাহলে একটি মাত্র তীর মেরে তাকে হত্যা করতে পারতাম।

আমি ফিরে এলাম। এসে দেখলাম রাসূল (সা) তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। নামায শেষ করে তিনি আমাকে তাঁর দু'পায়ের কাছে টেনে নিয়ে চাদরের এক কোনা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি সব খবর তাঁকে জানালাম। তিনি দারুণ খুশী হলেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশ করলেন। হযরত হুজাইফা সে দিন বাকী রাতটুকু রাসূলুল্লাহর (সা) সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে সেখানেই কাটিয়ে দেন। প্রত্যুষে রাসূল (সা) তাঁকে ডাকেন ঃ ইয়া নাওমান-ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি।' (দ্রঃ সহীহ মুসলিম-২/৮৯; তারীখু ইবন আসাকির-১/৯৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৮-৩৩০; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১২৯-১৩৬)

একবার কূফার এক লোক হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে বললো ঃ আবু 'আবুদিল্লাহ! আপনি কি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন? তাঁর সুহবত সাহচর্য পেয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ, ভাতিজা। লোকটি আবার প্রশ্ন কললো ঃ আপনারা কেমন আচরণ করতেন? বললেন ঃ তাঁর আদেশ পালনের চেষ্টা করতাম। লোকটি বললো ঃ আমরা রাসূলকে (সা)

পেলে মাটিতে হেঁটে চলতে দিতাম না, কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতাম। তিনি বললেন ঃ আমি খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নিজেকে দেখেছি। এই বলে তিনি খন্দকের সেই রাতের ভয়–ভীতি, ঝড়, শৈত্য ইত্যাদির এক চিত্র তুলে ধরলেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/২৬৪)

খন্দক পরবর্তী রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বা তাঁর পরের সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর তিনি ইরাকে বসতি স্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন সময় কূফা, নিস্‌সীবীন ও মাদায়েনে বসবাস করেন। নিস্‌সীবীনের 'আল–জাযীরা' শহরে একটি বিয়েও করেন। (উসুদুল গাবা–১/৩৯৪)

হযরত হুজাইফা যে পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামজান, মাহ্‌ রায় প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং গোটা ইরাক ও পারস্যবাসীকে কুরআনের এক পাঠের ওপর সমবেত করেন, একথা খুব কম লোকেই জানে। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবার টীকা–১/২৭৮; তাহজীবুত তাহজীব–২/১৯৩)

ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত 'উমার (রা) সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজের জন্য তিনি দু'জন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। ফুরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে হযরত 'উসমান ইবন হুনাইফ এবং দিজলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে হযরত হুজাইফাকে নিয়োগ করেন। দিজলা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির। তারা হযরত হুজাইফাকে তার কাজে কোন রকম সাহায্য তো দূরের কথা বরং নানা রকম বাধার সৃষ্টি করলো। তা সত্ত্বেও তিনি বন্দোবস্ত দিলেন। এর ফলে সরকারী আয় অনেকটা বেড়ে গেল। এরপর তিনি মদীনায় এসে খলীফা 'উমারের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। খলীফা তাঁকে বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ যমীনের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে।' হুজাইফা বললেন ঃ আমি অনেক বেশী ছেড়ে দিয়েছি। (কিতাবুল খিরাজ–২১)

হযরত হুজাইফা ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমুক যুদ্ধের বিজয়ের খবর সর্বপ্রথম তিনিই মদীনায় খলীফা 'উমারের নিকট নিয়ে আসেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৪/৯৩, ৯৪)

হিজরী ১৮ সনে নিহাওয়ান্দের ওপর সেনা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। অবশ্য আবু 'উবাইদাহ বলেন, হিজরী ২২ সনে হুজাইফা নিহাওয়ান্দে যান। (তারীখু ইবন আসাকির–১/১০০) এই নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল দেড় লাখ। খলীফা হযরত 'উমার (রা) মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন হযরত নু'মান ইবন মুকাররিনকে। তারপর তিনি কূফায় অবস্থানরত হযরত হুজাইফাকে একটি চিঠিতে সেখান থেকে একটি বাহিনী নিয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রা করার জন্য নির্দেশ দেন। এদিকে খলীফা মুসলিম মুজাহিদদের প্রতি জারি করা এক ফরমানে বললেন, চারদিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা যখন এক স্থানে সমবেত হবে তখন প্রত্যেক স্থান থেকে আগত বাহিনীর একজন করে আমীর থাকবে। আর গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন, নু'মান ইবন মুকাররিন। নু'মান যদি শাহাদাত বরণ করেন, হুজাইফা হবেন পরবর্তী আমীর। আর তিনি শহীদ হলে আমীর হবেন জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ আল–বাজালী। এভাবে খলীফা সে ফরমানে একের পর এক সাতজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন। হযরত নু'মান নিহাওয়ান্দের অদূরে শিবির স্থাপন করে বাহিনীর দায়িত্ব বন্টন করেন। সেখানে হযরত হুজাইফাকে দক্ষিণ ভাগের অফিসার নিয়োগ করা হয়।

দু'বাহিনী মুখোমুখি হলো। শত্রুসৈন্য দেড় লাখ, আর মুসলমান সৈন্য মাত্র তিরিশ হাজার। প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। ইতিহাসে এমন যুদ্ধের নজীর খুব কমই আছে। মুসলিম বাহিনীর এক নম্বর অধিনায়ক নু'মান শাহাদাত বরণ করলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনিও হুজাইফাকে

আমীর নিয়োগের অসীয়াত করে যান। তাঁর শাহাদাতের পর আশে পাশের সৈনিকরা যখন নতুন আমীরের সন্ধান করছে তখন হযরত মা'কাল হুজাইফার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ইনিই তোমাদের পরবর্তী আমীর। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের বিজয় দান করবেন।

হযরত হুজাইফা সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুদ্ধ তখন ঘোরতর রূপ ধারণ করেছে। তিনি পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে নু'মানের শাহাদাতের খবর প্রচার করতে নিষেধ করে দিলেন। আর সাথে সাথে নু'মানের স্থলে ভাই নু'য়াঈমকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাতে নু'মানের শাহাদাতে যুদ্ধের ওপর কোন রকম প্রভাব না পড়ে। এ কাজগুলি তিনি করলেন মুহূর্তের মধ্যে। তারপর তিনি ঝড়ের গতিতে চিরে-ফেঁড়ে পারসিক বাহিনীর সামনে পৌঁছে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

'আল্লাহু আকবার ঃ সাদাকা ও'য়াদাহ্
আল্লাহ আকবার ঃ নাসারা জুনদাহ্'
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ- তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ- তিনি তাঁর সিপাহীদের সাহায্য করেছেন।

তারপর তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মেরে শত্রু বাহিনীর দিকে ফিরিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেনঃ 'ওহে মুহাম্মাদের (সা) অনুসারীরা! এখানে, এদিকে জান্নাত তোমাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমরা আর দেরী করোনা।

ওহে বদরের যোদ্ধারা! ছুটে এসো। ওহে খন্দক, উহুদ ও তাবুকের বীরেরা! সামনে এগিয়ে চলো।' এভাবে তিনি সেদিন নজীরবিহীন সাহস ও বিজ্ঞতার পরিচয় দান করেন। (দ্রঃ তাবারী-৫/২৬০১, ২৬০৫, ২৬৩২; যাহাবী ঃ তারীখ-২/৩৯-৪১; রিজালুন হাওলার রাসূল-১৯৯)

নিহাওয়ান্দে ছিল একটি অগ্নি উপাসনা কেন্দ্র। তার প্রধান ধর্মগুরু একদিন হুজাইফার নিকট এসে বললেন, যদি আমার নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয় তাহলে আমি একটি মহামূল্যবান গুপ্ত সম্পদের সন্ধান দিতে পারি। হযরত হুজাইফা (রা) তাঁকে আশ্বাস দিলেন। লোকটি পারস্য সম্রাটের অতিমূল্যবান মনি-মুক্তা এনে হাজির করলেন। হযরত হুজাইফা (রা) গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশসহ সেই মহামূল্যবান মনি-মুক্তা মদীনায় খলীফা 'উমারের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত 'উমার (রা) মনি-মুক্তা দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। ইবন মুলাইকাকে ডেকে বললেন, এক্ষুণি এগুলি নিয়ে যাও। আর হুজাইফাকে বল, এগুলি বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সৈন্যদের মধ্যে যেন বন্টন করে দেয়। হযরত হুজাইফা তখন নিহাওয়ান্দের 'মাহ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি সেই ধনরত্ন চার কোটি দিরহামে বিক্রী করেন। (তাবারী-৫/২৬২৭,২৬৩০)

ইবন আসাকির বলেন, নিহাওয়ান্দের শাসক বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিযিয়া দানের অঙ্গীকার করে হযরত হুজাইফার সাথে সন্ধি করেন। নিহাওয়ান্দের পর তিনি বিনা বাধায় 'দায়নাওয়ার' জয় করেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস পূর্বেই এ দায়নাওয়ার জয় করেছিলেন; কিন্তু অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। তারপর হযরত হুজাইফা বিনা যুদ্ধে একে একে মাহ্, হামাজান, ও রায় জয় করেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০০)

মাহ্-এর অধিবাসীদের সাথে হযরত হুজাইফা (রা) যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তা নিম্নরূপ ঃ

"হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান মাহবাসীদের জান, মাল ও বিষয়-সম্পত্তির এ নিরাপত্তা দান করছেন যে, তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হবেনা। এবং ধর্ম ত্যাগের জন্য কোন রূপ জোর-জবরদস্তি করা হবে না। তাদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যতদিন বাৎসরিক

জিযিয়া আদায় করবে, পথিকদের পথের সন্ধান দেবে, পথ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, এখানে অবস্থানরত মুসলিম সৈনিকদের একদিন এক রাত আহার করাবে এবং মুসলমানদের শুভাকাংখী থাকবে, ততদিন তাদের এ নিরাপত্তা বলবৎ থাকবে। আর যদি তারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বা তাদের আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহলে তাদের কোন দায়–দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর থাকবে না।" হিজরী ১৯ সনের মুহাররাম মাসে এ চুক্তিপত্রটি লেখা হয় এবং তাতে কা'কা', নু'য়াইম ইবন মুকাররিন ও মুয়ায়িদ ইবন মুকাররিন সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দান করেন। (তাবারী–৫/২৬৩৩)

উল্লেখিত অভিযানসমূহ শেষ করে হযরত হুজাইফা তাঁর পূর্বের ভূমি বন্দোবস্তদানকারী অফিসার পদে ফিরে যান। (তাবারী–৫/২৬৩৮)

বালাজুরীর বর্ণনা মতে হিজরী ২২ সনে আজারবাইজান অভিযানে হযরত হুজাইফা গোটা বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি নিহাওয়ান্দথেকে আজারবাইজানের রাজধানী আরদাবীলে পৌছেন। এখানকার শাসক মাজেরওয়ান, মায়মন্দ, সুরাত, সাবৃজ, মিয়াঞ্চ প্রভৃতি স্থান থেকে একটি বাহিনী সংগ্রহ করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিযিয়া দানের শর্তে সন্ধি করে। হযরত হুজাইফা সেখান থেকে মুকাম ও রুজাইলার দিকে অগ্রসর হন এবং বিজয় লাভ করেন। ইত্যবসরে মদীনার খলীফার দরবার থেকে তাঁর বরখাস্তের নির্দেশ হাতে পৌছে। তাঁর স্থলে 'উতবা ইবন ফারকাদকে নিয়োগ করা হয়। (তাবারী–৫/২৮০৬; বিস্তারিত বর্ণনা তারীখে বালাজুরীতে এসেছে।)

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া আরব মুসলমানদের স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় খলীফা 'উমার (রা) সা'দকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফায় চলে যেতে বলেন এবং সেখানে একটি স্বাস্থ্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করে স্থায়ী সেনা ছাওনী তথা শহর পত্তনের নির্দেশ দেন। হযরত সা'দ (রা) শহর পত্তনের জন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ও সালমান ইবন যিয়াদের ওপর স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দু'জন গভীরভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান নির্বাচন করেন। আজকের কূফা শহরটি এ দু'ব্যক্তিরই নির্বাচিত স্থানে অবস্থিত। (রিজালুন হাওলার রাসূল–২০০)

উল্লেখিত অভিযান সমূহের পর খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাকে মাদায়েনের ওয়ালী নিয়োগ করেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–১/৯৪) একজন নতুন ওয়ালী আসছেন–এ খবর মাদায়েনবাসীদের কাছে পৌছে গেল। নতুন আমীরকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা দলে দলে শহরের বাইরে সমবেত হলো। তারা এ মহান সাহাবীর তাকওয়া, খোদাভীতি, সরলতা ও ইরাক বিজয়ের অনেক কথা শুনেছিল। তারা তাঁর একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাফিলার সাথে আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। না, কোন কাফিলার সাথে নয়। তারা দেখতে পেল কিছু দূরে গাধার ওপর সাওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধার পিঠে অতি পুরনো একটি জিন। তার ওপর বসে বাহনের পিঠের দু'পাশের পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবোচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন। তারা ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝলো, ইনিই সেই ওয়ালী যার প্রতীক্ষায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথমবারের মত তাদের কল্পনা হোঁচট খেল। পারস্যের কিসরা বা তাঁর পূর্ব থেকে তাদের দেশে এমন ওয়ালীর আগমন আর কক্ষণো ঘটেনি।

তিনি চললেন এবং লোকেরাও তাঁকে ঘিরে পাশপাশি চললো। তিনি আবাস স্থলে পৌছে উপস্থিত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) নিয়ম ছিল, নতুন ওয়ালী বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকার

অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। কিন্তু হযরত হুজাইফার (রা) নিয়োগ পত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিল ঃ 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।' তিনি যখন তাদের সামনে খলীফার এ ফরমান পাঠ করে শোনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়ায উঠলো, বলুন, আপনার কী প্রয়োজন। আমরা সবই দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী ও খুলাফায়ে রাশেদার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হযরত হুজাইফা বললেন ঃ 'আমার নিজের পেটের জন্য শুধু কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকবো, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইবো।' তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আরো বললেন ঃ 'তোমরা ফিতনার স্থানগুলি থেকে দূরে থাকবে। লোকেরা জানতে চাইলো, ফিত্‌নার স্থানগুলি কি? বললেন ঃ আমীর বা শাসকদের বাড়ীর দরযাসমূহ। তোমাদের কেউ আমীর বা শাসকের কাছে এসে মিথ্যা দ্বারা তার সত্যায়িত করবে এবং তার মধ্যে যা নেই তাই বলে তার প্রশংসা করবে- এটাই মূলতঃ ফিত্‌না।' এ পদে কিছু দিন থাকার পর কোন এক কারণে খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে রাজধানী মদীনায় তলব করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত হুজাইফা (রা) যে অবস্থায় একদিন মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক একই অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হুজাইফা আসছেন, এ খবর পেয়ে খলীফা মদীনার কাছাকাছি পথের পাশে এক স্থানে লুকিয়ে থাকেন। নিকটে আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন ঃ 'হুজাইফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।' তারপর সেই পদেই তাঁকে বহাল রাখেন।

(দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০০; আল-আ'লাম-২/১৭১; তাহজীবুত তাহজীব- ২/১৯৩; উসুদুল গাবা-১/৩৯২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬৬, ২/৭৩)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহ্‌লবী (রহ) হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হযরত হুজাইফা

ইবনুল ইয়ামান (রা) মাদায়েন থাকাকালে এক ইহুদী নারীকে বিয়ে করেন। খবর পেয়ে আমীরুল মুমিনীন 'উমার (রা) তাঁকে উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেন। হুজাইফা (রা) খলীফাকে প্রশ্ন করেন ঃ কিতাবী নারী বিয়ে করা কি হারাম? জবাবে 'উমার (রা) বলেন ঃ হুজাইফা! আমি তোমাকে তাকীদ দিচ্ছি, আমার এ নির্দেশ হাত থেকে রাখার পূর্বেই যেন মহিলাকে বিদায় করে দেয়া হয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার দেখাদেখি অন্য মুসলমানরাও জিম্মী নারীর রূপ ও গুণের কারণে মুসলিম মহিলাদের ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে না দেয়। আর এমন হলে তা মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি মারাত্মক ফিত্‌না বলে প্রমাণিত হবে। (ফিক্‌হে 'উমার ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, উর্দু অনুবাদ-

মাদায়েনে ওয়ালী থাকাকালে একবার জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ 'হে জনমন্ডলী! তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখ। দেখ, তারা কোথা থেকে কিভাবে উপার্জন করে তোমাদের নির্ধারিত মজুরী পরিশোধ করছে। কারণ, হারাম উপার্জন খেয়ে দেহে যে গোশ্‌ত তৈরী হয় তা কক্ষণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটাও জেনে রাখ, মদ বিক্রেতা, ক্রেতা ও তাঁর প্রস্তুতকারক, সকলেই তা পানকারীর সমান।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮২)

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের পুরো সময়টা এবং হযরত আলীর (রা) খিলাফতের কিছু দিন, একটানা এ দীর্ঘ সময় তিনি মাদায়েনের ওয়ালী পদে আসীন ছিলেন। (আল-ইসাবা-১/৩১৭) হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে হিজরী তিরিশ সনে হযরত সা'ঈদ ইবন 'আসের সাথে কূফা থেকে খুরাসানের উদ্দেশ্যে বের হন। 'তুমাইস নামক বন্দরে

শত্রু বাহিনীর সাথে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এখানে সা'ঈদ ইবন 'আস সালাতুল খাওফ (ভীতিকালীন নামায) আদায় করেন। তিনি নামায পড়ানোর পূর্বে হযরত হুজাইফার নিকট থেকে তার পদ্ধতি জেনে নেন। (মুসনাদ-৫/৩৮৫; রাবীয়া-৫/৩৮৩৬-৩৭) এরপর তিনি 'রায়'-এ যান এবং সেখান থেকে সালমান ইবন রাবীয়া ও হাবীব ইবন মাসলামার সাথে আরমেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। এ অভিযানে তিনি কূফী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। (তাবারী-৫/২৮৯৩)

হিজরী ৩১ সনে 'খাকানে খাযার'-এর বাহিনীর সাথে বড় ধরনের একটি সংঘর্ষ হয়। এতে সালমানসহ প্রায় চার হাজার মুসলিম শহীদ হন। সালমানের শাহাদাতের পর হযরত হুজাইফা গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয় এবং তাঁর স্থলে হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে নিয়োগ করা হয়।

হযরত হুজাইফা (রা) 'বাব'-এর ওপর তিনবার অভিযান চালান। (তাবারী-৫/২৮৯৪) তৃতীয় হামলাটি ছিল হিজরী ৩৪ সনে। (তাবারী-৫/২৯৩৬) এ অভিযান ছিল হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে। এ সকল অভিযান শেষ করে তিনি মাদায়েনে নিজ পদে ফিরে আসেন।

মাদায়েনে পৌছার পর তিনি হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের ঘটনা অবগত হন। খলীফা 'উসমানের (রা) শাহাদাতের মাত্র চল্লিশ দিন পর তিনিও ইনতিকাল করেন। এটা হিজরী ৩৬ সন মুতাবিক ৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ওয়াকিদী ও আল-হায়সাম ইবন 'আদী এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (দ্রঃ আল-ইসাবা-১/৩১৮; শাজারাতুয্ যাহাব-১/৪৪; আল-আ'রাম-২/১৭১; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৪)

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর সাদাসিধে ভাব আরো বেড়ে যায় এবং দারুণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সব সময় কান্নাকাটি করতেন। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে এ কান্না নয়। কারণ, মৃত্যু আমার অতি প্রিয়। তবে এ জন্য কাঁদছি যে, মৃত্যুর পর আমার যে কী অবস্থা হবে এবং আমার পরিণতিই বা কী হবে, তা তো আমার জানা নেই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার সাক্ষাৎ আমার জন্য কল্যাণময় কর। তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালোবাসি।' (উসুদুল গাবা-১/৩৯২)

তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে রাতের বেলা কয়েকজন সাহাবী তাঁকে দেখতে গেলেন। হুজাইফা তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ এটা কোন্ সময়? তাঁরা বললেন ঃ প্রভাতের কাছাকাছি সময়। তিনি বললেন ঃ আমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ্ চাই যা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা কি কাফন এনেছেন? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, এনেছি। বললেন ঃ কাফনের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে যদি আমার কিছু ভালো থেকে থাকে তাহলে এ কাফন পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, আর যদি খারাপ থাকে এ ভালো কাফন ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

তিনি কাফন দেখতে চাইলে তা দেখানো হলো। যখন দেখলেন, তা নতুন ও দামী তখন ঠোঁটে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বললেন ঃ এ আমার কাফন নয়। কামিস ছাড়াই দু'প্রস্থ সাদা কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ কবরে আমাকে বেশী সময় বিরতি দেওয়া হবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তার চেয়ে ভালো অথবা মন্দ স্থানে স্থানান্তর করা হবে। তারপর দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি জান আমি ধনের পরিবর্তে দারিদ্রকে, ইয্যতের পরিবর্তে জিল্লতীকে এবং জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ভালোবাসতাম।' তার শেষ কথাটি ছিল ঃ 'অতি

আবেগের সাথে বন্ধু এসেছে, যে অনুশোচনা করবে তার সফলতা নেই।' (দ্রঃ উসুদুল গাবা-১/৩৯৩; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০৩; রিজালুন হাওলার রাসূল-২০১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৩৮)

তাঁর জানাযায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, আমি এই খাটিয়ার ওপর শায়িত ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) যা কিছু বলেছেন তা বর্ণনা করতে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যদি পরস্পর যুদ্ধের দিকে ধাবিত হও তাহলে আমি ঘরে বসে থাকবো। তারপরেও যদি কেউ সেখানে উপস্থিত হয় তাহলে তাকে বলবো, এগিয়ে এসো, আমার ও তোমার পাপের বোঝা কাঁধে তুলে নাও। (মুসনাদ-৫/৩৮৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৪০৪, ৪০৫)

মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আলীর (রা) নিকট বাই'য়াত করার জন্য দুই ছেলেকে অসীয়াত করে যান। তাঁরা দু'জনই 'আলীর (রা) বাই'য়াত করেন এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসতীয়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা-১/২৭৮) হযরত হুজাইফা (রা) নিজেও 'আলীর নিকট বাই'য়াত করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

আবু 'উবাইদাহ, বিলাল, সাফওয়ান ও সা'ঈদ নামে তাঁর চার ছেলে ছিল। 'তাবাকাত' গ্রন্থকার ইবন সা'দের সময় মাদায়েনে তাঁর বংশধরগণ জীবিত ছিলেন। (তাবাকাত-৬/৮) হযরত হুজাইফার দুই স্ত্রী ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে।

দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে হযরত হুজাইফাকে (রা) হিজাযী বলে চেনা যেত। মধ্যমাকৃতির একহারা গড়ন এবং সামনের দাঁতগুলি ছিল অতি সুন্দর। দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, ভোরের আবছা অন্ধকারেও তীরের নিশানা (লক্ষ্যস্থল) নির্ভুলভাবে দেখতে পেতেন।

হযরত হুজাইফা (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'আলিম সাহাবীদের একজন। ফিকাহ ও হাদীস ছাড়াও কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে যে সকল আবর্তন-বিবর্তন হবে সে সম্পর্কেও একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুনাফিকদের সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল অনেক। এ কারণে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন জ্ঞানের অধিকারী বা 'সাহিবুস সির' বলা হতো। হুজাইফা বলেন ঃ অতীতে পৃথবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা সবই রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

একবার তিনি প্রখ্যাত 'আলিম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের নিকট বসে ছিলেন। আরো অনেকে সেখানে ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে দাজ্জালের কথা উঠলে তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে তোমাদের থেকে অনেক বেশী জানি। (সহীহ মুসলিম-২/৫১৪)

একদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক ভাষণে সাহাবীদের সামনে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা দান করেন। হযরত হুজাইফার সেই ভাষণটি স্মরণ ছিল। তবে কিছু কথা ভুলে যান। যখনই কোন ঘটনা ঘটতো তখন সে কথা মনে পড়তো। (সহীহ মুসলিম-৫/৪৯) তিনি নিজেই বলেছেন, রাসূল (সা) তাঁকে সব ঘটনা অবহিত করেন। শুধু একটি কথা বলা বাকী ছিল। তা হলো, মদীনাবাসীদের মদীনা থেকে বের হওয়ার কারণ কী হবে? (সহীহ মুসলিম-৫/৪৯)

'আলকামা বলেন ঃ একবার আমি শামে গেলাম। সেখানে আমি এই বলে দু'আ করলাম ঃ হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেক্‌কার সঙ্গী দাও। এরপর আমি একজন লোকের পাশে বসলাম। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন আবু দারদা (রা) তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক? বললাম ঃ কূফার। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ওখানে 'সাহিবুস সির' বা গোপন রহস্যের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি ছাড়া অন্য কেউ সে রহস্য জানেনা—সেই হুজাইফা কি নেই? (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৬)

হযরত হুজাইফা (রা) সম্পর্কে একবার হযরত 'আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে

বললেন, তিনি তো মুনাফিকদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে—তিনি তো মুনাফিকদের সম্পর্কে মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৭)

আর একবার হুজাইফা সম্পর্কে হযরত আবু যারকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে বললেন ঃ তিনি যেমন যাবতীয় জটিল ও বিস্তারিত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, তেমনিভাবে মুনাফিকদের নামও জানেন। মুনাফিকদের সম্পর্কে যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এ বিষয়ে তাঁকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিই পাবে। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৭)

সাহাবায়ে কিরাম সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিভিন্ন 'আমলের ফজীলাত, নামায, রোযা বা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু হুজাইফা (রা) তা করতেন না। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা সব সময় ভালো কি, তাই জিজ্ঞেস করতেন। আর আমি জিজ্ঞেস করতাম, খারাপ কি, তা জানার জন্য। প্রশ্ন করা হলো, কেন এমন করতেন? বললেন ঃ যে খারাপকে জানে সে ভালোর মধ্যে থাকে। অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি বলেন, 'যাতে আমি খারাপের মধ্যে না পড়ি সেই ভয়ে।' (বুখারী-২/১০৪৯; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০১; তাজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

একবার হযরত 'উমারের (রা) নিকট বহু সাহাবী বসে ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ ফিত্না সম্পর্কে কারো কি কিছু জানা আছে? হুজাইফা বললেন ঃ ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষের যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, নামায, সাদাকা, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার দ্বারা তার কাফ্ফারা হয়ে যায়। 'উমার বললেন ঃ আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এ নয়। আমাকে সে ফিত্নার কথা বল যা সাগরের মত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।' হুজাইফা বললেন ঃ আপনার ও সেই ফিত্নার মধ্যে একটি দরযার বাধা আছে। এ জন্য আপনার দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ নেই। 'উমার (রা) জানতে চাইলেন ঃ দরযা খোলা হবে না ভেঙ্গে ফেলা হবে? বললেন ঃ ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রা) বললেন ঃ তাহলে তো আর কক্ষণো থামবে না। হুজাইফা বললেন ঃ হাঁ, তাই।

হযরত হুজাইফা (রা) উল্লেখিত ঘটনাটি পরবর্তীকালে অন্য একটি মজলিসে বর্ণনা করলেন। তখন সেখানে প্রখ্যাত তাবে'ঈ 'শাকীক' উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'উমার কি দরযা সম্পর্কে জানতেন? বললেন ঃ তোমরা যেমন জান দিনের পর রাত হয়, ঠিক তেমনি তিনিও দরযা সম্পর্কে জানতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ দরযার অর্থ কি? বললেন ঃ 'উমার নিজেই। (বুখারী)

হযরত হুজাইফা (রা) থেকে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। নবুওয়াতের যেসব গোপন কথা তাঁর জানা ছিল তার বেশীর ভাগ ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছাড়া আরো অনেকে এসব গোপন কথা জানতেন। হুজাইফার (রা) বর্ণনা থেকে সে কথা জানা যায়। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'আমি বর্তমান সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল ফিত্না সম্পর্কে জানি। তবে একথা দ্বারা কেউ যেন না বোঝে যে, আমি ছাড়া আর কেউ বিষয়টি জানতো না। রাসূল (সা) এক মজলিসে কথাগুলি বলেছিলেন। ছোট-বড় সকল ঘটনার সংবাদ দিয়েছিলেন। তবে সেই মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আজ আর কেউ বেঁচে নেই।' (মুসলিম-২/৩৯৭)

হযরত হুজাইফা (রা) মাঝে মাঝে নিজের এ জ্ঞান কাজে লাগাতেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। একবার 'আমের ইবন হানজালার গৃহে প্রদত্ত এক খুতবায় তিনি বলেন ঃ 'একটি সময়ে কুরাইশরা দুনিয়ার কোন নেক্কার বান্দাহ্কে ছেড়ে দেবে না। তারা সকলকে ফিত্নায় জড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের একটি বাহিনী দিয়ে তাদেরকে একেবারেই নির্মূল করে ফেলবেন।'

লোকেরা বললো ঃ আপনি নিজেও তো একজন কুরাইশী। বললেন ঃ আমার করার কী আছে? আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এমনই শুনেছি। (মুসনাদ-৫/৩৯০; ৩৯৫, ৪০৪)

একবার হযরত হুজাইফা বললেন ঃ রাসূল (সা) আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছিলেন। যার একটি আমি দেখেছি, আর অন্যটির প্রতীক্ষায় আছি। এমন এক সময় ছিল যখন আমি যে আমীরের হাতেই বাই'য়াত করতাম, তার ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ দেখা দিতনা। আমি বিশ্বাস করতাম, সে মুসলিম হলে ইসলামের দ্বারা, আর খ্রীস্টান হলে মুসলিম কর্মচারী দ্বারা আমাদেরকে শাসন করবে। কিন্তু এখন আমি বাই'য়াতের ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করি। আমার দৃষ্টিতে বাই'য়াতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছে। আমি কেবল তাদের হাতে বাই'য়াত করতে পারি। (বুখারী)

কিয়ামত সম্পর্কে তিনি একটি আগাম কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'যতদিন প্রতিটি গোত্রের মুনাফিকরা তার নেতা না হবে ততদিন কিয়ামত হবে না।' (আল-ইসতী'য়াব, আল-ইসাবা-১/২৭৮) আর একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ফিত্না সবচেয়ে বড়? বললেন ঃ যদি তোমার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টোই পেশ করা হয়, আর তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করবে তা ঠিক করতে না পার, তাহলে সেটাই বড় ফিত্না। (আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবা-১/২৭৮) আর একবার বললেন ঃ মানবজাতির জন্য এমন একটা সময় বা কাল আসবে যখন কেউ ফিত্না থেকে মুক্তি পাবে না। শুধু তারাই মুক্তি পাবে যারা পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ডাকার মত আল্লাহকে ডাকবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৭)

তিনি সরাসরি রাসূল (সা) ও 'উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩) 'খুলাসা' গ্রন্থের লেখক তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক শো'র (১০০) বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। যে সকল সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ঃ জাবির ইবন আবদিল্লাহ, জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খুতামী, আবুত তুফাইল, 'আলী ইবন আবী তালিব, 'উমার ইবন খাত্তাব প্রমুখ সাহাবী। (উসুদুল গাবা-১/৩৯০; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

তাবে'ঈদের একটি বিরাট দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

কায়স ইবন আবী-হাযেম, আবু ওয়ায়িল, যায়িদ ইবন ওয়াহাব, রিব'ঈ ইবন খিরাশ, যার ইবন হুবাইশ, আবু জাবইয়ান, হুসাইন ইবন জুনদুব, সিলা ইবন যুফার, আবু ইদরীস আল-খাওলানী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উকাইম, সুওয়াইদ ইবন ইয়াযীদ নাখ'ঈ, 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ, আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা, হাম্মাম ইবন আল-হারেস, ইয়াযীদ ইবন শুরাইত আত-তাঈমী, বিলাল ইবন হুজাইফা প্রমুখ। (আল-ইসাবা-১/৩১৮; আয্-যাহাবী, তারীখ-২/১৫২; তাহজীবুত-তাহজীব-২/১৯৩)

রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব পালনের পর তিনি সময় খুব কম পেতেন। তা সত্ত্বেও যখনই সুযোগ হতো হাদীসের দারস দিতে বসে যেতেন। কূফার মসজিদে দারসের হালকা বসতো এবং তিনি সেখানে হাদীস বর্ণনা করতেন। (মুসনাদ-৫/৪০৩) জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন ঃ হুজাইফা (রা) আমাদের বলতেন, আমাদের ওপর এই ইলমের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে তা পৌছাবো—যদিও তার ওপর আমরা 'আমল না করি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬৮; কানযুল 'উম্মাল-৭/২৪)

ছাত্ররা তাঁকে যেমন অতিরিক্ত ভক্তি ও সম্মান দেখাতো তেমনি ভয়ও পেত। 'বাশকারী' একবার মসজিদে এসে দেখেন, গোটা মজলিস সম্পূর্ণ নীরব এবং একই ব্যক্তির দিকে

একাগ্রচিত্তে চেয়ে আছে। যেন সকলের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। (মুসনাদ-৫/৩৮৬) **ছাত্ররা** যে তাঁকে কী পরিমাণ ভয় ও সম্মানের চোখে দেখতো তা একটি ঘটনা দ্বারা বুঝা **যায়।** একবার তিনি হযরত 'উমার (রা) সম্পর্কিত ফিত্‌নার হাদীসটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি ছিল গোপন রহস্য বিষয়ক ও ইশারা-ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞেস করার হিম্মত কোন ছাত্রের হলো না। অবশেষে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের যোগ্য ছাত্র 'মাসরূক' কে হাদীসটির অর্থ জিজ্ঞেস করার জন্য রাজী করান। তিনি তা জিজ্ঞেস করেন।

একবার হযরত হুজাইফা (রা) মি'রাজের হাদীস বর্ণনা করছেন। এমন সময় যার বিন হুবাইশ আসলেন। হুজাইফা বললেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাইতুল মাকদাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। যার বললেন ঃ রাসূল (সা) ভিতরে ঢুকেছিলেন এবং নামাযও আদায় করেছিলেন। হুজাইফা বললেন ঃ তোমার নাম কি? আমি তোমাকে চিনি তবে নামটি জানিনে। তিনি নাম বললেন। হুজাইফা বললেন ঃ রাসূল (সা) যে নামায আদায় করেছিলেন, সেকথা তুমি কিভাবে জানলে? যার বললেন ঃ কুরআন থেকে। হুজাইফা বললেন ঃ আয়াতটি পাঠ কর তো। যার সূরা আল-ইসরার সেই আয়াতটি পাঠ করলেন যাতে মি'রাজের বর্ণনা এসেছে। হুজাইফা বললেন ঃ এর মধ্যে নামাযের কথা কোথায় আছে? যার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন। (মুসনাদ-৫/৩৮৭)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দারুণ সতর্ক ও সংরক্ষণবাদী ছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে হাদীস শুনতে চাইলে তিনি বর্ণনা করতেন না। (মুসনাদ-৫/৩৯৭)

এ কারণে মানুষও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। যখন কোন ঘটনা ঘটতো, আর তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তখন গোটা সমাবেশকে অতি গুরুত্বের সাথে চুপ করানো হতো। (মুসনাদ-৫/৩৯৭) একবার তিনি ও আবু মাস'উদ একসাথে ছিলেন। একজন অন্যজনের কাছে হাদীস শুনতে চাইলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই বলছিলেন, না, আপনি বলুন। (মুসনাদ-৫/৪০৭)

তিনি পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন দারুণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মাদায়েনের ওয়ালী থাকাকালেও তাঁর জীবন যাপনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। অনারব পরিবেশ এবং সেইসাথে ইমারাতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা—এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমন কি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখতেন না। একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর কাছে কিছু অর্থ পাঠালেন। সাথে সাথে তিনি সবই মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৯২) তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাত সমানভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম নয় যারা আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে, আবার তারাও নয় যারা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ছেড়ে দিয়েছে। বরং যারা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকে কিছু গ্রহণ করে তারাই মূলতঃ সবচেয়ে ভালো। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২০০; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৭)

দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার সাথে সাথে ইবাদাত-বন্দেগীতে গভীরভাবে মশগুল থাকতেন। এবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সারা রাত নামায আদায় করেন। এর মধ্যে একবারও 'উহু' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। (মুসনাদ-৫/৪০০) হুজাইফা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারাহ দিয়ে শুরু করলেন। ভাবলাম, এক শো আয়াতের মাথায় হয়তো রুকু' করবেন; কিন্তু তার পরেও পড়ে যেতে লাগলেন। মনে করলাম, সূরা বাকারাহ্ এক রাকা'য়াতে শেষ করবেন। কিন্তু না, সূরা নিসা শুরু করলেন। নিসার পর আলে 'ইমরানও শেষ করলেন। তারপরও রুকু'র কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। বিভিন্ন সূরা পড়তে লাগলেন। কোন তাসবীহর আয়াত তিলাওয়াত করছেন, সাথে সাথে সুবহানাল্লাহ পড়ছেন। দু'আর আয়াত এলে দু'আ করছেন, আবার তা'য়াউজের আয়াত এলে আ'উজুবিল্লাহ পড়ছেন। এক সময় রুকু'তে গেলেন এবং সুবহানা রাব্বীয়াল 'আজীম পড়তে লাগলেন। সে রুকু'র যেন শেষ নেই। তা ছিল কিয়ামের মতই দীর্ঘ। এক সময় 'সামি'য়া আল্লাহু লিমান হামিদা' বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং রুকু'র মতই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং তাও ছিল কিয়ামের মত দীর্ঘ। এভাবে নামায শেষ হলে বিষয়টির প্রতি আমি রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যে আমার পিছনে আছ একথা জানতে পেলে আমি নামায সংক্ষেপ করতাম। (মুসনাদ-৫/৩৮২, ৩৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৯১)

সর্ব অবস্থায় সকলকে তিনি আমর বিল মা'রূফ বা ভালো কাজের আদেশ দিতেন। হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সম্মানিত সাহাবী। তিনি কাপড়ে প্রস্রাবের ছিটা লাগার ভয়ে সতর্কতা স্বরূপ বোতলে প্রস্রাব করা শুরু করেন। হযরত হুজাইফা এ কথা জানতে পেরে তাঁকে বললেন ঃ এমন কঠোরতা ঠিক নয়। রাসূল (সা) একবার একটি ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। আমিও তখন তাঁর সাথে। আমি একটু দূরে সরে যেতে চাইলে বললেন, কাছেই থাক। আমি তাঁর পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। (মুসনাদে-৫/৩৮২)

একবার কিছু লোক এক স্থানে জটলা করে বসে কথা বলছিল। হুজাইফা তাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলের (সা) সময়ে এমন জটলা করে কথা বলা 'নিফাকের' (কপটতা) মধ্যে গণ্য করা হতো। (মুসনাদ-৫/৩৮৪)

একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে এসে খুব তাড়াতাড়ি নামায আদায় করছিল। হযরত হুজাইফা (রা) কাছে এসে বললেন, তুমি কতকাল এভাবে নামায আদায় করছো? লোকটি বললো ঃ চল্লিশ বছর। হুজাইফা বললেন, তোমার এ চল্লিশ বছরের নামায একেবারে মিছেমিছি হয়ে গেছে। যদি এভাবে নামায আদায় করতে করতে মারা যাও তাহলে সে মরণ দ্বীনে মুহাম্মদীর ওপর হবে না। তারপর তাকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়ে বলেন, ছোট ছোট সূরাহ পড়, তবে রুকু'-সিজদা ঠিকমত কর। (মুসনাদ-৫/৩৮৪; কানযুল 'উম্মাল-৪/২৩০; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮০)

একবার এক ব্যক্তিকে মজলিসের মাঝখানে এসে বসতে দেখে তিনি বললেন, রাসূল (সা) এমন ব্যক্তির ওপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। (মুসনাদ-৫/৩৯৮)

হযরত 'উসমান (রা) যখন মদীনায় বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আছেন তখন একবার রিব'ঈ হযরত হুজাইফার (রা) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মাদায়েন আসলেন। হুজাইফা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে কারা? রিব'ঈ কতিপয় লোকের নাম বললেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'য়াত (দল) ছেড়ে দিয়েছে এবং ইমারাত বা নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, আল্লাহর নিকট সে একেবারেই গুরুত্বহীন। (মুসনাদ-৫/৩৮৭)

সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তাঁর ছাত্র হযরত রিব'ঈ যখন হযরত হুজাইফার (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন ঃ 'হাদ্দাসানী মান লাম ইউকাজ্জিব্‌নী—আমাকে এমন ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি।' তাঁর এ কথা দ্বারা লোকেরা বুঝে যেত যে তিনি হুজাইফা ছাড়া আর কেউ নন। (মুসনাদ-৫/৩৮৫, ৪০১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তাঁর গভীর নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা ছিল। বহু ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার রাসূল (সা) তাঁর বুকে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। (মুসনাদ-

৫/৩৮৩) আর একবার ইযারের (পাজামা) সীমা বলতে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাত হুজাইফার (রা) পায়ের নালা স্পর্শ করেছিল। (মুসনাদ-৫/৩৮২) খন্দকের সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে মুশরিকদের খবর নিয়ে এলে রাসূল (সা) নিজের কম্বলের একাংশ তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন, টেনে নিজের কাছে বসান। একরাত নিজের হুজরায় থাকার ব্যবস্থা করেন। (মুসনাদ-৫/৩৯৩) তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে বসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে নানা বিষয়ে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করতেন। হযরত আবুদল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) একটি বর্ণনা থেকে একথা জানা যায়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৩১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা আরেকটি ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার রমজান মাসে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায় করেন। রাতে রাসূল (সা) গোসল করেন। তখন হুজাইফা (রা) পর্দা করে দাঁড়ান। কিছু পানি বেঁচে গেল এবং তা দিয়ে হুজাইফা গোসল করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) অনুমতি দিলেন। তিনি গোসল শুরু করলে রাসূল (সা) পর্দা করে দাঁড়ালেন। এতে তিনি আপত্তি জানালে রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যেমন আমার পর্দা করেছ, আমিও তেমন তোমার পর্দা করবো (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৮); হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৮)

হযরত হুজাইফা ছিলেন ক্ষমা ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর পিতাকে যাঁরা ভুলক্রমে হত্যা করেছিল তিনি তাদের প্রতি উত্তেজিত বা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি; বরং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তাদের এ ভুলের মাগফিরাত কামনা করেছেন। হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রহ) বলেন ঃ ক্ষমা ও সহনশীলতার গুণটি হযরত হুজাইফার (রা) মধ্যে আমরণ বিদ্যমান ছিল। (বুখারী-২/৫৮১)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর আনুগত্যের অবস্থা যে কেমন ছিল তা বুঝা যায় খন্দক যুদ্ধের ঘটনাটি দ্বারা। সে সময় একজন সাহাবীও শত্রু শিবিরে যেতে সাহস করেনি। কিন্তু তিনি রাসূলের (সা) আদেশ পালনের জন্য জীবন বাজি রেখে সেখানে যান এবং জান্নাতের সুসংবাদ লাভকরেন।

একবার পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর দেখা হলো। রাসূল (সা) হাত মিলানোর জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, আমি অপবিত্র। রাসূল (সা) বললেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনো নাজাস বা অপবিত্র হয়না। (মুসনাদ-৫/৩৮৪) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেন ঃ একজন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের সাথে হাত মেলায় তখন তাদের দু'জনের গুনাহ গাছের শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৯৫) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে যখন তাঁর আহার করার সৌভাগ্য হতো, তিনি কখনো আগে শুরু করতেন না। রাসূল (সা) আগে শুরু করতেন। (মুসনাদ-৫/৩৮৩)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যে যে দিন আসতেন সেদিন যুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার নামায তার সাথে আদায় করতেন। মাঝের এ সময়টুকু সুহবতের সৌভাগ্য অর্জন করতেন। (মুসনাদ-৫/৩৯২) যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করতেন এবং ওযু-গোসলের পানি এগিয়ে দিতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন রাসূল (সা) ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থলে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর আমার কাছে পানি চাইলেন। আমি পানি এগিয়ে দিলে তিনি ওযু করে মোযার ওপর মাসেহ করলেন। (মুসনাদ-৫/৩৮২) তিনি এ খবরও দিয়েছেন যে, রাসূল (সা) রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করতেন। (মুসনাদ-৫/৩৮২) এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি সময় ও সুযোগ পেলে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশে-পাশে থাকতেন।

একদিন হুজাইফার (রা) সম্মানিত মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে যাওনি? ছেলে সময়-সীমা বলার পর তিনি ক্ষেপে গিয়ে তাকে

বকাঝকা করেন। তখন হুজাইফা মাকে বলেন, মা, আপনি থামুন। আমি আজই মাগরিবের নামায রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আদায় করছি এবং তাঁর দ্বারা আমার ও আপনার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করাচ্ছি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে রাসূল (সা) বের হলেন। হুজাইফাও পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। এক সময় রাসূল (সা) ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন ঃ কে, হুজাইফা? আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করুন। (মুসনাদ–৫/৩৯১; তারীখু ইবন 'আসাকির–১/৯৫)

হযরত হুজাইফা খুব কমই উত্তেজিত হতেন। তবে শরী'য়াতের হুকুম যথাযথভাবে পালিত হতে না দেখলে তাঁর রাগের কোন সীমা থাকতো না। শরী'য়াতের বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হওয়া সহ্য করতেন না। মাদায়েনে থাকাকালে একবার এক রয়িসের (সর্দার) গৃহে পানি চাইলেন। রয়িস রূপোর পাত্রে পানি দিলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। পাত্রটি রয়িসের হাত থেকে নিয়ে তার গায়ে ছুড়ে মারেন। তারপর বলেন, আমি কি তোমাকে সতর্ক করে দিইনি যে, রাসূল (সা) সোনা–রূপোর পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন?

এমনিভাবে তিনি সুন্নাতের হেরফের হওয়া বিন্দুমাত্র পসন্দ করতেন না। একবার বনী উসাইদের আযাদকৃত দাস আবু সা'ঈদ কিছু খাবার তৈরী করে আবু যার, হুজাইফা ও ইবন মাস'উদকে দা'ওয়াত দিলেন। তিনজন যখন তাঁর বাড়ী পৌঁছলেন তখন নামাযের সময় হয়েছে। আবু যার ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলে হুজাইফা বলে উঠলেন ঃ আবু যার পিছনে সরে এসো। ইমামতির অগ্রাধিকার গৃহকর্তার। আবু যার বললেন ঃ ইবন মাস'উদ, কথাটি কি সত্যি? ইবন মাস'উদ বললেন ঃ হাঁ। আবু যার পেছনে সরে এলেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৩১)

জাহিলী আরবে কারো মৃত্যু হলে তা খুব ঘটা করে প্রচার করা হতো। রাসূল (সা) এমনটি করতে নিষেধ করেন। হযরত হুজাইফা এত কঠোরভাবে তা পালন করতেন যে, কেউ মারা গেলে কাউকে সে খবরটি পর্যন্ত দিতে চাইতেন না। তিনি ভয় করতেন, সেই আগের অবস্থায় আবার ফিরে না আসে। (মুসনাদ–৫/৪০৬)

তিনি নির্জনতা পসন্দ করতেন, কিন্তু সেভাবে থাকতে পারতেন না। তিনি বলতেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, বিষয়–সম্পদ দেখা–শুনার মত কেউ থাকলে আমি ঘরের দরযা বন্ধ করে দিতাম। তাহলে কেউ আমার কাছে ঘেঁষতে পরতো না এবং আমিও মানুষের কাছে যেতাম না। আর এভাবে আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হতাম। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৪৯)

তিনি ঝগড়া–বিবাদ, পরনিন্দা, দোষ অন্বেষণ, রক্তপাত ইত্যাদি ধরনের খারাপ কাজ খুবই ঘৃণা করতেন। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি একজন মস্তবড় পাপীকে হত্যা করতে পারলে খুশী হবে? সে বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি হবে তখন তার চেয়েও বড় পাপাচারী। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪০৮) এক ব্যক্তি খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) কাছে মানুষের নানা কথা পৌঁছে দিত। লোকটি একদিন যখন হুজাইফার (রা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন লোকেরা বললো ঃ এ ব্যক্তি আমীরের নিকট সকল সংবাদ পৌঁছে দেয়। তিনি বললেন ঃ এমন লোক জান্নাতে যেতে পারে না। (মুসনাদ–৫/৩৮৯)

যায়িদ ইবন ওয়াহাব বলেন ঃ একবার একটি ব্যাপারে কোন এক আমীরের প্রতি মানুষ ক্ষেপে গেল। হযরত হুজাইফা মসজিদে দারস দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মানুষের ভীড় ঠেলে হুজাইফার (রা) মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো ঃ 'হে রাসূলুল্লাহর সাহাবী! আপনি কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন না? হুজাইফা (রা) লোকটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি মাথা সোজা করে তাকে বললেন ঃ

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার অতি ভালো কাজ—এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ জন্য আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সুন্নাত সম্মত নয়। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৬)

তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে মিষ্টি–মধুর আলাপ করতেন। কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রীর সাথে কথাবার্তায় ছিলেন একটু কর্কশ। বিষয়টি তিনি নিজেই উপলব্ধি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'আমি নবীর (সা) কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি জিহবা আছে, আমার স্ত্রীর প্রতি তা বড় কঠোর। ভয় হচ্ছে, তা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে না যায়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি আল্লার কাছে ইসতিগ্ফার (ক্ষমা চাওয়া) করনা কেন? এই যে আমি, প্রতিদিন শতবার আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করি। (রিজালুন হাওলার রাসূল–১৯৬; হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৬)

একবার লোকেরা বললো, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন একজন সাহাবীর নাম বলুন যিনি চলন–বলন, আকীদা–বিশ্বাস, তথা প্রতিটি বিষয়ে আপনার মত। বললেন ঃ এমন ব্যক্তি শুধু ইবন মাস'উদ। তবে যতক্ষণ তিনি ঘরের বাইরে থাকেন। ঘরের ভিতরের অবস্থা আমার জানা নেই। (মুসনাদ–৫/২৮৯, ৩৯৪)

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমার পূর্বের নবীদেরকে সাতজন উযীর ও বন্ধু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দজন।' এই বলে তিনি চৌদ্দ জনের নাম উচ্চারণ করেন। তাদের মধ্যে হুজাইফার নামটিও ছিল। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৪/৯৬)

তিনি সব সময় হিংসা–বিদ্বেষের উর্ধে থাকার চেষ্টা করতেন। কারো সাথে কোন রকম তিক্ততার সৃষ্টি হলে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে নিতেন। 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী কোন এক সাহাবীর সাথে একটি ব্যাপারে তাঁর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। তাদের কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে যায়। হযরত হুজাইফা (রা) সবকিছু ভুলে প্রথমে তাঁর সাথে কথা বলেন। তারপর সে সাহাবীও নিজের আচরণে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। (মুসনাদ–৫/৩৯০)

তিনি ছিলেন খুবই সামাজিক ও উদার। খাওয়ার সময় কেউ উপস্থিত হলে তাকেও ডেকে সংগেবসাতেন।(মুসনাদ–৫/৩৯২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত। সাহাবীরা তাঁর মৃত্যু–পরবর্তী একজন খলীফা নিয়োগ করে যাওয়ার আবেদন জানান। তিনি তাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যে সব উপদেশ দান করেন তার মধ্যে এ কথাটিও ছিল ঃ 'হুজাইফা তোমাদেরকে যা বলবে তা মেনে নিবে।' (তারীখু ইবন 'আসাকির–৪/৯৬)

খলীফা হযরত 'উসমান (রা) পবিত্র কুরআনের যে স্ট্যান্ডার্ড কপি তৈরী করেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, তার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেন মূলতঃ হযরত হুজাইফা (রা)। ইমাম বুখারী হযরত আনাসের (রা) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। আনাস বলেন, 'হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক, আরমেনিয়া ও আজারবাইজান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সকল এলাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে তারতম্য লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেখান থেকে মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন ঃ 'আমি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের লোকদের দেখেছি, তারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেনা। তাদের কাছে কুরআনের স্ট্যান্ডার্ড কপি পৌছাতে না পারলে ইয়াহুদ ও নাসারার হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে দশা হয়েছে, এ উম্মাতের হাতে কুরআনের দশাও অনুরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' খলীফা বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'মাসহাফ' এনে তার হুবহু নকল করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন। এভাবে পবিত্র কুরআনের হিফাজতের ব্যাপারে হযরত

হুজাইফা (রা) পরোক্ষভাবে বিরাট অবদান রাখেন। (দ্রঃ সহীহ্ বুখারী ঃ জাম'উল কুরআন অধ্যায়; আত-তিব ইয়ান ফী উলুমিল কুরআন-৫৭)

উল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহ ও গুণাবলীর কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। যেহেতু হুজাইফা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে মুনাফিকদের নাম জেনেছিলেন, তাই সকলে এ ব্যাপারে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। খলীফা 'উমারের (রা) তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কোন মুসলমান মারা গেলে এ কথা জিজ্ঞেস করা যে, হুজাইফা কি এর জানাযায় শরীক হয়েছে? যদি বলা হতো 'হ্যাঁ' তাহলে তিনিও পড়তেন। আর যদি বলা হতো 'না' তাহলে তাঁর সন্দেহ হতো এবং তিনি তার জানাযা পড়তেন না। (উসুদুল গাবা-১/৩৯১; শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৪)

একবার খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কি কোন মুনাফিক আছে? হুজাইফা বললেন ঃ একজন আছে। খলীফা বললেন ঃ আমাকে তার একটু পরিচয় দাও না। বললেন ঃ আমি তা দেব না। হুজাইফা বলেন ঃ তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে 'উমার তাকে বরখাস্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি সঠিক হিদায়াত পেয়েছিলেন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৩৬-১৩৭)

হুজাইফা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন মসজিদে বসে আছি। 'উমার (রা) আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন ঃ হুজাইফা, অমুক মারা গেছে, তার জানাযায় চলো। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। মসজিদ থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, আমি নিজ স্থানে বসে আছি। তিনি বুঝতে পেরে আমার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ হুজাইফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বল তো আমিও কি তাদের (মুনাফিকদের) একজন? আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই না। আপনার পরে আর কাউকে কক্ষণো আমি এমন সনদ দেব না। (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৭; যাহাবী ঃ তারীখ-২/১৫৩)

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর পাশে বসা সাহাবীদের বললেন, আচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্খার কথা একটু বলুন তো! প্রায় সকলেই বললেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমরা যদি ধন-রত্নে ভরা একটি ঘর পেতাম, আর তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। সবার শেষে 'উমার (রা) বললেন, আমার বাসনা এই যে, আমি যদি আবু 'উবাইদাহ, মুয়াজ ও হুজাইফার (রা) মত মানুষ বেশী বেশী পেতাম, আর তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতাম। একথা বলে তিনি দীনার ভর্তি একটি থলে একজন লোকের হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি হুজাইফার নিকট নিয়ে যাও, আর তাকে বল, খলীফা এগুলি আপনার প্রয়োজনে খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাকে আরো বলে দেন, তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখে আসবে, সে দীনারগুলি কি করে। লোকটি থলেটি নিয়ে হুজাইফার নিকট গেল। আর হুজাইফা সাথে সাথে তা গরীব-মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৯, ১০০; উসুদুল গাবা-১/৩৯২; হায়াতুস সাহাবা-২/২৩৩)

হযরত হুজাইফার (রা) এমনি ধরনের অনেক ফজীলাত ও মহত্বের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে যা ছোট কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্।
২. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত,
৩. ইবনুল আসীর ঃ উসুদুল গাবা,
ঃ তাজরীদ আসমা আস-সাহাবা,
ঃ আল-কামিল ফিত তারীখ,
৪. ইবন 'আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর,
৫. ইবন হাজার ঃ আল-ইসাবা,
ঃ তাকরীব আত-তাহজীব,
ঃ লিসানুল মীযান,
৬. বালাজুরী ঃ আনসাবুল আশরাফ,
৭. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাহজারাতুয্ যাহাব ফী-মান য্াহাব,
৮. মুহীউদ্দীন আন-নাওয়াবী ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,
৯. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী,
১০. ইবনুল জাওযী ঃ সিফাতুস সাফওয়া,
১১. আজ-জাহাবী ঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ,
ঃ তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত
আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম,
১২. ইয়াকুত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান,
১৩. আল-কুরতুবী ঃ আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা),
১৪. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ ফিকহু 'উমার (উর্দু),
১৫. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী ঃ আত-তিবইয়ান ফী 'উলুমিল কুরআন,
১৬. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম,
১৭. ইউসূফ কান্ধালুবী, মাওলানা ঃ হায়াতুস সাহাবা, (আরবী)
১৮. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল,
১৯. ডঃ রাফাত আল-বাশা ঃ সুওয়ারুন্ মিন হায়াতিস সাহাবা,
২০. আবদুর রউফ, মাওলানা ঃ আসাহ আস্-সীয়ার,
২১. সা'ঈদ আনসারী, মাওলানা ঃ সীয়ারে আনসার,
২২. ডঃ 'উমার ফাররুখ ঃ তারীকুল আদাব আল 'আরাবী,
২৩. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যা,
২৪. ইমাম আহমাদ ঃ আল মুসনাদ
২৫. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)
২৬. মুহাম্মাদ খিদ্রী বেক ঃ তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা,
২৭. আবদুর রহমান আল-বান্না ঃ আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ)
২৮. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।